



রাজত জয়স্তী বর্ষে বিশেষ সংখ্যা  
সরাক সংস্কৃতি ও জৈনধর্ম  
১৯৯৮



জৈন সরস্বতী, পশ্চ, বীকানের

শ্রমণ  
শ্রমণ

# সরাক সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশে জৈনধর্ম

[ শ্রমণ পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশন ]

সম্পাদক

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্ এ (ডব্লিু); পি এইচ্ ডি (কলিকাতা); পি এইচ্ ডি (এডিনবুরো);  
প্রাকৃত-বিদ্যা-মনীষী (জৈন বিশ্বভারতী); এফ্ এ এস্ (কলিকাতা);  
প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ভূতপূর্ব ভিজিটিং অধ্যাপক,  
উইস্কন্সিন্ ম্যাডিসন্ বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাডিসন্ ও ভূতপূর্ব অধ্যাপক,  
স্কুল্ অব ওরিয়েণ্টাল্ ও আফ্রিকান্ স্টাডিজ্‌স্,  
লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয়, লঙ্ঘন।



॥ জৈন ভবন ॥

জৈন ভবন

পি ২৫ কলাকার স্ট্রিট,  
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রকাশক :

সম্পাদক,  
জৈন ভবন,  
পি ২৫ কলাকার স্ট্রিট,  
কলিকাতা- ৭০০০০৭.

সম্মাননীয় শ্রীরাজেন্দ্র লোঢ়া মহাশয়ের  
সৌজন্যে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী ২০০০ সাল

স্বত্ত্বাধিকার : জৈন ভবন

মূল্য : একশ' টাকা

মুদ্রক :

শ্রীবিভাস দত্ত  
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স  
৮১ সিমলা স্ট্রিট  
কলিকাতা- ৭০০ ০০৬

## প্রাক্ কথন

শ্রমণ পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো শ্রমণ পত্রিকায় বহু বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রমণ পত্রিকায় সরাক জাতির সংস্কৃতি ও বাংলা দেশে জৈনধর্ম সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। সব লেখাগুলো এতে দেওয়া সম্ভব হয় নি। যার মূল্য এখনও আছে বলে মনে হয়, সেরূপ কয়েকটি লেখা শ্রমণ থেকে বেছে নিয়ে এ বিশেষ গ্রন্থটি তৈরী করা হয়েছে। সরাক জাতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মাজীর অনেক লেখা শ্রমণ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। উনি নিজে স্বয়ং সবগুলো মিলিয়ে একটা নতুন লেখা সম্পাদন করে দিয়েছেন। সেটাই এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। শ্রমণ পত্রিকার লেখাগুলো নেওয়া হয় নি। এ বিশেষ প্রকাশনটিকে সরাক সম্প্রদায় ও বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে একটা প্রামাণিক গ্রন্থ ধরা যেতে পারে।

শ্রমণ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং এপ্রিল ১৯৭৩)। এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয় ১৪০৫ বঙ্গাব্দের, চৈত্রমাসে (ইং, মার্চ ১৯৯৮)। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গণেশ লালওয়ানী। তিনি ১৯৯৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পরলোক গত হলে সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হলো। সেই থেকে এর সম্পাদনা করে আসছি। পত্রিকাটি বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি মাসিক। মূলতঃ বাংলা মাস বৈশাখ থেকে এর বর্ষ গণনা করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক কাব্য, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতিই কেবল মুদ্রিত হয়। জৈনধর্ম সম্বন্ধে যারা জানতে বালিখতে আগ্রহশীল তাদের জন্যই এই পত্রিকা। কেবল মাত্র জৈনধর্মের জন্য একপ আর একটি পত্রিকা বাংলায় আছে বলে আমার জানা নেই। পঁচিশ বছর শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক একপ একটি মাসিক পত্রিকা যে চলে আসছে, সেটাই এর লোকপ্রিয়তা জানিয়ে দিচ্ছে।

জৈন ভবন তিনটি ভাষায় তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করে। বাংলায় শ্রমণ, হিন্দীতে তিথ্যায় এবং ইংরেজীতে জৈন জার্নাল। তিনটি পত্রিকাই জৈনধর্ম ও কৃষ্ণ বিষয়ক।

## প্রাক কথন

শ্রমণ পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্বি উপলক্ষে এই বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো শ্রমণ পত্রিকায় বহু বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রমণ পত্রিকায় সরাক জাতির সংস্কৃতি ও বাংলা দেশে জৈনধর্ম সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। সব লেখাগুলো এতে দেওয়া সম্ভব হয় নি। যার মূল্য এখনও আছে বলে মনে হয়, সেরূপ কয়েকটি লেখা শ্রমণ থেকে বেছে নিয়ে এ বিশেষ গ্রন্থটি তৈরী করা হয়েছে। সরাক জাতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মাজীর অনেক লেখা শ্রমণ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। উনি নিজে স্বয়ং সবগুলো মিলিয়ে একটা নতুন লেখা সম্পাদন করে দিয়েছেন। সেটাই এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। শ্রমণ পত্রিকার লেখাগুলো নেওয়া হয় নি। এ বিশেষ প্রকাশনটিকে সরাক সম্প্রদায় ও বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে একটা প্রামাণিক গ্রন্থ ধরা যেতে পারে।

শ্রমণ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং এপ্রিল ১৯৭৩)। এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয় ১৪০৫ বঙ্গাব্দের, চৈত্রমাসে (ইং, মার্চ ১৯৯৮)। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গণেশ লালওয়ালী। তিনি ১৯৯৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পরলোক গত হলে সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হলো। সেই থেকে এর সম্পাদনা করে আসছি। পত্রিকাটি বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি মাসিক। মূলতঃ বাংলা মাস বৈশাখ থেকে এর বর্ষ গণনা করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক কাব্য, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতিই কেবল মুদ্রিত হয়। জৈনধর্ম সম্বন্ধে যারা জানতে বালিখতে আগ্রহশীল তাদের জন্যই এই পত্রিকা। কেবল মাত্র জৈনধর্মের জন্য এরূপ আর একটি পত্রিকা বাংলায় আছে বলে আমার জানা নেই। পঁচিশ বছর যাবৎ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক এরূপ একটি মাসিক পত্রিকা যে চলে আসছে, সেটাই এর লোকপ্রিয়তা জানিয়ে দিচ্ছে।

জৈন ভবন তিনটি ভাষায় তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করে। বাংলায় শ্রমণ, হিন্দীতে তিথ্যায় এবং ইংরেজীতে জৈন জার্নাল। তিনটি পত্রিকাই জৈনধর্ম ও কৃষ্ণ বিষয়ক।

ଶ୍ରମଣ ଓ ତିଥିଯରେ ବସ ପଂଚିଶ ଏବଂ ଜୈନ ଜାର୍ଗାଲ ଚଲଛେ ଟୋକ୍ରିଶ ବହର ଧରେ । କଳକାତା ଥିକେ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ତିନଟି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ ଥିକେ ଏଦେର ଲୋକଗ୍ରହିତା ଅନୁମାନ କରା ଯାଇ ।

ସରାକ ଶବ୍ଦଟି ସଂକୃତ ଶାବକ ଶବ୍ଦ ଥିକେ ଏମେହେ । ଶାବକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାକୃତେ ସରାଅକ ହୁଏ । ଶାବକ ଶବ୍ଦଟିକେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରଲେ ହୁଏ— ଶ୍ରୀ+ର୍ଣ୍ଣା+ଆନ୍ତା+ବ୍ରୁନ୍ତା+କ୍ରୁନ୍ତା । ଏର ପର ପ୍ରାକୃତେ ତାର ଥିକେ \*ଶରାବକ (ସଂୟୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଙ୍ଗେ ଶା ହେଯେଛେ ଶରା) । ଏର ପର ପ୍ରାକୃତେ ସରାଅକ ଏବଂ ତାର ଥିକେ ସରାକ (ରା ଏବଂ ଅ ସନ୍ଧିତେ ଆ-କାର) । ସୁତରାଂ ଶାବକ ଶବ୍ଦରେ ଯା ଅର୍ଥ ସରାକ ଶବ୍ଦରେ ଓ ତାହି ଅର୍ଥ ।

ଶାବକ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟୁତପତ୍ରିଗତ ଅର୍ଥ ନାନାଭାବେ ଦେଓଯା ହୁଏ । ଶାବକ ହଲେନ ତିନି ଯିନି ଗୁରୁର କାହିଁ ଥିକେ ଉପଦେଶ ଶୋନେନ (ଶୁଣେତି ଯଃ ସଃ ଶାବକଃ) । ଆବାର କେହି ବଲେନ ଯେ ଯିନି ବିଶ୍ଵାସକେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଚଲେନ ତିନି ଶାବକ (ଶ୍ରଦ୍ଧାଲୁତାଂ ଶାତି) । ଆବାର କେହି ବଲେନ ଯେ ଯାର ପାପ ଚଲେ ଯାଇ ମେ ଶାବକ (ଶ୍ରବନ୍ତି ଯମ୍ୟ ପାପାନି) । ଯେଭାବେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହୋଇ ନା କେନ ମୋଟାମୁଟୀଭାବେ ବଲା ଯାଇ ଯେ ଗୁରୁର କାହିଁ ଥିକେ ଯିନି ଉପଦେଶ ଶୋନେନ ତିନିଇ ଶାବକ ।

ଚନ୍ଦ୍ରକୁଳ ଗଚ୍ଛେର ମୁନି ଶାନ୍ତି ସୁରି (ମୃତ୍ୟୁ ୧୦୪୦ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦ) ତାର ଧର୍ମରତ୍ନପ୍ରକରଣ ନାମକ ଗଛେ ଚାର ପ୍ରକାର ଶାବକରେ ନାମ ଉପଲେଖ କରେଛେ । ମେଣ୍ଡଲୋ ହଲୋ—ନାମ, ସ୍ଥାପନା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଭାବ । ନାମ ଶାବକ ହଲେନ ତିନି ଯିନି ନାମେ ମାତ୍ର ଜୈନ । ସ୍ଥାପନା ଶାବକ ହଲୋ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାବକ ଜୈନଧର୍ମର ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ ଆଚାରାଦି ପାଲନ କରେନ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଯ ଶୂନ୍ୟ । ଭାବ ଶାବକ ଜୈନଧର୍ମେ ବିଶ୍ଵାସୀ ।

କିନ୍ତୁ ଦିଗନ୍ଧର ସମ୍ପଦାୟର କୋନ କୋନ ଲେଖକ ଶାବକଦେର ତିନି ଶ୍ରେଣୀତେ ଭାଗ କରେଛେ । ଯେମନ ଆଶାଧର (ଜୟ ୧୨୩୫ ସଂବ୍ରତ) ତାର ସାଗାର-ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ମେଧାବୀ (୧୫୬୧ ସଂବ୍ରତ) ତାର ଧର୍ମ-ସଂଗ୍ରହ-ଶାବକାଚାରେ ଶାବକଦେର ତିନି ଭାଗେ ଭାଗ କରେଛେ । ସଥା—ପାଞ୍ଚିକ, ନୈଟିକ ଏବଂ ସାଧକ । ପାଞ୍ଚିକ ଶାବକ ହଲେନ ତିନି ଯିନି ଅହିଂସାର ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚଲେନ । ନୈଟିକ ଶାବକ ନିର୍ଠାର ସାହାଯ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚଲେନ ଏବଂ ତାର ସିଦ୍ଧପଥ ଲାଭ ହେଲେ ପର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରେନ । ସାଧକ ଶାବକ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିମାର୍ଗେର ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ଲେଖନାର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବନ ସମାଧା କରେନ ।

ଶାବକଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜୈନ ଶାବକାଚାର ଗଛେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ନିହିତ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ଯେ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବଲା ହେଯେଛେ, ତାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱତ ଏକଟା ଜୈନ

ସମ୍ପଦାୟ । ତାରା ଯେ ଜୈନ ସେଟା ପ୍ରାୟ ତାରା ଭୁଲେଇ ଗିଯେଛେ । ଆଚାରେ ବ୍ୟବହାରେ, ଥାଦେ ଓ ବିଲାସବ୍ୟବରେ ତାରା ଜୈନ ମତଟି ପୋୟଣ କରେନ । ଏହି ସରାକ ସମ୍ପଦାୟରେ ‘କାଟା’ ଶବ୍ଦଟା ହିସାର ଦ୍ୟୋତକ ବଲେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନା, ଏମନକି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମୁଖେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ନା । ତାଦେର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଗାଲୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈନଦେର ମତ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଯେ ଜୈନ ଏକଥା ତାରାଓ ଜାନେ ନା ।

ପୁରୁଲିଯାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳେର କାଶୀପୁର, ରୟନ୍ଧୁନାଥପୁର, ପାଡ଼ା, ହଡ଼ା, ନେତୁରିଯା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳେ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଛେ । ବଲଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହବେ ନା ଯେ ପୁରୁଲିଯାର ଯା ଏତିହ୍ୟ, ତାର ବେଶୀର ଭାଗ ଏହି ମାନବ ଗୋଟୀର ଅବଦାନ । ପୁରୁଲିଯା ଅଞ୍ଚଳେର ଛଡ଼ରା, ତେଲକୁପୀ, ପାକବିଡ଼ରା, ଦେଉଲଘାଟା, ଦୁଲମୀ, ପବନପୁର, ବୋଡ଼ାମ, ପାଡ଼ା, ଛବଡ଼ା, ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନେର ମନ୍ଦିରେ ଯେ ଭାକ୍ଷର୍ ଶିଳ୍ପ ଦେଖା ଯାଇ, ତା ସରାକଦେର ପ୍ରାଚୀନ କାର୍ତ୍ତି । କଥିତ ଆଛେ ଯେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିକେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରାକ କାର୍ତ୍ତି । ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ପର ଏକାଦଶ ଥିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରାକରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଭାକ୍ଷର୍ ଶିଳ୍ପ ନିମିଶ୍ଟ ହିଲ । କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିକେ ହିନ୍ଦୁରେ ଫଳେ ବହ ସରାକ ସଂକୃତି, ମନ୍ଦିର ଓ ଭାକ୍ଷର୍ ଶିଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେଯେ ଗିଯେଛିଲ ଏବଂ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟର ଉତ୍ସତ ଅବଶ୍ୟକ ତଥା ଲାଗଲ । କିନ୍ତୁ ଏମନ ଏକଟା କାଳ ଛିଲ ଯେ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟର ଉତ୍ସତ ଅବଶ୍ୟକ ତଥା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାଜେ ଖୁବ ସ୍ଥିରକ୍ରିୟା ପେଯେଛିଲ । ଯୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ କବିକଙ୍କଣ ମୁକୁନ୍ଦରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (୧୫୬୬-୧୫୮୦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବିତ ଛିଲନ) ତାର ଚଣ୍ଡୀ-ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରେ ଗିଯେଛେ—

ସରାକ ବସେ ଗୁଜରାଟେ, ଜୀବଜ୍ଞନ ନାହିଁ କାଟେ,  
ସର୍ବକାଳ କରେ ନିରାମିଷ ।

ପାଇୟା ଇନାମ ବାଡ଼ି, ବୁନେ ନେତ ପାଟ ଶାଡି  
ଦେଖି ବଡ଼ ବୀରେର ହରିୟ ॥

ଏ ଉତ୍କି ଥେକେ ସହଜେଇ ଅନୁମେଯ ଯେ ସରାକ ଗୋଟୀ ତାତ୍ତ୍ଵ ଶିଳ୍ପେ ଏକକାଳେ ଦର୍ଶକ ଛିଲ । ତାରା ତାଦେର କାଜେର ପୁରୁଷାର ସ୍ଵରପ ରାଜାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଅନେକ ବାଡ଼ି ଉପହାର ପେଯେଛିଲ । ତାରା ହିସାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରତ ନା ଏବଂ ନିଜେରା ନିରାମିଷ ଥେତ । ଏ ସକଳ କଥାଟି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସରାକ ସମ୍ପଦାୟର ଆସଲେ ଜୈନ ।

কালক্রমে সরাকেরা আঞ্চলিক ফলে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল  
এবং কালে হিন্দুধর্মে জীবন্তির হতে লাগল। কিন্তু হিন্দুনীর মধ্যেও তারা  
তাদের পূর্ব ধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করে নি। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সরাকদের  
মধ্যে অনেক বিচার আছে। লাইপুই শাক, লাল সীম, গাজর প্রভৃতি লাল রঙের  
খাবার তারা খায় না। এমন কি, ডুমুর, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি খায় না। তাদের  
খাওয়া নিয়ে জন সমাজে একটি সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে—

উমুর ডুমুর পুড়ুং ছাতি।

তিন খায় না সরাকজাতি।

বিবাহাদি ব্যাপারেও সরাকদের কিছু বিশেষত্ব আছে। তাদের বিবাহে কিন্তু  
ফুলশয়া বা বাসর জাগানোর কোন নিয়ম নেই। কিন্তু অগ্নি সাক্ষী রেখেই যজ্ঞ ও  
হোম করে, পরে কনের সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে দেয়। যাই হোক, এই অবস্থার  
মধ্যে সরাক সম্প্রদায়ের আজও বিদ্যমান।

প্রস্তুত গ্রন্থটি সেই সরাক সম্প্রদায়ের লুপ্ত ইতিহাস। সরাকদের সন্ধে কিছু  
তথ্য দেবার জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা। সরাকদের সঙ্গে বঙ্গদেশে জৈনধর্মের  
সম্পর্ক থাকায় বঙ্গদেশে জৈনধর্মও এর সঙ্গে সংযোজিত হলো। আশা করি  
পাঠকদের এতে সুবিধে হবে।

এ বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে শ্রীদিলীপ সিংহ নাহটা মহাশয়ের উৎসাহ ও  
পরামর্শ আমাকে যথেষ্টভাবে প্রোৎসাহিত করেছে। তাঁর নিয়মিত প্রেরণা না  
থাকলে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। তিথ্যরের সম্পাদিকা শ্রীমতী লতা  
বোঝরা সর্বরকম ভাবে এ বিশেষ গ্রন্থটির একটি রূপ দিয়েছেন। এই বিশেষ গ্রন্থ  
প্রকাশ ব্যাপারে যা কিছু কৃতিত্ব তা সম্পূর্ণভাবে এ দু'জনের প্রাপ্য। এদের দু'জনের  
নিকট আমি বিশেষভাবে ধীরী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাকে সাহায্য  
করেছেন, তাঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতা চিন্তে স্মরণ করছি। যদি এ সংস্করণটি জন  
সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, তাহলে আমার শ্রমকে সাফল্য বলে মনে করবো।

ইতি

কলিকাতা

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

## সূচীপত্র

### ১. সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

#### যুধিষ্ঠির মাজী

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি	১
সরাকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৩
সরাকদের গোত্র পিতা	১৫
প্রাচীন অর্থনীতিতে সরাকদের ভূমিকা	১৬
সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাহিনী ও কিংবদন্তী	১৯
উড়িয়ার সরাক সংস্কৃতি	২৭
পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি	৩৬
এক. পুরুলিয়া	৩৬
দুই. পাকবিড়রা	৩৯
তিন. বোড়াম	৪৫
চার. বুধপুর-পলমা-মহাদেব বেড়া	৫০
পাঁচ. পাড়া	৫৩
ছয়. দেউল ভিড়া	৫৭
সাত. ছড়ারা	৬০
আট. তেলকূপী	৬২
নয়. চেলিয়ামা	৬৭
দশ. শেষের কথা	৭০

### ২. বাংলার আদি ধর্ম

#### প্রবোধচন্দ্র সেন

১

১

১৫

১৬

১৯

২৭

৩৬

৩৬

৩৯

৪৫

৫০

৫৩

৫৭

৬০

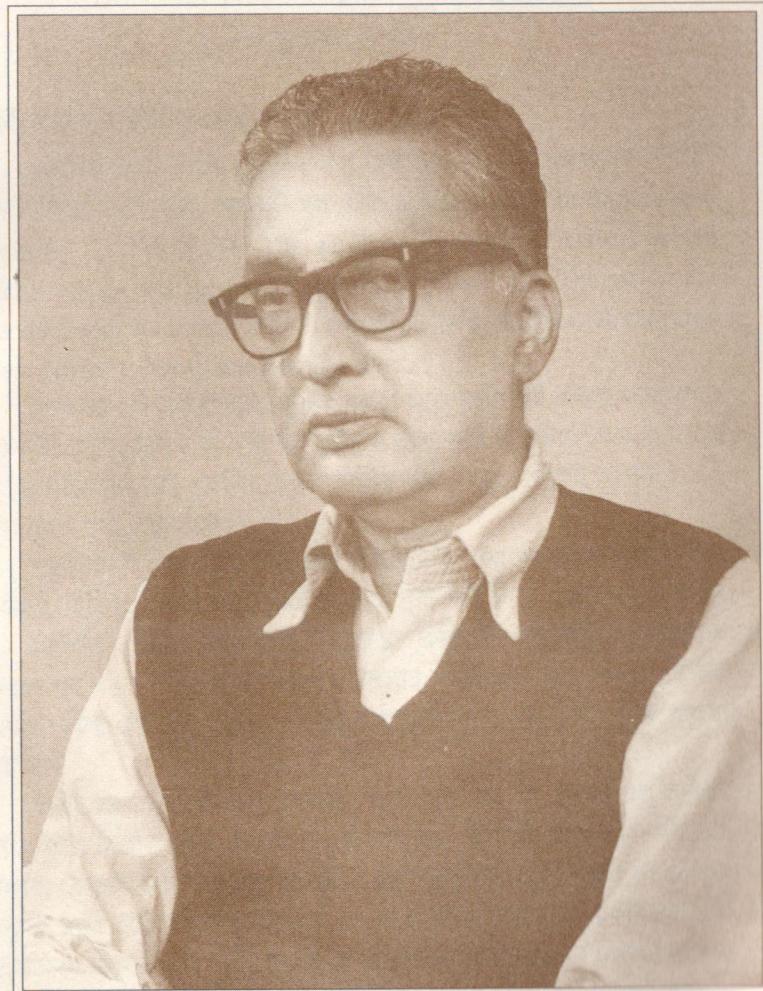
৬২

৬৭

৭০

৭৩

৩. বঙ্গদেশে জৈনধর্ম	১২৭
ক্ষিতিমোহন সেন	
৪. বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব	১২৮
রামপ্রসাদ মজুমদার	
৫. বাংলাদেশের গুপ্তকালীন জৈন তাত্ত্ব শাসন	১২৯
ছোটেলাল জৈন	
৬. উত্তির্যায় জৈনধর্ম	১৩৮
৭. বাঁচুড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জিনসিনী	১৫২
বীরেশ্বর বন্দ্যোগাধ্যায়	
৮. ছড়ো গ্রামের জৈনমন্দির	১৫৭
তপন চক্রবর্তী	
৯. রাজা পুন্ড্র ও তাঁর রাজধানী	১৫৯
হরিপ্রসাদ তেওয়ারী	
নৃসিংহপ্রসাদ তেওয়ারী	
১০. সকলন	১৬৫
বিমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
১১. পুরুলিয়ার একটি জৈন পুরাক্ষেত্র	১৬৭
শিবেন্দু মাণা	
১২. তাত্ত্বলিপ্তে জৈনধর্ম	১৭৬
কোরক চৌধুরী	
সৌমেন্দু চক্রবর্তী	
১৩. পুঁচড়ার জৈন পুরাকীর্তি	১৮১
তপন চক্রবর্তী	



গণেশ লালওয়ানী (১৯২৩-১৯৯৪)

প্রতিষ্ঠা সম্পাদক, শ্রমণ পত্রিকা

# সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি যুধিষ্ঠির মাজী

## পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি : গোড়ার কথা

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির গোড়ার কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের মনের আকাশে  
তিনটি কথা উদয় হয়। প্রথমটি হল-The cossai is rich in architectural  
remains,<sup>১</sup> দ্বিতীয়টি হল- The saraks have been described as the  
remnant of an archaic community.<sup>২</sup> আর তৃতীয়টি হল- The saraks are  
credited with buildings, the Temples at Para, Charra, Boram and  
other places in these pre-Bhumej days.<sup>৩</sup>

প্রথম কথাটির মধ্যে আছে সৃষ্টির কথা। আর অপর দুটি কথার মধ্যে আছে  
শ্রষ্টার ইতিহাস। সৃষ্টি এবং শ্রষ্টা এই দুটোকে ভাল করে না জানলে জানার কাজে  
পূর্ণতা আসে না। তাই পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির কথা বলতে গেলেই আপনা হতেই  
সরাকদের কথা এসে যায়।

পুরুলিয়া অঞ্চলের এই সৃষ্টি এবং শ্রষ্টা দুটোই আমাদের কাছে অজানা রয়ে  
গিয়েছে। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প ও পুরাকীর্তি নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান  
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থে পুরুলিয়ার পাথরের মন্দিরগুলোর  
প্রসঙ্গে খুব কম কথাই আছে। পশ্চিম বাংলার মানুষদের নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত  
হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থেও পুরুলিয়ার পাথুরে মানুষ সরাকদের খুঁজে পাওয়া  
যায় না।

অতীতের কংসাবতী হল রত্নগর্ভ। তার বুকে কত যে অমূল্য রত্ন লুকিয়ে  
আছে তার হিসেব কেউ রাখেন না। কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চল পাকবিড়রা,  
বুধপুর, বোড়াম অতীতের শুধু তীর্থভূমিই নয়, রত্নভূমিও বটে। পাথর যে সোণার  
চেয়েও দানী হতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যায় না। পাকবিড়রা তো  
পুরুলিয়ার যাদুঘর। এর মাটিতে কত যে অমূল্য ভাস্কর্য শিল্পকলার নির্দশন লুকিয়ে  
আছে তার কোন হিসেব নেই। এখান থেকে কত অমূল্য শিল্পজ্যো বিদেশের বাজারে  
পাচার হয়ে গিয়েছে তারও হিসেব আমরা রাখি না।

১. Lt. Col. ET. Dalton

২. Mr. G. Coupland.

৩. Mr. G. Coupland.

বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত অতীতের বুধপুর আজ মৃত। কিন্তু এই মৃতদেহে ময়না তদন্তের কাজ চালালে যে জৈন ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাবে সেটা সোনার ঢেয়ে কম দামী হবে না।

বলরামপুর, বোড়াম, দুলমী প্রভৃতি পুরাক্ষেত্রের মাঝে আজও ইতিহাস বন্দী হয়ে আছে। বোড়ামের তীর্থক্ষেত্রে মহিষাসুর মন্দিনী অষ্টভূজা দুর্গা ভাঙ্মা মন্দিরের রূপ্ত্ব কক্ষে যেন ফসিল হয়ে গিয়েছে। চাপা পড়ে গিয়েছে অতীতের এক গৌরবময় ইতিহাস।

দামোদর এককালের বিপদজনক নদ। এর তীরবর্তী অঞ্চল তেলকুপী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, পাড়া দেউল ভিড়া অতীতের পুণ্য তীর্থভূমি। তেলকুপীর বুকে ঘূরিয়ে আছে থায় দেড় হাজার বছর আগের নগর সভ্যতার এক চমকপ্রদ নির্দশন। কত বগিকের কর্মসূল, কত শিল্পকলার বাজার, কত মানুষের লীলাভূমি এই তেলকুপী তার হিসেবে আমরা রাখতে পারেন।

মন্দির শিল্পের প্রাচীনতম নির্দশন বুকে নিয়ে পাড়া আজও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। এখানের মন্দির প্রাঙ্গণে সুদর্শনা নর্তকীদের অপূর্ব দেহবিন্যাস আর নৃত্য পদ্মপাতের সুমধুর ধ্বনি কোন এক দূরাগত শব্দহীন সঙ্গীতের মত আমাদের মরমে প্রবেশ করে রক্ত ধারায় ঝাড় তোলে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কংসাবর্তী, সুবর্ণরেখা, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি নদ-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সেদিন কোল, ভীল, সাঁওতাল ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের নির্দশন ছিল না।

আদিবাসীরা এখানে এক বিপদজনক জাতি বলে পরিগণিত হত। এই জপলময় দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ম আকাশে হঠাতে একদিন দেখা গেল আলোর নিশানা। শ্রমণ সংস্কৃতির এক বিরাট ঢেউয়ে যেন অতীতের মানুভূম, ধলভূম, সিংভূম এবং উড়িষ্যার বেশ কিছুটা জপলময় অঞ্চলকে ভাসিয়ে দিল। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠল বন কেটে বস্ত। প্রাণহীন বোবা পাথরের বুকে দেখা গেল হ্যাদ্যস্ত্রের গতি। পাথরের বুকে শোনা গেল মন রাজার গনি।

কত শিল্পীর সাধনা হল ধন্য। অহিংসা ধর্মের কত প্রাণপুরুষ লাভ করল দেবত্ব। কত দেবদূত ছড়িয়ে পড়ল পুণ্যময় জপল ভূমিতে। সেদিন পাথর সোণার দামে বিক্রি হবার জন্য এসে হাজির হল তামালিষ্ট বন্দরে। সেখান থেকে পাড়ি দিল জাভা, বর্নিয়ো, সারাওয়াক প্রভৃতি দেশের নানা অঞ্চলে।<sup>8</sup>

সারাওয়াকের সাংস্কৃতিক জীবনে এখানের অতীতের সারাকদের কোন প্রভাব পড়েছে কিনা জানি না। যাইহোক অতীতের ছোটনাগপুরের এই বিস্তৃত মালভূমি

৮. সারাওয়াক উন্নত বর্ণিয়োর একটি দেশ।

প্রধান অঞ্চল ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রের পূর্ব ভারতের এক কেন্দ্র ভূমিতে রূপান্তরিত হল।

উড়িষ্যার অতি কাছে উড়িষ্যার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণের গান শোন গেল পুরালিয়ার মাটিতে। কিন্তু শিল্পদর্শে পুরালিয়া যেন উড়িষ্যা থেকে অনেক দূরে সরে গেল। এখানে যেন কামের মৃত্যু হল। জন্ম নিল প্রেম। কত যক্ষিণী প্রেমের ডালা সাজিয়ে বসে রইল মন্দির গাত্রে। কত নর্তকীর নাচের ছন্দে পুরালিয়ার শক্ত মাটি কেঁপে উঠল। এখানের ভাস্কর্য শিল্প জাত নরনারীরা নিজেদের দেহ দেখিয়ে মানুষের মন ভুলায় না। গান গেয়ে আমাদের মনকে মুক্ত করে। হিংসা নয়, অহিংসার বাণী নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হলেন অহিংসা ধর্মের প্রাণপুরুষ মহাবীর। কালগ্রন্থে তিনি আবার রূপান্তরিত হলেন মহাকাল ভৈরবে। ভাঙ্মা মন্দির ভাঙ্মা শিল্পকলা। কিন্তু কে ভাঙ্ম সভ্যতার ইমারত ? মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলে দেখা যাবে কত ধর্ম গৌঢ়া মানুষের কালো হাত সুন্দরকে করেছে অসুন্দর। মন্দিরকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। মন্দিরের মহামূল্য শিল্পকলায় সমন্বয় ছাল ছাড়িয়ে তার কবর দিয়েছে মন্দিরের পাদদেশে। কত অমূল্য শিল্পকলা নিষ্ক্রিপ্ত হয়েছে নদীতে, পুরুরে, বনে-জঙ্গলে। স্বর্গকে টেনে নামিয়েছে নরকের মাঝে। কে করল এই অপকর্ম তা ইতিহাসের বুকে লেখা নেই; লেখা আছে এখানকার পাষাণ ফলকে।<sup>৯</sup> পুরালিয়ার ভাস্কর্য শিল্প অতীত পুরালিয়ার এক জীবন্ত ইতিহাস। অতীতের মহান তীর্থকর, ধরণেন্দ্র পদ্মবর্তী, শিব পার্বতী, মহিষাসুর মন্দিনী দুর্গা, কুমারী দেবী, পর্ণশবরী, দেবী অচ্যুতা, দেবী অশ্বিকা, কুমার কার্তিক, গণেশ, আর লীলাময়ী যক্ষিণীরা মিলে মিশে রচনা করেছেন অতীতের এক দৃশ্য মহাকাব্য। এই বিরাট মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাদের একদিন মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ওঁরা মরেন নি, বেঁচে আছেন উন্নত পুরুষদের জন্য কিছু ইতিহাস হাতে নিয়ে।

বেঁচে আছেন অমর শিল্পকলার স্বষ্টাদের উন্নত পুরুষ সীমান্ত বাংলার সরাক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রান্তে এত প্রাচীন জৈন জাতি বাস করেন কিনা আমার জানা নেই। হাজার হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন ও সামাজিক বিবর্তন সহ্য করেও সরাকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। তাঁরাই সন্তুষ্টতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের জৈন্য ধর্মে দীক্ষিত জনগণের উন্নত পুরুষদের একটি শাখা। এই শাখার মানুষ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই।

৯. ভাস্ত ধর্ম চিষ্টা ও ধর্মীয় গৌড়ামী পৃথিবীর মানুষের যত রক্ত ঝরিয়েছে, মানুষ সভ্যতার যত ক্ষতি করেছে ততটা ক্ষতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে করাতে পারেন। জাস্ত ধর্ম চিষ্টা পৃথিবীর বহু যুদ্ধের কারণ হয়েছে।

॥ এক ॥  
সরাকদের সংস্কৃত পরিচয়

পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলাকে যদি উভর দক্ষিণে দুভাগে ভাগ করা হয় তবে দেখা যাবে যে দক্ষিণের বাঘমুড়ি, বলরামপুর, বালদা, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন মাহাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে, ঠিক তেমনি উভরাখণ্ডের কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পাড়া, ছড়া, নেতুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরাক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আছে। সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের অভাবে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম মানুষদের ধারণা খুব বেশি নেই। অনেকে মনে করেন সরাক জাতির মানুষেরা কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটের আছেন এবং এঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু এঁদের সংখ্যা অল্প নয়। উপর্যুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও সম্প্রদায়গত একতার অভাবে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বৃহত্তর মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ এঁদের যা ঐতিহ্য আছে পুরুলিয়া জেলার অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর তা নেই।

সরাক সম্প্রদায় এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিবাসীদের পরেই এঁদের স্থান। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বা ৬০০ বৎসর আগে এই মালভূম অঞ্চল ছিল এক বিশাল অরণ্যভূমি। কোল, ভীল আর সাঁওতাল জাতির মানুষ ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের সন্ধান এখানে পাওয়া যেত না। এই আদিবাসীরা ছিল বজ্রের মত কঠিন এবং বিপদজনক সম্প্রদায়। এই কারণে আদিবাসীদের বলা হত বজ্রভূমিজ। এই সময়ের অনেক আগে থেকেই জৈন ধর্মের প্রচার করা এই জনসন্ময় ভূমিতে এসে এক নতুন সভ্য সমাজ গড়ে তুলে ছিলেন। তখন এই জৈন ধর্মবলধী মানুষদের বলা হত সুধী ভূমিজ। এই সুধী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই অঞ্চলে সরাক নামে পরিচিতি লাভ করেন। পাশ্চান্ত্য পশ্চিতগণের মতে সরাক শব্দটি শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্রোতা। বৈদিক যুগে যেমন করে ঝুঁটির অনার্যদের সরিয়ে দিয়ে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বন কেটে আশ্রম বানিয়ে সাধন ভজনের মধ্য দিয়ে এক নতুন সভ্যতার আলো জ্বলে ছিলেন, ঠিক তেমনি সরাকেরাও এই অঞ্চলে এসে আর্য সংস্কৃতির আলোকে উদ্ঘাসিত করেছিলেন বনাঞ্চল। মিস্টার ডাবলিউ হান্টারের ভাষায় বলা যায়—

The early Jain devotees, like the primitive Risis on the vedic period went out and established hermitage in the jungles which became the centre of a colony of Jain worshippers.<sup>৬</sup>

প্রাচীন সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হল ভাস্কর্য শিল্প। সরাকেরা তো আবার শিল্পীর জাত। তাছাড়া ধৰ্ম সংস্কৃতির প্রয়োজনেও সরাকেরা আশ্রয় নিলেন ভাস্কর্য শিল্পের দেবতার কাছে। ছড়ারা, তেলকুপী, পাকবিড়ারা, দেউলঘাটা, দুলমী, পবনপুর, বোডাম, পাড়া, ছবড়া, সেনেড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ করে সরাকেরা একটা বিশেষ সংস্কৃতির ভিত্তিকে পাকা করে নিলেন। এইসব স্থানে সরাকদের প্রাচীন ঐতিহাসিক নির্দেশন আজও বজায় রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে থেকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত সরাকেরা মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দী থেকে তাঁদের কাজে বাধা এসেছিল। এই বাধার প্রাচীর শক্ত হয়েছিল একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই সময়টাতেও বেশ কিছু মন্দির ও ভাস্কর্য শিল্প তৈরী হয়েছে কিন্তু ধ্বংস হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

তাই বলা যায় এই অঞ্চলে সরাক সংস্কৃতির গতিপথ সোজা পথে চলেনি। প্রথম দিকে তাঁরা আদিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে বসত বানিয়েছিলেন। এই বসতের নাম দিয়েছিলেন বীরভূমি। তীরঝর্কর মহাবীর যখন এখানে এসেছিলেন তখন এই অঞ্চলটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল— বীরভূমি আর বজ্রভূমি। বজ্রভূমি ছিল আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চল। আদিবাসীরা মহাবীরকে ভাল চোখে দেখতে পারেন। তারা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তীর দিয়ে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিল সরাকেরা।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী হতে তথাকথিত হিন্দু বা ব্রাহ্মণবাদের ধারক ও বাহক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম বেথেছিল সরাকদের। গোঁড়া হিন্দুরা সরাক সংস্কৃতিকে এই অঞ্চল থেকে মুছে ফেলতে সরাক বিতাড়নের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই আক্রমণের তীব্রতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। বহু মন্দির ভাস্তা হয়েছিল। বহু ভাস্কর্য শিল্প নষ্ট করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিন্দুদের ভাস্কর্য শিল্প ধ্বংস হয়েছে মুসলমানদের হাতে। কিন্তু এই অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারা কোন ধ্বংস লীলা চলেছিল এমন নজির ইতিহাসে নেই। তাছাড়া মন্দির থেকে জৈন বিগ্রহ সরিয়ে সেথানে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন মুসলমানেরা একথা ভাবা যায় না। তাই পুরুলিয়া অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের ধ্বংস কর্তা যে গোঁড়া হিন্দু বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।<sup>৭</sup> এই কাজে ধ্বংস কর্তারা যে হিন্দু রাজাদেরও সমর্থন লাভ করেছিলেন তারও কিছু কিছু নজির রয়েছেন।

৬. এ অভিমত পাশ্চান্ত্য পশ্চিতগণের। আমার মতামত গ্রহের শেষের কথায় আছে।

বরাকরের সুন্দর পাথরের মন্দিরগুলো তো এককালে জৈন মন্দিরই ছিল। ওইগুলো তৈরী হয়েছিল ওই অঞ্চলের সরাকদের হাতে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য সরাকেরা গুজরাট থেকে সরাক শিল্পীদের আনিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার জি. কুপল্যান্ড কিস্তিমাতার আকারেই যে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি।

There is a tradition that they (Saraks) ordinarily came from Gujrat but in the former district the popular belief is that they were brought the sculptors and masons for the construction of stone temples and houses the remains of which are still visible on the bank of Barakar.<sup>৮</sup>

কিন্তু বরাকরের এই সুন্দর সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দিরগুলো শিব মন্দিরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় এই মন্দিরগুলোকে শিব মন্দিররূপে।

বরাকরের জৈন মন্দিরগুলোকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তর করার কাজে ওই অঞ্চলের এক রাণীর নাম পাওয়া যায়। রাণী হরিপ্রিয়া ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে জৈন বিগ্রহ সরিয়ে এইসব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

On the most modern is an inscription in old Bengali dated 1383 of the Saka era, corresponding to A.D. 1455 recording the dedication of some idols by Haripriya the favourite wife of a king. Statistic Accounts of Bengal vol. XVII by W.W. Hunter.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সেকালের পুরলিয়া অঞ্চলের গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে শুধুমাত্র এই অঞ্চলের মন্দির ও ভাস্তু শিল্পই নষ্ট হল না, সরাক জাতিও নষ্ট হতে চলে। সরাকেরা ঘর-বাড়ি ছাড়লেন, মন্দির ছাড়লেন, দেশ ছাড়লেন, ছাড়লেন শিল্পকর্ম। তাঁরা পালিয়ে গেলেন দূর দেশে। একটা প্রাচীন সংস্কৃতির বিরাট বাড়ির ভাঙ্গ ইট, কাঠ, পাথরগুলো যেন বারে পড়তে লাগল। সরাকদের এই অসহানীয় অবস্থার কথা স্যার হারবাট রিশলে তাঁর চোখের জন্মে লিখে গিয়েছেন ভারতের জনগণ গ্রহে-

They (Saraks) have split up into endogamous groups based partly on locality and partly on the fact that some of them have taken

to the degraded occupation of weaving and they now form a Hindu Caste of ordinary type.<sup>৯</sup>

ফলে ধর্ম-কর্ম ছেড়ে মানুষগুলো গ্রামে গ্রামে তাঁত বুনতে আরম্ভ করলেন। জন্ম হল সরাকী তাঁতির। উত্তিয়ার গ্রামাঞ্চলে ও পশ্চিমবাংলার বিষুপুরে এরা আজও আছেন।

ছিলেন কবি কক্ষণ চন্দ্রীর যুগেও। আসলে সরাকেরা শিল্পীর জাত। যে হাতে পাথর কেটে মূর্তি বানিয়ে তাতে প্রাণ স্পন্দন জাগিয়ে হাদয়ের গান শুনিয়েছিলেন, সেই হাতেই কাপড় বুনে তৎকালীন রাজাদের কাজে বাড়ি উপহার পেয়েছিলেন। মধ্য যুগে সরাকদের অবস্থা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চন্দ্ৰবৰ্তী তাঁর চন্দ্রীমন্দিরে লিখেছেন :

সরাক বসে গুজরাটে, জীব জন্ম নাহি কাটে,  
সৰ্বকাল করে নিৱামিষ।  
পাইয়া ইনাম বাড়ি বুনে নেত পাট শাড়ি  
দেখি বড় বীরের হৱিষ।

শিল্পীর জাত সরাকেরা কাপড় বুনে কৃতিত্ব দেখালেন। তাঁরা তসর শিল্পে, পাট শিল্পে, দক্ষ শিল্প হয়ে উঠলেন। উত্তিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমবাংলার বিষুপুর, বাঁকুড়া আর রঘুনাথপুর তাঁদের যাদু দণ্ডে তসর শিল্পে বিখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু সরাকদের এই সুনাম সহ্য হল না গেঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। তারা সরাকদের জোলা বলে উপহাস করলেন। এরই নির্দশন পাওয়া গেল ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে। সরাকেরা কাপড় বুনত বলেই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের রচয়িতা সরাকদের জোলা বলে বৰ্ণনা করে গিয়েছেন। সে সময় জোলারাও কাপড় বুনত। জোলারা মোটা কাপড় বুনত। অর্থাৎ সুতার কাপড়। কিন্তু সরাকেরা মোটা কাপড় বুনতেন না। তাঁরা ছিলেন নেত এবং পাট শিল্পী। এই পাট আর তসরের কাপড় পরত দেশের সব বড় মানুষেরা। সুতরাং ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের মত্ব্য বিভ্রান্তিমূলক। এই বিভ্রান্তির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার কুপল্যান্ড লিখেছেন-

The origin of the caste is ascribed in the Brahma Vaivarta Purana to the union of Jolaha man with a woman of the Kuvinda or weaver caste. This however merely shows that at the time when the puran was composed or when the passage was interpolated the saraks had already taken to weaving as a means of livelihood.<sup>১০</sup>

৯. The people of India.

১০. Gazetteer of Manbhum District— G. Coupland.

## সরাক সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশে জৈনধর্ম

সরাকদের প্রতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ ধারণার একটা বড় ধরণের উদাহরণই রেখে গিয়েছেন ব্রাহ্মণ পদ্ধিতি সমাজ তাঁদের অজান্তে তাঁদের নিখিত গ্রহ ব্রহ্মাবের্ত পুরাণে। দীর্ঘাদিন ধরে ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া হিন্দুদের মানুষদের কাছ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের ভূমিজ রাজাদের অনুগ্রহে বসবাস করার একটা প্রবণতা এসে গিয়েছিল। কবি কঙ্কণ চৰ্তুর যুগ থেকে বর্ণী আগমনের কাল পর্যন্ত সরাকেরা রাজাদের আশ্রয়ে বসবাস করে এসেছেন। ধলভূমের রাজা মানসিংহের আশ্রয়ে বহু সরাক প্রজা বাস করতেন। রাজা মানসিংহের সঙ্গে সরাকদের সম্পর্কটা খারাপ ছিল না। তবে এক সময় রাজা মানসিংহ সরাক পরিবারের কোন এক মেয়ের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করায় সরাকেরা রাজা মানসিংহের প্রতি বিরুদ্ধ হন ও তার প্রতিবাদে দলে দলে ধলভূম ত্যাগ করে পাঁচেট অঞ্চলে চলে আসেন। সরাকেরা অন্যায় যেমন করেন না ঠিক তেমনি অন্যায় সহ্য করেন না। এই ঘটনায় সরাকদের সেই মানসিকতাই ফুটে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা স্থীকার করে নিয়ে মিস্টার কুপল্যান্ড নিখিলে-

They (Saraks) first settled near Dhalbhumi in the estate of a certain man Raja. They subsequently moved in a body to Panchet in consequence of an outrage contemplated by Man Raja on a girl belonging to their caste. »

ধলভূম থেকে পালিয়ে আসা সরাকদের এই শাখা পঞ্চকোট রাজার শান্তার পাত্রে পরিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এখানে তাঁদের নবজন্ম হয়। অর্থাৎ তাঁরা জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা এখানে পঞ্চকোট রাজাদের সাহায্যে হিন্দুদের মত পদবী ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করেন।

সরাকদের এই জৈন ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরের পশ্চাতে এক চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। এই সময়টা ছিল বাংলায় বর্গী আগমনের কাল। তখন কাশীপুরের রাজাদের রাজধানী ছিল পঞ্চক্ষেট পাহাড়ের পাদদেশে। বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজ পরিবারের কোন এক শিশুপুত্রকে নাকি সরাক সমাজের কোন একজন লুকিয়ে রেখে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। তারপর একটু বড় হলে এই ছেলেকে তাঁরা রাজ পরিবারে ফেরত দিয়েছিলেন। এরই প্রতিধানে সরাকেরা হিন্দুদের মত মর্যাদা, সম্মান ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করেন। আর চাষ যোগ্য বহু জমি দিয়ে রাজ পরিবারের লোকেরা সরাকদের প্রতিশিল এবং দক্ষ চাষীতে রূপান্তরিত করেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার কুপল্যান্ডের অভিমত হল—

They (saraks) were not served by Brahmins of any kind until they were provided with a priest by a former Raja of Panchet as a reward for a service rendered to him by Saraks who concealed him when his country were invaded by the Bargis in the Marhattas.<sup>12</sup>

সরাক সম্প্রদায়ের পদবীগুলো নাকি সবই রাজাদের দেওয়া। এই পদবীগুলো হল- মাজী, মন্ত্র, নায়েক, পত্র, বৈষ্ণব, সিংহ প্রভৃতি। পশ্চিম বাংলার বাইরের সরাকদের এই ধরণের পদবী দেখা যায় না। বিহারের গ্রামাঞ্চলের সরাকদের ও পাবাপুরী অঞ্চলের সরাকদের এই ধরণের পদবী নেই। উড়িষ্যার সরাকদের মধ্যেও এই ধরণের পদবী দেখা যায় না।<sup>১০</sup> সুতরাং এখানের সরাকদের পদবীগুলো যে রাজাদের দেওয়া ‘রাজ টাইটেল’ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরাকদের পদবীগুলো রাজাদের প্রচেষ্টায় পান্টালেও তাঁদের গোত্রগুলো কিন্তু আগের মতই রয়ে গিয়েছে। সরাকদের মূল গোত্র দুটি আদিদের এবং খ্ববিদের বা খ্ববদেবে। এছাড়া কিছু কিছু স্থানে শাস্তিন্য, কাশ্যপ, অনন্তদেব, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি গোত্র দেখা যায়। গৌতম গোত্র বীরভূমের সরাকদের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ ପଥକୋଟେ ଆଗତ ସରାକେରା ଚାର ଭାଗେ ଭାଗ ହେ ସାର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ହାନେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େନ । ସୀରା ପଥକୋଟେର ରାଜାଦେର ଦେଓୟା ଜମି-ଜମା ନିଯେ ମାଟି ଆଁକଡ଼େ ପଥକୋଟେଇ ପଡ଼େ ରାଇଲେନ ତାଂଦେର ବଳା ହଲ ପଥକୋଟିଆ । ଓହି ସମୟ ପଥକୋଟିଆଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ମାତ୍ର ୧୮୦୦ । ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ ଆରା ୧୪୦୦ ସରାକ ଏଂଦେର ସନ୍ଦେ ଯୋଗ ଦେନ । ଫଳେ ପଥକୋଟିଆଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା କୌଲିନ୍ ପ୍ରଥାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଆଗେକାର ଆସା ୧୮୦୦ ସରାକଦେର ବନ୍ଧୁରେରୋ ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ ଆଗତ ୧୪୦୦ ସରାକଦେର ବନ୍ଧୁରଦେର ଚିଯେ କୁଳିନ ବଳେ ବିବେଚିତ ହେ ଥାକେନ ।

ঁারা দামোদর নদী পার হয়ে বর্ধমান জেলায় চলে গেলেন, তারা হংস নদীপারিয়া। যাঁরা বীরভূমে চলে গেলেন, তাঁদের বলা হল বীরভূমিয়া। আর যাঁরা ঝাঁঁচি জেলায় তামার পরগণায় চলে গেলেন, তাঁরা হলেন তামারিয়া।

ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ ପଞ୍ଚକୋଡ଼ିଆରୀ ଆବାର କରେକାଟ ଭାଗେ ଭାଗ ହୁଏ ଯାଏ ଅଛି ବିହାରେ କିଛୁ ଅଥବା ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େନ । ଏହାଡା ବିଷୁପୁର ଅଥବା ଲେଖନ ସରାକେରା ଅନେକ ଆଗେ ଥେବେଇ ବସ୍ତର ଶିଳ୍ପେ ନିୟମିତ୍ତ ଛିଲେନ ବଳେ ତାଦେର ବଳା ହତ ସରାକୀ ତାତୀ । ଏହିର ମଧ୍ୟେ ଆବାର ଅଶ୍ଵିନୀ ତାତୀ, ପାତ୍ର, ମାନ୍ଦାରାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଗେ ଭାଗ ହେଁ ଯାଏ । ସାଁତୋତାଳ ପରଗଣର ସରାକେରା ପ୍ରାୟ ଚାରଟି ଭାଗେ ଭାଗ ହେଁ ଗିଯାଇଛି, ସଥା-ଫୁଲ ସରାକୀ, ଶିଖରିଆ, କାନ୍ଦାଳା ଏବଂ ସରାକୀ ତାତୀ ।

**22. Gazetteer of Manbhum District**

১৩. বর্তমানে ডিভিয়ার সরাকেরাও বেশ কিছু ডাঢ়িয়ায় প্রচলিত মন্দির আছে।

সরাকদের এই বিভাজনটা ঘটেছিল তিন থেকে চারশ বছর আগে। প্রায় ৬০০ বছর আগে এই অঞ্চলটা সরাকদের আদিবাস ভূমিই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা বিভাড়িত হয়ে তাঁরা অনেকটা যায়াবর জাতির মত বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর আবার সরাকদের একটা শাখা ফিরে এসেছিলেন নিজ বাসভূমে স্থানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সরাক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার নিখুঁত নির্দর্শনটি দেখা যায় পাঁচেত অঞ্চলেই। এখানের সরাকেরা খুব ব্রাহ্মণশীল বলে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে যে ধরনের আত্মর্যাদা দেখা যায় সেরকমটি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না।

এই বিশ্ব শতাব্দীতেও এখানকার সরাকদের যে সব বৈশিষ্ট্য সব সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণ করে তা হল-

- ১) সরাকেরা সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। সরাক মেয়েরা রান্নার সময় কাটা শৰ্কটি ব্যবহার করেন না।
- ২) সরাক সমাজের কোন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন না।
- ৩) নিজেদের কোনরূপ নীচ কাজে বা অর্যাদাকর পেশায় নিযুক্ত করেন না।
- ৪) সরাকদের কোন মানুষ কোনরূপ ঘৃণ্য অপরাধের জন্য আদালত থেকে শাস্তি পান নি। অর্থাৎ এঁদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প।
- ৫) মেয়েরা খুব রক্ষণশীল। বাইরে কোনক্রমেই অন্য কোন জাতের বাড়িতে অন্ম গ্রহণ করেন না বা রাত কাটান না।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত বিভিন্ন পণ্ডিতগণের রচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান লাভ করে সরাকদের সামাজিক র্যাদাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিস্টার ই. টি. ডার্পন পুরলিয়ার সরাক প্রভাবিত গ্রাম ঝাঁপড়া পরিদর্শন করেন। তিনি সরাক সমাজের মানুষদের আচার আচরণ, রীতিনীতি ও তাঁদের ব্যবহারে মুন্ফ হয়ে লিখেছেন-

They called themselves Saraks and they prided themselves on the fact that under our government not one of their community had ever been convicted of a heinous crime.<sup>১৪</sup> তিনি আরও তাঁদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রশংসন করে লিখেছেন- Who (Sarak) struck me as having a very respectable and intelligent appearance.<sup>১৫</sup>

<sup>১৪</sup>, Notes on a Tour in Manbhumi in 1864-65.

<sup>১৫</sup>, The People of India.

সরাকেরা তাঁদের সেদিনের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছেন। তাঁরা একটা সুশঙ্খল জাত। সরাকেরা আইন মাথা পেতে নিয়ে বাস করতে ভালবাসে। কোন কারণেই তাঁরা কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। মিস্টার ডার্পনের ভাষায়- They are essentially a quiet and Law abiding community living in peace among themselves and with their neighbours. মিথ্যাচার নয়, মানুষকে গড়ে তোলাই তাঁদের ধর্ম। তাই সরাকেরা শিক্ষকতার কাজটাকেই বরণ করে নিয়েছেন। পাঁচেত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে যেসব শিক্ষকরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষকই সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ।

সরাক মেয়েদের রীতিনীতির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার হারবার্ট রিশনে সরাকদের রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। তিনি সরাকদের অহিংসা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আর সততার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন-

Their name is variant of Sravaka the designation of the Jainlaity, they are strictly vegetarians never eating flesh and on no account taking life and if in preparing their food any mention is made of the word cutting the omen is deemed to disastrous that every thing must be thrown away.<sup>১৬</sup>

যা রক্তের মত লাল তা খেতে সরাকেরা পছন্দ করেন না। লাইপুই শাক, গাজর, লাল সীম প্রভৃতি খেতে তাঁদের মানা আছে। এছাড়া ব্যাঙের ছাতা, ডুমুর প্রভৃতি ও তাঁদের রান্না ঘরে ঢোকে না। এ প্রসঙ্গে লোক জীবনে একটি সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে।

উমুর ডুমুর পুড়ুং ছাতি।

তিন খায় না সরাক জাতি।

সরাকদের সামাজিক উৎসব, বিবাহের রীতিনীতিগুলো বেশ বিচিত্র। এঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুলশয়া বা বাসর জাগানোর কোন রীতি নেই। সম্ভবতঃ বিয়ের পর কয়েকটা মাস তাঁরা বর-কনেকে একটু আলাদা করে রাখতে চান। কারণ এই সময়টা হল স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রস্তুতির কাল। এই প্রস্তুতির কালে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মিলনের আকাঙ্খা বহুগুণ বর্ণিত হয়ে মিলনের ক্ষণকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এই কারণে সরাক সমাজের দ্বিরাগমনের প্রথা খুব জনপ্রিয়। বিয়ের সময় বরের মাথায় টোপুর থাকে না। থাকে পাগড়ী ও মোড়। বিয়ের আগের দিন গায়ে হলুদ অর্থাৎ গাঢ়াধীবাস হয়।

<sup>১৬</sup>, এখন অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন বরকে বরের বাড়িতে কনেকে কনের বাড়িতে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বরের হাতে যাঁতি এবং কনের হাতে কাজলতা দেওয়া হয়। বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের রাত্রে কেবল মাত্র কল্যাণ সম্প্রদান অনুষ্ঠানটিই অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকালবেলায় যজ্ঞ এবং হোম হয়। অগ্নি সাক্ষী করে বর কনেকে গ্রহণ করেন। সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে দেন। দুপুরবেলায় হয় বন্দনা অনুষ্ঠান। আগে এই বন্দনা অনুষ্ঠানে বর কনের বন্দনা গান গাওয়া হত। এই অনুষ্ঠানে রঙ খেলার রীতি ছিল। মেয়ের মা অথবা দিদিমা বন্দনা অনুষ্ঠানে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। নিম্নত্রিত অতিথিবন্দ এই সময় তাঁদের দেয় যৌতুক দ্রব্যগুলো মেয়ের মায়ের হাতে তুলে দেন।

পরের দিন সকাল বেলায় মেয়ে জামাইকে বিদায় দেওয়া। বর-কনে বরের বাড়িতে পৌঁছালে স্থানেও উৎসবের ধূম পড়ে যায়। আগে এই অনুষ্ঠানেও রঙ খেলার রীতি ছিল। এছাড়া বর-কনেকে নিয়ে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বর-কনে নাচের রীতি কমে গিয়েছে। অনুষ্ঠানটি দায়সারা পর্যায়ের হয়। পরের দিন বরের বাড়িতে বর-কনের বন্দনা অনুষ্ঠান হয়। এবং বর পক্ষের সমস্ত অতিথিবন্দ যোগদান করেন। বৌভাত বলতে যা বোঝায় সেটা আগে হত দ্বিবাগমনের সময়। এখন গুই বন্দনার অনুষ্ঠানটাই বৌভাতের অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়।

বর্তমানে সরাকদের জাতীয় (সম্প্রদায়গত) দেবতা হলেন শিব। বিবাহের সময় শিবের নামে বাধ্যতামূলক ভাবে চাঁদা দেওয়ার রীতি আছে। এছাড়া সামাজিক মিলন ক্ষেত্রেও রচিত হয় শিব মন্দির প্রাপ্তনৈ। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের কাছে দাপুনিয়া গ্রামে সরাকদের শিব মন্দির অছে। মন্দিরটি পাথর দিয়ে তৈরী। সামনে একটি ছোট পাহাড় আর ঈশ্বরার পুকুর। এই পুকুর পাড়ে ঈশ্বরা দেবীর মন্দির আছে। ঈশ্বরাদেবী অনেকটা বঢ়ীদেবীর মত।

এখানে সরাকদের তিনি থেকে ছয় মাসের ছেলে-মেয়েদের মানসিক (মানত) শোধ করা হয়। এই স্থানটা প্রকৃতির এক সুন্দর লীলাক্ষেত্র। গাছে গাছে অজস্র পাখিদের আস্থান। সরাক মেয়েরা প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায়।

সরাক মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি আগে বড় একটা ছিল না। বর্তমানে অবশ্য সব মেয়েরাই স্কুল-কলেজে যাচ্ছেন। সরাক মেয়েদের ধীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বেশ প্রথর। বহু প্রাচীন সংস্কৃতির তাঁরা বাহিক। তাঁরা আবার প্রচণ্ড রংশৃণশীল। তাই সমাজ জাতি ধর্ম সব কিছু অবক্ষয়ের পথে নেমে গেলেও এদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয় না। খালি পায়ে আর খালি হাতে এঁরা সেবা

দিয়ে শয়তানেরও মন জয় করে নিতে পারেন। কিন্তু এঁদের দুর্ভাগ্য দেশের মানুষ এঁদের কথা জানবার চেষ্টা করেন নি।

আগেই বলেছি সরাকদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেন না। আবার অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এঁরা মোটেই অগ্রসর নয়। সরাকদের জনপ্রিয় পেশা হল শিক্ষকতা। বর্তমানে সরাকেরা আবার এক অসাধারণ প্রগতিশীল চাষীরূপেও পরিগণিত হয়ে থাকেন।

সরাক সমাজের মধ্যে বেশিরভাগ শিল্প শ্রমিক রয়েছে বর্ধমান জেলায়। এখানের সরাকদের আর্থিক অবস্থায়ও অনেকটা ভাল। এই জেলার সরাক পরিবারের শতকরা চালিশটিরও বেশি মানুষ দুর্গাপুর, আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের নানা কারখানায় এবং কয়লা খনিগুলিতে কাজ করেন। অপরদিকে বাঁকুড়ায় শতকরা ১০ জন এবং সাঁওতাল পরগণায় শতকরা ২২ জন চাকুরীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল পরগণার সরাকদের চাষ থেকে আয় অনেক কমে গিয়েছে।

কৃষিকাজে নির্ভরশীল পরিবারগুলোতে বেকার মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে পরিবার পিছু যে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগে ছিল ৩০ কুইটাল তা আজ কমে গিয়ে ১৮ কুইটালে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথা পিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে। এই কারণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলের সরাকদের মধ্যেও চাকুরি করার প্রবণতা বাড়ছে। বর্তমানে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার সরাকদের জনসংখ্যা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান তুলে দিলাম।

জেলার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা	শিক্ষিতের হার	মাথা পিছু বার্ষিক আয়
বর্ধমান	৪১১	৪২৩৫	১৭০২	৫৭১ টাকা
বাঁকুড়া	৬৩২	৭২১৬	১৬০৪	৩২৬ টাকা
সাঁওতাল পরগণা	২৫৪	২৬০৭	১০৭৪	৪৫১ টাকা

পরিসংখ্যানে দেখা যাবে বর্ধমান জেলায় সরাকদের শিক্ষিতের হার যেমন বেশি ঠিক তেমনি মাথা পিছু আয়ও বেশি। অপর দিকে বাঁকুড়ার সরাকদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণাতে সরাকদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ ভাগ মানুষ বাস করে। অবশ্য এর সঙ্গে

ধানবাদ, রাঁচি ও উড়িষ্যার সরাকদের ধরা হয়নি। সরাকদের একটা বড় অংশই উড়িষ্যার বাস করেন যাদের কোন পরিসংখ্যান নেওয়া হয়নি।<sup>১৭</sup>

পুরুলিয়ায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আর বীরভূম, মেদিনীপুর ও সিংভূম অঞ্চলে মোট সরাকদের মাত্র ১৫ শতাংশ বাস করেন। উড়িষ্যা বাদ দিয়ে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম জেলার সরাকদের জনসংখ্যার একটা জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান দেবার চেষ্টা করছি।

জেলার নাম	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট
পুরুলিয়া	৬৯৪৪	৫৮২৩	৮৭৫৫	১৭৫২২
বাঁকুড়া	২৬১০	২১৩৫	২৩১১	৭২১৬
বর্ধমান	১৫১৪	১৫৭৭	১১১৮	৪২০৫
সাঁওতাল পরগণা	৯৬১	৭৮৫	৯৪১	২৬৮৭
বীরভূম	-	-	-	১৪৬
মেদিনীপুর	-	-	-	৪১৬
সিংভূম	-	-	-	৩৭৮৯
মোট	১২১০৯	১০৩২০	৯২০১	৩৫৯৮১

১৯৬২ সালে সরাক সমাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক বেসরকারীভাবে সরাক সমাজে জনগণনার কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁদের গণনাকে ভিত্তি করে বলা যায় যে ১৯৬২ সালে সরাকদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৯৮১ জন। আজ ৩৫-৩৬ বছর পর এই জনসংখ্যার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সরাকদের জনসংখ্যা হয়তো ৪০,০০০ পেরিয়ে যাবে।

আর একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে বীরভূম এবং মেদিনীপুরের সরাকেরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এইসব স্থানের সরাকেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। আর একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে মানভূম অঞ্চলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সেই হারে সরাকদের জনসংখ্যা বাড়েনি। একশ থেকে দেড়শ বছর আগে মানভূমের জনসংখ্যা ছিল ১৭,৩৮৫ জন। এর মধ্যে সরাকদের সংখ্যা ছিল ১০,৪৯৬ জন।<sup>১৮</sup>

১৭. উড়িষ্যার সরাকদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮. Mr. Gait's Census report.

এককালে মানভূম অঞ্চলে সরাকেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। আজ অবিভক্ত মানভূম অঞ্চলের জনসংখ্যার তুলনায় সরাকেরা একেবারে নগণ্য। কেমন করে এটা হল ভাবলে অবাক হতে হয়। এককালে সিংভূম নাকি সরাকদের দ্বারা শাসিত হত, কিন্তু সিংভূম জেলায় সরাকদের খুঁজেই পাওয়া যাবে না আজ। এটাই যেন ইতিহাসের গতিপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে কত চমকপ্রদ মানবগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। কত অসাধারণ সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন তাঁরা। আবার এক সময় মহাকালের গতিপথে হারিয়ে গিয়েছেন।

হারিয়ে যেতে বসেছেন সরাকেরাও। হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের অসাধারণ পুরাকীর্তির নির্দর্শন। কত সুন্দর সুন্দর শিল্পকলা অনাদরে ভেঙ্গে পড়ছে। কত সুন্দর মন্দির ভেঙ্গে শিল্পকলায় সমৃদ্ধ পাথরগুলো দিয়ে মানুষের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। মানুষের হাতে গড়া সভ্যতা মানুষের হাতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখছি। জানিনা এরজন্য আমাদের উত্তর পুরুষদের কাছে কোনদিন কোন কৈফিয়ত দিতে হবে কিনা।

## ॥ দুই ॥

### সরাকদের গোত্র পিতা

মহাবীরের জন্মের আগেও এই অঞ্চলে সরাকেরা বসবাস করতেন এমন নির্দর্শন আছে জৈন গ্রন্থে। সরাকেরা কতদিন থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন সে প্রসঙ্গে আজও কোনরূপ গবেষণামূলক আলোচনা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। তবে আমরা মহাবীরের জীবনী হতে জানতে পারি যে তিনি যখনই আরক্ষ কর্মের দ্বারা ধৃত, নির্যাতিত হয়েছেন তখন পার্শ্বপত্যয় সাধ্বীদের দ্বারা সুরক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, এতে মনে হয় মহাবীরের পূর্বে সেখানে পার্শ্ব ধর্মপ্রচার করেন। তখনই সরাকেরা তাঁকে মুক্ত করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সরাক শব্দটি জৈন শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্রোতা। এই প্রসঙ্গে হারবার্ট রিশলে বলেছেন- Their name is variant of sravaka (Sanskrit hearer) the designation of the Jainlaity.

আর্য সাহিত্য শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম ক্ষন্দ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিনিটি অধ্যায়ে ভগবান ঋষভদেবের কথা আছে। এই গ্রন্থে ঋষভদেবকে ত্রিশোর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সরাক জাতির এই মহান গোত্রপিতার শত পুরোহ মধ্যে ঋষভদেবের ১০০ পুত্রের মধ্যে ১৮ জন দীক্ষিত হন (জৈন মতে)। ঋষভ বংশজ সরাক জাতির মধ্যেও পূর্বে ব্রাহ্মণের মত উপবিষ্ট ধারণ করার রীতি ছিল। উড়িষ্যার কিছু কিছু অঞ্চলে এখনও উপবিষ্টধারী সরাকদের সংখান পাওয়া যায়।

তাঁরা এখনও পৌরোহিত্য করেন। জৈন সংস্কৃতিতে উপবীতধারণ করার রীতি সু-প্রাচীন। পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈন শিল্পকলায়-এর নির্দশন আছে। এছাড়া সরাকদের বিবাহে কুসুম্ভিকা ও হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি আর্য সংস্কৃতির অন্যতম নির্দশন। তাই সরাকেরা আর্য গোষ্ঠী থেকে আগত বললে মনে হয় ভুল হবে না।

কিছুদিন আগে অজয়ের তীরে পাহাড়পুর গ্রামে সিঙ্গু সভ্যতার একটি মাতৃ মূর্তির মস্তক পাওয়া গিয়েছে।<sup>১৪</sup> এই মূর্তি সিঙ্গু সভ্যতার একটি নির্দশন। হয়তো আর্য গোষ্ঠীর কোন শাখা সুদূর সিঙ্গু প্রদেশ থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। সন্তুষ্টবৎ: এরা ঋষভ বংশজ সরাগ বা সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

আগেই বলেছি এখানের সরাকেরা শিবের উপাসক। শিব মন্দিরই হল তাঁদের সামাজিক মিলন স্থল। ঋষভ বংশজ সরাকদের শিব ভক্ত হওয়াতে কোনরূপ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রভাব নেই। যেমন উড়িষ্যাতেও ঋষভদেবের আমাদের মহাদেবের মত হলেন আদিদেব কৈলাস পর্বত দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাক্ষেত্র। কৈলাস পর্বত আবার আদি তীর্থকর ঋষভদেবেরও নির্বাণভূমি। ঋষভদেব এখানে কৈলাস পর্বতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। তিবর্তীরা ঋষভদেবকে ধর্মপাল বলে। যেন মহাদেবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। তিবর্তীরা ঋষভদেবকে ধর্মপাল বলে। তিনি হলেন কৈলাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই দেবতার পরণে বাঘছাল, গলায় নরমুণ্ডের মালা আর এক হাতে ডমরং অপর হাতে ত্রিশূল। শিবেরই এটা যেন অভিমুক্ত। উড়িষ্যাতে বহু শিব মন্দিরে ঋষভনাথকে শিবরূপে পূজো করা হয়। পুরুলিয়াতেও বহু তীর্থকর মূর্তি শিব মন্দিরে পূজো পাচ্ছে। শিব স্থানীয় দেবতা তৈরেবনাথ বা মহাকাল তৈরেব তীর্থকর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং সরাকদের শিব পূজার মধ্যে গোত্রপিতা ঋষভনাথের পূজোই নিহিত আছে।

॥ তিন ॥

### প্রাচীন অর্থনীতিতে সরাকদের ভূমিকা

সরাকেরা শিল্পীর জাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরণের শিল্পকর্মে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভাক্ষর্য শিল্প, লৌহ শিল্প, তান্ত্র শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প এই চাররকম শিল্পেই তাঁরা বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। সেকালের লৌহ শিল্প, তান্ত্র শিল্প আর বস্ত্র শিল্প সরাসরিভাবে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভাক্ষর্য শিল্প দেশের মানুষের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বেশি। অবশ্য ভাক্ষর্য শিল্পের সঙ্গে তৎকালীন দেশের অর্থনীতির কোন যোগ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। পুরুলিয়া অঞ্চলের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই অঞ্চলের সমস্ত পুরাক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে তান্ত্রিক বন্দরের যোগাযোগ ছিল।

<sup>১৪</sup> এই মূর্তিটি শ্রমণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছী হরিপুরাদ তেওয়ারীর কাছে রাখিত আছে।

তখন পূর্বাঞ্চলে তান্ত্রিক বন্দরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তান্ত্রিক থেকে পাটলিপুত্র যাওয়ার দুটো স্থায়ী রাস্তা গড়ে উঠেছিল। প্রথম রাস্তাটি ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকূপী, ঝারিয়া, রাজগীর হয়ে চলে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে। তখনকার দিনে ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা ও রঘুনাথপুর এই চারটি স্থানই তসর শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। আর তেলকূপী ছিল এক শিল্প নগরী।

তমলুক বা তান্ত্রিক বন্দর থেকে আর একটি রাস্তা পাকবিড়রা, বুধপুর, মানবাজার, বরাহবাজার, দুলমী, সাফারান, বোড়াম, সুইসা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে বেনারসের দিকে চলে গিয়েছিল। পাকবিড়রা, বুধপুর, মানবাজার, বরাহবাজার, দুলমী, বোড়াম, সুইসা প্রভৃতি স্থানগুলো সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত পুরাক্ষেত্র। এইসব পুরাক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ তীর্থকর মূর্তি, দেবদেৰীমূর্তি ও অন্যান্য নারী মূর্তি তৈরী হত যা কিছু কিছু বিদেশে রপ্তানি করার জন্য তান্ত্রিক বন্দরে আনা হত। পাকবিড়রায় প্রচুর পরিমাণ একই ধরণের মূর্তি একই স্থানে পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিগুলো একেবারে নতুনের মত আছে। এখানে মূর্তি নির্মাণের কেন্দ্র (workshop) ছিল বলে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

শিল্পীদের কোন জাত হয় না। সরাক শিল্পীরা যে জৈন মূর্তি ছাড়া আর কোন ধরণের মূর্তি নির্মাণ করতেন না এমন কথা বলা যায় না। পাকবিড়রার পাশেই বুধপুর বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রভূমি ছিল। বুধপুরে বেশ কিছু গণেশ মূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলো নাকি আগে পাকবিড়রায় ছিল। এখানের ভাক্ষর্য শিল্প তান্ত্রিক বন্দরে যেত বলেই এই ধরণের একটা রাস্তারও প্রয়োজন হয়েছিল।

আগেই আমরা দেখেছি যে ধাতু বুগের প্রথম পর্ব থেকেই এই অঞ্চলে সরাকদের বসবাস ছিল। সিংভূম অঞ্চলে সরাকদের প্রচেষ্টায় এক সমৃদ্ধ তান্ত্র যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলোনেল Mr. Haughton একটি রচনায় সর্বপ্রথম সিংভূম জেলার প্রাচীন তামার খনিগুলোর কথা প্রকাশ করেন। এরপর মিস্টার ভি. বল (Mr. V. Ball) ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিংভূম জেলায় বিশেষ অনুসন্ধান চালান। তিনি পাহাড়ে, পর্বতময় অঞ্চলে, গভীর জঙ্গলে এমনকি ধানের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রাচীনকালের তামার খনি দেখতে পান। তিনি তামার খনিগুলো পর্যালোচনা করে বুঝতে পারেন যে যাঁরা এগুলো ব্যবহার করতেন তাঁদের কারিগরি জানের অভাব ছিল না। মিস্টার ভি. বলের মতে এখানকার সরাকেরাই সিংভূম-মানভূম অঞ্চলের তান্ত্রখনিগুলোর সৃষ্টিকর্তা। তিনি লিখেছেন—

The more adventurous seraks or lay Jains hearing alone penetrated the jungles where they were rewarded with the discovery of copper upon the working of which they must have spent all their

time and energy as with the exception of the tanks above mentioned, the mines furnish the sole evidence of their occupation of that part of the country.<sup>২০</sup>

মিস্টার বলের মতে প্রাচীন সরাক জাতির মানুষেরা স্মরণাতীত কাল থেকেই তার শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই তাত্ত্বিক মালিকানা নিয়েই ছেটনাগপুরের হো জাতির মানুষদের সঙ্গে সরাকদের বিবাদ বেঁধেছিল। অনেক ত্রিভুবনিকের মতে সহাট অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণের মধ্যেও সিংভূম অঞ্চলের তার শিল্প করায়ত্ত করার পরিকল্পনা ছিল।

এককালে সমস্ত সিংভূম জেলা সরাকদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে। একথা স্মরণ রেখে মেজর টিকেল (major Tickell) বলেছেন- Singhbhum passed into the hands of the sarawaks. সিংভূম জেলা ও এর পাশাপাশি অঞ্চলে অর্থনৈতিক এবং নৃতাত্ত্বিক যেসব কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায় যে এককালে সিংভূম সরাকদের দ্বারা শাসিত হত।

সরাকেরা কেবল মাত্র তাত্ত্বিক প্রবর্তকই ছিলেন না, তাঁরা এই অঞ্চলের লোহ যুগেরও প্রতিষ্ঠাতা। অজয় নদীর উভয় পার্শ্বে রূপনারায়ণপুর থেকে পাওয়াবেশর পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ মাইল অঞ্চলের পর্বত প্রমাণ লোহ স্তুপ ও লোহ চুম্বির সঙ্গে সরাক সম্প্রদায়ের মানুষের জড়িত ছিলেন সেকথা বলা যায়।

সরাকেরা বস্ত্র শিল্প মধ্যযুগের অর্থনৈতিকে কট্টা প্রভাবিত করেছিল বলা কঠিন। পাখচান্ত্র পণ্ডিতগণের মতে সরাকেরা নিজেদের আবাস থেকে বিতর্কিত হয়ে বস্ত্র শিল্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁদের বস্ত্র শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উপর বড় রকমের প্রভাব রেখেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে সরাকদের বস্ত্র শিল্পের যে তথ্য আমরা পেয়ে থাকি তা কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নগণ্য নয়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যখন বলেন- “পাইয়া ইনাম বাড়ি, বুনে নেত পাট শাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ।” তখন সরাকদের পাট ও নেত শিল্পকে ছোট করে দেখা যুক্তিযুক্ত হবে না। বিষ্ণুপুর ও রঘুনাথপুর দীঘবিন থেকেই পাট ও নেত বা তসর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অতীতে এই দুই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ তসরের কাপড় দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হত। এমনকি এইসব বস্ত্র দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশেও রপ্তানী করা হত। এই কারণেই রঘুনাথপুর ও বিষ্ণুপুর তাত্ত্বিকপ্রস্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাত্ত্বিক

২০. On the Ancient Copper Miners of Singhbhum.

থেকে একটি রাস্তা ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপী হয়ে পাটলিপুত্রের দিকে চলে গিয়েছিল।

সরাকদের বস্ত্র শিল্পে যে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে রাজা-মহারাজারাও খুশি ছিলেন সে কথা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও স্বীকার করে গিয়েছেন। যে শিল্প দেশের রাজাকে খুশি করতে পারে তার প্রভাব দেশের অর্থনৈতিকে পড়েনি এমন কথা বলা যায় না।

বর্তমানকালে সরাকদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষেরা দেশের অর্থনৈতিক উপর কোন প্রভাব রাখবেন এমনটা আশা করা যায় না। তবু পুরুলিয়ার পাঁচেত অঞ্চলের কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিকে সরাকদের কিছুটা ভূমিকা আছে। পাঁচেত অঞ্চলের বেশিরভাগ কৃষি জমিগুলোই এখন সরাকদের দখলে। প্রগতিশীল চাষী হিসেবে জেলায় তাঁদের একটা নাম-ডাক আছে। এককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন উৎপাদিত ফসলের উপর নেতৃত্ব ধার্য করেছিলেন তখন এই প্রথায় বেশিরভাগ ধান সংগৃহিত হত সরাকদের বাড়ি থেকেই।

## ॥ চার ॥

### সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাহিনী ও কিংবদন্তী ও মেয়েলি ছড়া গানে সরাকদের অবদান

মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সরাকদের বেশ কিছুটা অবদান রয়েছে। কিছুদিন আগে “কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু” নামে একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটি পাওয়া গিয়েছে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে। এর রচয়িতা জগত্রাম রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায়। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে রাণীগঞ্জ টি. ডি. বি. কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বল্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আছে। তিনি এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট, ডিগ্রী লাভ করেন। এই প্রাচীন গ্রন্থটিতে রামদুলাল সরাকের নাম পাওয়া যায়। রামদুলাল সরাক সম্বৰ্তণ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই শ্রী রাধাচরণ তস্তুবায় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। এই অঞ্চলের সরাকেরা যে প্রাচীন সাহিত্য নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতেন কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু তারই প্রমাণ। এছাড়া শ্রী ধরম সিৎ (সরাক) এর হস্তাক্ষরে শ্রীরূপ সনাতন সংবাদ ও উপাসনা নামক একটি গ্রন্থের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি তামার সংগ্রহশালায় আছে। পাণ্ডুলিপিটি ১১৯১ সালের ১৫ই ফাল্গুন শেষ হয়েছিল। গ্রন্থটি সম্বৰ্তণ শ্রীতত্ত্ব সার নিরূপণ নামক গ্রন্থের অংশ বিশেষ। গ্রন্থটির লেখক অকিধন দাস। ভগিনীয়া রয়েছে-

গোপিগণ জাপিয়া চাইল গুণরাগি।  
অকিধন দাস বলে হব গোপির দাসি।।

এই দুটি গ্রন্থ থেকে সরাকদের একটি মূল্যবান তথ্য আমরা পেতে পারি। সেটা হল, যে মধ্য যুগে অর্থাৎ কৃষ্ণগীলাম্ভতসিদ্ধু রচনার যুগে সরাকদের কোন পদবী ছিল না। তাঁরা নিজেদের সরাক বলেই পরিচয় দিতেন বা নামের শেষে সরাক শব্দটাই লিখতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামদুলালের নাম রামদুলাল সরাক পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে ১১৯১ সালের (বাংলা) পরবর্তী সময়ে সরাকদের সিং পদবী দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সরাকদের পদবী লাভের ঘটনা সম্ভবতঃ ১১৯১ বাংলা সালের আগেই ঘটেছিল। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর একটি সরাক প্রভাবিত অঞ্চল। এখানের নতুনতি গ্রামের হরিশচন্দ্র সরাক (মাঝী) এককালে দুটি গ্রন্থ রচনা করে খুব সুনাম পেয়েছিলেন। প্রথমটি গীতিকাব্য, নাম শ্রীতীর্থকর গীতাবলী। দ্বিতীয়টি গদ্য গ্রন্থ, নাম শ্রাবকাচার। হরিশচন্দ্রের তীর্থকর গীতাবলী খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা গীতি কবিতা। যেমন নমিনাথ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

এমনি তোমার নথের জ্যোতি,

হেরে মোহে কত যুবতী-

নুয়ে প্রণাম করতে গেলে,

ঠেকে তোমার নথের মুড়ি।

তোমার একটি ছিল খুড়তুতো ভাই,

সারাটি দিন চরাতো গাই,

সেটি পাকা চোর তার গুণের বালাই,

ভঙ্গিতে লোকের নগীর হাঁড়ি।।

সরাক সংস্কৃতিকে নিয়ে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কাহিনী-কিংবদন্তী ও মেয়েলি ছড়া গান শোনা যায়। সরাক প্রভাবিত অঞ্চল পাড়া থানার পাড়া নামক গ্রামটি অতীতের সরাক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এই গ্রামের পুরুর পাড়ে আছে প্রাচীনকালের এক বিখ্যাত মন্দির। সম্ভবতঃ পুরুলিয়া জেলার সবচাইতে প্রাচীন মন্দির হল সরাকদের তৈরী এই কালো পাথরের মন্দিরটি। আগে মন্দির গাত্রে মূল্যবান অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। এখানে এক কিংবদন্তী আছে। বলা হয়েছে যে পাড়ার এই মন্দিরে নাকি রক্ষিনী ও ঝক্ষিনী নামে দুই রাক্ষসী বাস করত। সম্ভবতঃ এই রক্ষিনী ও ঝক্ষিনী যক্ষিণী ছিল। এই যক্ষিণীরা প্রাচীন শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানেও রক্ষিনী-ঝক্ষিনীদের কথা শোনা যায়। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে তীর্থকরের সঙ্গে যক্ষিণীর বিয়ের গল্প কথা শোনা যায়।

যাই হোক, পাড়ার এই রক্ষিনী-ঝক্ষিনী প্রসঙ্গে বহু অপগ্রাম মূলক গল্প গড়ে উঠেছে। কথিত আছে যে এই দুই রাক্ষসীকে নাকি নরমাংস খাওয়ান হত। এখানে নাকি একটি পাথরের তৈরী টেঁকি ছিল। এই টেঁকি দিয়ে নরমাংস কুটা হত। গ্রামের লোকেরা পালা করে রক্ষিনী-ঝক্ষিনীর মন্দিরে নরমাংস সরবরাহ করত। আর সেই কারণেই নাকি এখানের মন্দিরে নরবলি দেওয়ার বীতি গড়ে উঠেছিল। এই কাহিনী নিশ্চয়ই আঘাতে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষেরা যাতে জৈন মন্দিরে না যায় বা মন্দিরটি অনাদরে অবহেলায় ক্ষয় হয়ে যায়- সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রাহ্মণ সমাজপত্রিরা এইসব অপগ্রাম চালিয়েছিলেন।

রক্ষিনী-ঝক্ষিনী রাক্ষসীর সঙ্গে এই অঞ্চলের এক বালিকা বধুর কাহিনী যুক্ত হয়েছে। এই বালিকা বধুর নাম বিঙ্গ বৌ।<sup>১৫</sup> অঙ্গ বয়েস ভাব হয়েছে এক বাগাল বা রাখাল বালকের সঙ্গে। বালিকা বধু সময় সময় বাগাল বধুর কাছে ছড়া কাটে আর হেঁয়ালিতে কথা বলে। তার ছড়ার ভাষায় থাকে গোপন প্রেমের রহস্যময় মনের কথা-

বাগাল বধু বাগাল বধু,

ঘুরছ বনে বনে।

একটি গাছে একটি পাতা,

দেখেছ কোনখানে।।

একটি গাছে একটি পাতা অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা। তাই অবাক হয়ে বাগাল বধু জবাব দিয়েছে-

বিঙ্গ বৌ ও বিঙ্গ বৌ,

কেমন তোমার মতি।

সরাক জাতি কোন কালে,

থায় না ব্যাঙের ছাতি।।

সুতরাং বাগাল বধু কেন ব্যাঙের ছাতা আনতে যাবে? বিঙ্গ বৌয়ের মনের কথা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বিঙ্গ বৌ নিযিন্দ জিনিস চাইছে। বাগাল বধু জানতে চায় যে বিঙ্গ বৌ আরও কিছু চায় কিনা। এবার বিঙ্গ বৌ বলেছে-

বাগাল বধু বাগাল বধু,

যাবেরে অনেক দূর।

মনে করে আনবে বাগাল,

শতদল কমলের ফুল।।

এই প্রেমিক বাগাল বন্ধুকে বিঞ্চ বৌয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কোশলে বলি দিয়ে তার মাস্ব রক্ষিনী ও বক্ষিনীকে দেবার পরিকল্পনা করেছিল। সেদিন গোয়াল ঘরে বিঞ্চ বৌয়ের ভাসুর বিঞ্চ বৌয়ের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ তার ধারণা ছিল যে বিঞ্চ বৌ তাদের পরিকল্পনার কথা বাগাল বন্ধুকে বলে দিতে পারে। এই সময় বাগাল বন্ধু বাঁশী বাজিয়ে বিঞ্চ বৌকে ভাত দেবার ইঙ্গিত করলে বিঞ্চ বৌ বলল-

খন বাগাল বাঁশী বাজায়  
তখন আমি হেঁশালে।  
কি করে ভাত দিব বাগাল,  
বড় ভাসুর গোহালে ॥

শেষ পর্যন্ত বিঞ্চ বৌয়ের কাছে পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যায়। সে একথা বাগাল বন্ধুকে না জানিয়েও নিজের জীবনের বিনিময়ে বাগাল বন্ধু পাণ রক্ষা করে। আর বাগাল বন্ধু সে দৃশ্য দেখে পাষাণ হয়ে যায়। যে স্থানে বাগাল বন্ধু পাষাণ হয়েছিল সেই স্থানটার নাম বাগালিয়া। বর্তমানে এই বাগালিয়া- দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা পুরুলিয়ার একটি মধ্যবর্তী স্টেশন।

এই অঞ্চলের সরাকদের ভাস্ক্র শিল্প ও মন্দিরগুলোর উপর একদিন যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছিল তার নির্দর্শন যেমন পুরাক্ষেত্রগুলোর পাষাণ ফলকে রক্ষিত আছে ঠিক তেমনি কিছু কিছু লোক সঙ্গীতেও একথার স্মৃতি রয়েছে। মধ্যযুগে কালুবীরের ছদ্মনামে কোন এক দুর্ঘর্ষ হানাদার এই অঞ্চলের অন্যন্য মানুষদের সঙ্গে সরাকদেরও আক্রমণ করেছিল। প্রাচীন টুসু গানের এক ছড়ায় বলা হয়েছে-

কালুবীর কালুবীর বিজয় আগমন,  
সরাক পাঢ়তেরে দিলেক দরশন।  
সরাকদের একে একে মারল ধরিয়া,  
সরাকদের হাল জোয়ালটা রইল পড়িয়া ॥

চাষীদের হাল জোয়ালকে হরণ করার ক্ষমতা কারুর নেই, কারণ-

উশ্বরে শিরিজিল

হাল জুয়াল গো

মহাদেব শিরিজিল গাই ॥

যাইহোক, এই কালুবীরকে অনেকে কালা পাহাড় বলে মনে করেন। তবে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়নি। ছড়াটিতে অত্যাচারের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে

ধরা হয়েছে তা সরাকদের অতীত জীবনের সঙ্গে যেমন করে মিলে যায় তেমন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের অতীত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। আর একটি টুসু গানের মেয়েলি ছড়ায় সরাকদের অতি সুন্দরী বৌয়ের প্রতি হিংসা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পশ্চিতগণ সরাকদের The remnant of an archaic বলেছেন। একথার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে পুরুলিয়ার প্রাচীন ভাদু গানে। সরাক মেয়েদের প্রধান লোক উৎসব হল ভাদু। আমাদের প্রাচীন ভাদু গানে প্রচুর পরিমাণ জৈন গ্রন্থ বসুদেবহিণী, পদ্মচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীর ছাপ আছে।<sup>১২</sup>

এই জেলার ভাদু গানে সরাক মেয়েদের অবদান সবচেয়ে বেশি। সরাক মেয়েদের ভাদু গানে রাবণ ভগ্নি শূর্পনখাকে অতুলনীয়া রূপবতী বলা হয়েছে- রাবণ ভগ্নি শূর্পনখা, অতুলনীয়া রূপ যাহার। ভাদু গানে শূর্পনখার হাতের নখের প্রশংসা করা হয়েছে। এটি অবশ্যই জৈন প্রভাব। জৈন রামায়ণে শূর্পনখা সুন্দরীর নাম চন্দ্রনখা।

এই অঞ্চলের ভাদু গানে রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়ে ভরত ও শক্রঘ্ন উভয়কেই রাজা করা হয়েছে। গানে বলা হয়েছে “তোদিগে করেছি রাজা রামে দিয়ে নির্বাসন। এখানেও ভরত ও শক্রঘ্নকে মিলিয়ে রাজা করার ঘটনায় জৈন রামায়ণের প্রভাব পড়েছে। জৈন গ্রন্থকার সংঘদাসের বসুদেবহিণীর চতুর্দশ খণ্ডে যে রামকথা আছে তাতে বলা হয়েছে যে ভরত ও শক্রঘ্ন একই মায়ের গর্ভজাত দুই ভাই। তাদের মায়ের নাম কৈকেয়ী। সরাক মেয়েদের ভাদু গানে দেখা যায় যে বালি রাজা মৃত্যুর আগে উমা এবং তারা নামে দুই মেয়েকে রামচন্দ্রের হাতে দিয়ে শাস্তিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ভাদু গানে আছে-

ত্রীরামের শরে বালি রাজা মরে  
সুগীবে দেন সিংহাসন।  
উমা তারা লয়ে আনন্দিত হয়ে  
পার কর নারায়ণ ॥  
আমি মরি রাম যাই স্বর্গধাম,  
তুমি অথম তারণ  
ভাদু সঙ্গীত রসে কাশীনাথ ভাষে,  
দেখিতে ঘুগল মিলন ॥

‘‘উমা তারা লয়ে’’ ‘‘পারকর নারায়ণ’’ ইত্যাদি কথার তাংগ্রহ কি? তারা সুগীবের স্ত্রী কিন্তু উমা কে? উমা কি প্রক্ষিপ্তভাবে এসে পড়েছে? আমার মনে হয় এখানে সবচেয়ে বেশি জৈন প্রভাব পড়েছে। জৈন রামায়ণ পাত্রচরিত্র বা পদ্মচরিত্রে রামচন্দ্র বালী/বধের পর এখানে তিনটি কল্যাঙ্কে বিয়ে করেছিলেন।

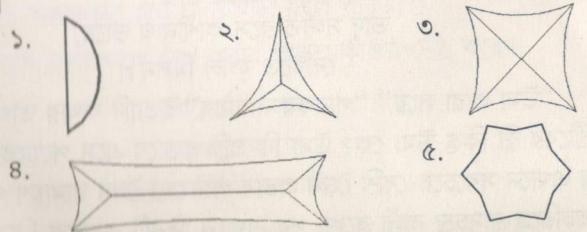
১২. এ প্রসঙ্গে আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ‘‘ভাদু গীতির ইতিকথায়’’ সরিষ্ঠানে সর্বনা আছে।

তাছাড়া জৈন রামায়ণের ভক্তিবাদ সীমান্ত বাংলার ভাদু গানকে এক অনাবিল শান্ত রসে ভরে দিয়েছে।

সরাক মেয়েদের সংস্কৃতিগত আর এক কৃতিত্ব হল তাঁদের দেওয়াল চিত্র। পুরুলিয়ার গ্রামের সরাকদের বাড়িগুলো চেনা যাবে তাঁদের দেওয়াল চিত্র দেখেই। পুজোর সময় সরাক মেয়েরা জল-রঙ ও পিঠুলি দিয়ে এক বিশেষ ধরণের দেওয়াল চিত্র এঁকে থাকেন। এর মধ্যে থাকে বেশ কিছু জটিল চিত্র। এগুলো হল- চারটি বর্গক্ষেত্রের উপর নাগ সাপ, ছয়টি বৃক্ষ দ্বারা অক্ষিত, পদ্ম, বাগান বেড় দুর্গার মেড় প্রভৃতি। ঘরের দরজার ও জানালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও বেশ সুন্দর করে সাজান হয়। এমন কোন সরাক বাড়ি পাওয়া যাবে না যে বাড়ির মেয়েরা দেওয়াল সাজান হয়। শিল্পকলার বীজ যেন সরাক মেয়েদের রচনের মধ্যে নিহিত আছে। চিত্র আঁকে না। শিল্পকলার বীজ যেন সরাক মেয়েদের রচনের মধ্যে নিহিত আছে। তাই গ্রামাঞ্চলের লেখা পড়া না জানা মেয়েও বুক ফুলিয়ে বলেন,- আমি লিখতে পারি। অর্থাৎ মেয়েটি দেওয়াল চিত্র আঁকতে পারে।

সরাকদের বিয়ের সময় এক ধরণের লোক সংস্কৃতিমূলক দেওয়াল চিত্র আঁকার রীতি আছে। এই ধরণের চিত্রের উপরের দিকে বর-কনে, বরযাত্রী, কনের আঁকার রীতি আছে। এই ধরণের চিত্রের উপরের দিকে বর-কনে, বরযাত্রী, কনের সহগামীনী, কাপাস গুটি বা বি, যাঁতি, কাজললতা, কলাগাছ, মানগাছ প্রভৃতির রেখা চিত্র আঁকা হয়। ছেলের বিয়েতে বর-কনের চিত্রের নীচে ছয়টি বৃক্ষ সহযোগে আঁকা পদ্ম ও মেয়ের বিয়েতে পুরুর আঁকা হয়। এই চিত্রের সামনে ধান-দুর্বা দিয়ে বর-কনেকে আশীর্বাদ করা হয়। এই চিত্রটি অন্তত হয় মাস দেওয়ালে যত্ন করে রাখা হয়। এই ধরণের দেওয়াল চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর লোক ভাবনা। এগুলো এক ধরণের নিখুঁত লোক শিল্প।<sup>১০</sup>

সরাক মেয়েরা শিল্পীর জাত। পৌর পরবের পিঠেতেও এঁরা শিল্পী মনের পরিচয় দেন। পৌর সংগ্রহস্থির পিঠে পরব পুরুলিয়ার সরাক বাড়িতে জমে ভাল। এঁদের বানানো পিঠেতেও রয়েছে লোক শিল্পের ছাপ। সরাক মেয়েরা নানা ধরণের জ্যামিতিক আকারের পিঠে বানিয়ে শিল্পকে লোক সংস্কৃতির একটা অঙ্গ করে গড়ে তুলেছেন।



১০. এই শাহৰে সঙ্গে এই দেওয়াল চিত্রের ছবি আছে।

জ্যামিতিক আকারে সরাক মেয়েদের গড়গড়ে পিঠে<sup>১১</sup> পৌর পরবে সরাক মেয়েরা নানা আকারের গড়গড়ে পিঠে বানিয়ে থাকে। (১) কোন কোন পিঠেতে দুটো শৃঙ্খল থাকে। এগুলো হয় বিনুকের মতো লম্বা। এই ধরণের পিঠে পিঠিম বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। (২) কোনও পিঠেতে তিনটে শৃঙ্খল থাকে। এগুলো বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। (৩) আবার কোনও পিঠেতে চারটা শৃঙ্খল থাকে। দেখতে অনেকটা শিঙ্গাড়ার মতো। (৪) আবার কোনও পিঠেতে চারটা শৃঙ্খল থাকে। এগুলো বর্গাকারে তৈরী হয়। (৫) চার শৃঙ্খল বিশিষ্ট আয়তাকার পিঠেগুলো একটু লম্বা হয়। (৬) যে সব পিঠেতে চার শৃঙ্খলের বেশি শৃঙ্খল থাকে, সেগুলো অনেকটা লম্বা হয়। (৭) কিন্তু এই পুলি পিঠের সঙ্গে সরাকদের গড়গড়ে পিঠের বেশি মিল নেই। যদিও এগুলো পুলি পিঠে ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরাকদের বানানো পিঠে শিল্পকে বুঝতে না পেরে বা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বহু বিভাস্তি ছড়ানো হয়েছে। এমনি এক বিভাস্তি হেপেছেন ডেক্টর জয়স্ত গোস্বামী তাঁর গবেষণা মূলক সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন গ্রহে। Census of India, Part - I, থেকে উদ্ভৃতি দিয়ে ওই গ্রহে বলা হয়েছে That they (Saraks) used cow made of rice paste (which they afterwards boiled) during some ceremonial observance (পৃষ্ঠা-৭৩৮)। বলা বাহুল্য তথ্যটি এত বিভাস্তমূলক যে সরাকেরা শুনেই চমকে উঠেন। একটা সম্পূর্ণ নিরামিয়াশী জাতের উপর এই কলঙ্ক লেপন শুধুমাত্র অন্যায় উঠেন। এটা চরম গার্হিত কর্ম। যে সব আয়তাকার গড়গড়ে পিঠেতে চারটে শৃঙ্খল নয়, এটা চরম গার্হিত কর্ম। যে সব আয়তাকার গড়গড়ে পিঠেতে চারটে শৃঙ্খল থাকে সেগুলো দেখতে অনেকটা লেজ মুণ্ডুইন গরুর মত। কিন্তু একে গরু বলা আর সরাক মেয়েদের বানানো পিঠে শিল্পকে বুঝতে না পেরে এর অপব্যাখ্যা করা একই কথা। এরপ মন্তব্য সরাক জীবন সম্পর্কে জয়স্ত গোস্বামীর চরম অঙ্গতার পরিচয় বহন করে।

সরাকদের মধ্যে এমন কিছু প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যার জন্ম হয়েছে সরাক পরিবারেই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করার পর থেকেই সরাক সমাজে গোসাই প্রথা প্রচলিত হয়। গোসাই ঠাকুর হলেন পরিবারের গুরু স্থানীয় ব্যক্তি। বাহুর অন্তত কয়েকটা দিন করে গুরুদেবরা সরাক বাড়িতে কাটিয়ে যান। এ ছাড়া বিবাহ ও শ্রদ্ধ বাড়িতে এঁরা গাই-বাছুর, ধূতি-চাদর প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকেন। আবার অভাব পড়লেও গোসাই শিষ্য বাড়িতে এসে হানা দেন। কোন কাজ কর্ম ছাড়াই অনেক সময় এই গুরুদেব স্থানীয় মানুষদের জন্য সরাক পরিবারগুলোকে বেশ

২৪. সরাক মেয়েদের বানানো গড়গড়ে পিঠের আলোক চির শাখার সঙ্গে আছে।

কিছু টাকা খরচ করতে হয়। তাই অকারণে কিছু খরচ হলেই সরাকেরা বলে থাকেন— কোথাও কিছু নেই গোঁসাই এসেছেন। বাড়ি থেকে গোঁসাই তাড়ানোর একটি মজার ঘটনার কথা সরাক মেয়েদের মুখে শোনা যায়। গল্পটা এখন লোক কথার পর্যায়ে উঠেছে।

কোন এক গ্রামে এক সরাক দম্পত্তি বাস করতেন। চাষী পরিবার। অভাবের সংসার। শ্রমের অন্তে কোনোপে দিন চলে যায়। কিন্তু তাঁদের খাবারে টান পড়ে যখন গোঁসাই ঠাকুর এসে তাঁদের পরিবারে বাসা বাঁধেন ও দিনের পর দিন থেকে যান।

সরাক বৌটি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে গোঁসাইকে তাড়াবার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। স্বামীকে এ প্রসঙ্গে সে কিছুই বলল না। স্বামী তাঁর পরম গোঁসাই ভক্ত। তাই গোঁসাইকে সোজা পথে তাড়ানো যাবে না ভেবে সে বাঁকা পথ ধরল। একদিন সে গোঁসাইয়ের চোখের সামনেই তাঁদের বড় আকারের নোড়াটিতে তেল আর হলুদ মাখাতে লাগল। নোড়াতে কেউ তেল মাখায় না। ওটা দিয়ে বাটনা বাটা হয়। তাই গোঁসাই ঠাকুর জানতে চাইলেন, ওটাতে তেল মাখাচ্ছ কেন? বৌটি চোখ মুছে বলল,- আর বলবেন না গোঁসাই, ও কি যেন কার কাছে শুনে এসেছে। তাই আজ রাত্রেই এই নোড়া দিয়ে আপনাকে মেরে ফেলতে চায়। রক্তের দাগ যাতে নোড়াতে না বসে তাই আমি ওটাতে তেল হলুদ মাখিয়ে নিছি। আপনি যেন একথা কাউকে বলবেন না ঠাকুর। কথটা শুনেই গোঁসাই ঠাকুর চমকে উঠলেন। ভাবলেন আর নয় বাবা, রাত হবার আগেই পালিয়ে যাই। তাই কাউকে কিছু না বলে গোঁসাই ঠাকুর পালালেন।

এদিকে বৌটির স্বামী ঘরে এসে গোঁসাই ঠাকুরকে না দেখে তাঁর কথা জানতে চাইলেন। বৌটি বলল,- গোঁসাই ঠাকুর আমাদের নোড়াটি চেয়েছিলেন। উনি নাকি ওটা দিয়ে শিব বানাবেন। এই দেখ তেল-হলুদ মাখিয়ে তিনি ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছেন।

তুমি বুঝি নোড়াটা তাঁকে দিলে না? আর তাই বুঝি রাগ করে গোঁসাই চলে গেলেন।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বৌটি চুপ করে থাকল।

বৌটির স্বামী তখন জানতে চাইলেন— ঠাকুর কতক্ষণে গেলেন? — এই মাত্র, জবাব দিল বৌটি।

সঙ্গে সঙ্গে বৌটির স্বামী নোড়াটি হাতে নিয়ে দৌড়াল। কিছুদুর যেতে না যেতে গোঁসাই ঠাকুরকে দেখা গেল রাস্তায়। বৌটির স্বামী চিংকার করে বলতে লাগলেন— নোড়া নেন গোঁসাই, নোড়া নেন।

ওদিকে গোঁসাই ঠাকুর তার শিষ্যকে নোড়া হাতে আসতে দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন যে শিষ্য বুঝি নোড়া নিয়ে তাঁকে মারতেই ছুটে আসছে। তাঁকে আর ধরা গেল না। বলা বাহ্য তাই তিনি প্রাণ ভয়ে প্রাণপণে ছুট দিলেন। তাঁকে আর ধরা গেল না। গোঁসাই ঠাকুরের পাপ দৃষ্টি বৌটির উপর পড়েছিল। তাই তাঁর অপরাধী মন এতটা ভয় পেয়েছিল। অপ্রিয় অতিথিকে তাড়াতে হলে সরাক মেয়েরা নিজেদের মধ্যেই বলে থাকেন,— নোড়া নেন গোঁসাই।

॥ পাঁচ ॥

### উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতি

সরাকেরা জৈন সম্প্রদায়ের একটি শাখা হলেও ভারতের অন্যান্য জৈন প্রভাবিত অঞ্চলে এঁদের দেখা যায় না। পশ্চিমবাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলেই তাঁদের দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে স্যার হারবার্ট রিশলে বলেছেন—

A somewhat similar case is that of the saraks of Western Bengal, Chutea Nagpur and Orissa, who seems to be a Hinduised remnant of the early Jain People to whom local legends ascribe the ruined temples, the defaced images and even the abandoned copper mines.

সুতরাং সরাকদের কথা কিছু বলতে গেলে উড়িষ্যার সরাকদের কথাও এসে পড়ে। এখানে যখন সরাকদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল, যখন তাঁদের মন্দির ভেঙ্গে ভাঙ্গ্য শিল্পকলা নষ্ট করা হয়েছিল তখন এখান থেকেও বেশ কিছু সরাক পরিবার উড়িষ্যায় পাড়ি দিয়েছিলেন। এমনকি অনেকে উড়িষ্যায় গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি যে সরাকদের সঙ্গে এখানের হো জাতির আদিবাসীদের প্রথম বিবাদ বাধে। প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে হো জাতির মানুষেরা সরাকদের বহু মানুষকে বিতাড়িত করে। সেকালে উড়িষ্যা সরাকদের পক্ষে ভয়হীন আশ্রয়সূল বলে বিবেচিত হত।

সরাক সংস্কৃতির ক্রম বিকাশের ধারায় উড়িষ্যার একটি বিশেষ ছান আছে। এককালে পার্শ্বনাথ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিদত্তে জৈন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর বিশেষ বন্দর থেকে তিনি কলিঙ্গ অভিমুখে এসে জৈন ধর্ম প্রচার করার জন্য বোগ বাটকে ধন্য নামক একজন গৃহীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

২৫. The People of India (আমার এই আলোচনার বাইরে সরাক ভারতবর্ষে আর কোথাও সরাক নামে কোন জাতি বাস করে না)।

উড়িষ্যার সন্দাট খারবেল মনে হয় জৈন ধর্মকে কয়েক হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখার জন্য খণ্ডগিরিতে ইতিপুরৈই তাঁর অমর কীর্তি পায়াণ ফলকে অক্ষিত করে গিয়েছেন। খারবেলের লিপি থেকে জানা যায় যে নন্দ বংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেছিলেন। এখানে তিনি শ্রাবকাচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। কলিঙ্গ বিজয় শেষে মহাপদ্ম নন্দ এখান থেকে একটি জিন মূর্তি পাটলিপুত্রে হন। কলিঙ্গ বিজয় শেষে মহাপদ্ম নন্দ এখান থেকে একটি জিন মূর্তি পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। এরপর থেকে সন্তুষ্টঃ মহাপদ্ম নন্দ জৈন ধর্মের একজন উপাসক হয়ে পড়েন। এই জিন বা তীর্থকর মূর্তি তিনশত বৎসর পর্যন্ত পাটলিপুত্রে ছিল। হয়ে পড়েন। এই জিন বা তীর্থকর মূর্তি তিনশত বৎসর পর্যন্ত পাটলিপুত্রে ছিল। সন্দাট খারবেলের সময় পরে তা আবার কোন সময় কলিঙ্গ দেশে আনা হয়। সন্দাট খারবেলের সময় রাজপুরমেরা এবং রাজ পরিবারের নর-নারীরা সকলেই সরাক আচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তীর্থকরদের ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ, আদর্শ প্রভৃতি রাজকর্মীদের মুক্তি করে রেখেছিল। শিলালিপিতে খারবেলকে চক্ৰধৰ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উড়িষ্যার ইতিহাসে তিনি রাজ চক্ৰবৰ্তী ছিলেন। চক্ৰ অর্থে শ্রাবক ধর্মকে বোঝান হয়।

সরাক সম্প্রদায়ের শাস্তিধার্ম জৈন ভূমি এই উড়িষ্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরাকেরা এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা যায়াবর শ্রেণীর মানুষের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। বালেশ্বর জেলায় অঘোরী বা অঘোরী নামে একটি জাতের সন্ধান পাওয়া যায়।<sup>২৮</sup>

তাঁরা নাকি আগে সরাক ছিলেন। অনেকের মতে অঘোরী সম্প্রদায় অগ্বাল সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। ধলভূমের মহল্যা গ্রামের দুই মাইল দূরে একটি অঞ্চলে আগে প্রচুর পরিমাণ সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। উড়িষ্যা ও বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শত বৎসর আগে সরাকদের একটি শাখা বাস করত। এই সব অঞ্চলে যে সব পুকুর, গুম্ফা প্রভৃতি দেখা যায়—তাতে প্রমাণ হয় যে এখানে সরাকেরা বেশ সম্পদশালী ছিলেন। এছাড়া হাসি গুণ, জ্যোতি হস্তাঙ্গি, দোল ডিহা, নয়া ডিহা, মোড়ন ডিহা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুদিন আগেও বহু সরাক সম্প্রদায়ের মানুষকে দেখা যেত। বর্তমানে তাঁদের অনেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ সরাক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে এঁরা অরক্ষিত দাসপক্ষী ও মহিমাপক্ষী এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এঁদের পূর্ব পুরুষেরা হয়তো সরাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২৮. অঘোরী অর্থাৎ যাদের ঘর নেই। এরা যায়াবর শ্রেণীর সরাক।

এই কেপ কটক বর্তমানকালের বালেশ্বর জেলার কেপারি গ্রাম। পার্শ্বনাথের নামের সঙ্গে কলিঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ ঘোগ রয়েছে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি অঞ্চলে তাঁই অনান্য তীর্থকরদের চাইতে পার্শ্বনাথের প্রচার ও গুরুত্ব বেশি দেখা যায়। সে সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে কুমুদ নামে এক আঞ্চলিক উপজাতি বাস করত। তারা পার্শ্বনাথের ধর্মমত প্রচারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিল।

মহাবীর স্বামীও এককালে কলিঙ্গে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস ঘন্টে বলা হয়েছে Mahavira Vardhaman went to Kalinga as the King of that country was a friend of his father.<sup>২৯</sup> পিতৃবন্ধু কলিঙ্গ দেশের রাজা নাকি মহাবীর স্বামীকে ধর্ম প্রচারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সন্দাট খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপির ১৪তম লাইনে মহাবীর বর্দ্ধমানের কলিঙ্গ ভ্রমণের কথা আছে। মহাবীর প্রথমে কুমারী পর্বতে এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। মহাবীরের সময় কলিঙ্গ দেশকে জৈন ভূমি বলা হত।

এককালে কলিঙ্গ দেশে একটি বড় বন্দর ছিল। এই বন্দরটির নাম পিহংগি। জৈন ধর্মের প্রচারকবৃন্দ এই বন্দর দিয়ে ধর্ম প্রচারের কাজে দূর দেশে যেতে পারতেন। পরবর্তীকালে পিহংগি এক বড় ধরণের সরাক সংস্কৃতির তীর্থভূমি বলে পরিগণিত হত। এক সময় চম্পা রাজ্য থেকে এক বণিক পিহংগিতে এসে বসবাস পরিগণিত হত। এক সময় চম্পা রাজ্য নারীকে বিবাহ করে বেশ কিছুদিন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এখানে এক সুন্দরী নারীকে বিবাহ করে বেশ কিছুদিন সংসার ধর্ম পালন করার পর শ্রাবকাচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সন্দাট খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে পিহংগি শব্দটি পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে জৈন ধর্ম কলিঙ্গ রাজ্যের জাতীয় ধর্মের রূপ লাভ করে। চেন্দি বংশের রাজাদের আমলে জৈন ধর্ম সারা উড়িষ্যা অঞ্চলকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এমন কি হিউয়েন্সাঙ্গ যখন ভারতের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন তখনও কলিঙ্গ দেশে জৈন ধর্ম কলিঙ্গের রাজধর্ম বলে বিবেচিত হত। এই সময় কেবল মাত্র উড়িষ্যাতেই নয়, গুজরাট, সারওয়াড় প্রভৃতি অঞ্চলেও জৈন ধর্ম জাতীয় ধর্ম বলে পরিগণিত হত। এ প্রসঙ্গে Imperial Gazetteer of India-তে বলা হয়েছে, During the mediaeval period of India Jainism secured much political influence. It became the state religion of the Calukya prince of Gujarat and Marwar and the king of the Kara Mandal coast.<sup>২৯</sup>

২৯. অঘোরী সৃষ্টি।

৩০. Imperial Gazetteer of India pp-414-417.

খণ্ডগিরি অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই সরাকেরা বাস করে আসছেন। এখনও এই স্থান সরাক সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি বলে পরিগণিত হয়। মাঘ শুল্ক সম্প্রদায়ে এখানে বিরাট মেলা বসে। সেদিন হাজার হাজার সরাক জাতির মানুষ জেন সাধুদের সঙ্গে মিলিত হন।

ময়ূরভঙ্গের ভঙ্গবৎশীয় রাজারা অতীতে ধর্মের দিক দিয়ে শ্রাবক ছিলেন। এই বৎশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বীরভদ্র এক কোটি সরাক সাধুর গুরুদেব ছিলেন। এই বৎশের অন্যান্য রাজারাও ভূমিহীন সরাক সম্প্রদায়ের মানুষকে বহু গ্রাম দান করেছিলেন। ভঙ্গ বৎশের সৃষ্টির মূলেও সরাক সংস্কৃতির অবদান রয়েছে। তাঁদের বৎশারার সঙ্গে মিশে আছে শ্রাবকাচার। কথিত আছে যে এই বৎশ ময়ূরের ডিম থেকে এসেছে। আর তাই এর নাম ময়ূরভঙ্গ বৎশ। আবার এই ময়ূর সাধারণ ময়ূর নয়, এই ময়ূর হল শ্রাবক সংস্কৃতিমূলক পুরাণে বর্ণিত শ্রুতদেবীর বাহন। শ্রুতদেবী হলেন ময়ূরবাহিনী দেবী সরস্বতী।<sup>১০</sup>

উড়িষ্যার সরাকদের বিভিন্ন ধরনের পদবী বা টাইটেল আছে। এই সকল পদবীর মধ্যে পাত্র, দন্ত, সাঁতরা, বর্দন, মাহাত্ম, দেবতা, প্রামাণিক, আচার্য, বেহারা, দাস, সাও, মণ্ডল, নায়েক, সেনাপতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ। সরাকদের এইসব পদবী কিভাবে এলো তার কোন ইতিহাস জানা যায় না। তবে পাত্র, মণ্ডল, নায়েক প্রভৃতি পদবী পশ্চিম বাংলার সরাকদের মধ্যেও দেখা যায়।

পশ্চিমবাংলার সরাক সম্প্রদায়ের মত উড়িষ্যার সরাক সম্প্রদায়ের কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। রঙিনী সরাকী তাঁতীরা নিজেদের ব্রাহ্মণের চাইতে উঁচু জাত বলে মনে করেন। এই কারণে তাঁরা ব্রাহ্মণদের হাতে জল খান না। আগেই বলেছি পশ্চিমবাংলার সরাকদেরও আগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন। তাঁদেরও মধ্যে নিজেদের প্রসঙ্গে বেশ উঁচু ধারণা আছে। এখানের সরাক মেয়েরা ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও ভাত খায় না। হয়তো ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অতীতের বাদ-বিবাদেই উড়িষ্যা ও পশ্চিমবাংলার সরাকদের এইসব ধারণার জন্ম দিয়ে থাকবে। উড়িষ্যার সরাকেরা ডুমুর খান না। কারণ ডুমুরে নাকি পোকা হয়। পশ্চিমবাংলার সরাকেরাও ডুমুর খান না।

উড়িষ্যার সরাকদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই বলেই সময় সময় তাঁরা নিজেরাই গৈতে ধারণ করে পূজা বা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকেন। উড়িষ্যার সরাকদের বিবাহ ও অন্যান্য আচার-আচরণ নিয়ে দুটি গুরু আছে। একটি হল বিবাহকাণ্ড। আর অপরটি নাম হল শুদ্ধিক্রিয়া।

১০. এই শ্রুতদেবী সরস্বতীতে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তিতে দেখা যাবে।

সরাকী তাঁতীরা উড়িষ্যার বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কটক জেলার আসিয়া পাহাড়, ছত্তিয়া পাহাড়, চন্দোড়, জাঙ্গপুর, রঞ্জগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সরাক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করেন। এছাড়া তিগিরিয়া, বড়স্বা, বাঁকি ও পুরি জেলার পিপলি প্রভৃতি অঞ্চলে সরাকদের প্রভাব রয়েছে।

করাপুর জেলার বৈরব সিংহপুর, জয়পুর তালুক প্রভৃতি অঞ্চলের ১৯৪১ সালের লোক সংখ্যা ছিল ১১৪১ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই হলেন সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ। এখানকার এক শিব মন্দিরে ঋষভ নাথের একটি মূর্তি আছে। এই মূর্তির গায়ে চারীরা তাঁদের কুড়ুল জাতীয় অস্ত্র ধার দিয়ে থাকেন।<sup>১১</sup> এই কারণে মূর্তি বর্তমানে ক্ষয়ে গিয়েছে।

আগেই বলেছি উড়িষ্যার সরাকদের মূল পেশা হল তাঁত শিল্প আর এই কারণেই তাঁদের তাঁতী বলা হয়। তবে এইসব সরাকেরা প্রাচীনকাল থেকেই যে তাঁত শিল্পে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। সরাকেরা বাঁচার তাগিদেই কাপড় বোনার কাজটাকে বরণ করে নিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার রিশলের কথা স্মরণীয়।

In Orissa they (Saraks) call themselves Buddhists and assemble once a year at the famous Cave Temple of Khanda Giri near Cuttak to make offering to the Buddhists images there and to confer on religious matters.

But the survival of their ancient faith have not saved them from the all pervading influence of caste. They have split out into endogamous groups based partly on locality and partly on the fact that some of them have taken to the degraded occupation of weaving and now form a Hindu case of the ordinary type.<sup>১২</sup>

রিশলের রচনায় আমরা উড়িষ্যার সরাকদের দুটো অবস্থার কথা পাচ্ছি। প্রথমতঃ তাঁরা অনেকেই ধর্মাস্তরিত হয়েছিলেন আর দ্বিতীয়তঃ কাপড় বোনার মত নিম্নস্তরের পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলাতেও কিছু সরাক সম্প্রদায় বন্ধু শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হয়তো পশ্চিমবাংলার সরাকদের বিবাহ ও উড়িষ্যার সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁত শিল্প মধ্যে যুগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁত শিল্প সম্প্রদায়গত পেশায় রূপাস্তরিত হয়েছিল। আজও বিষ্ণুপুরে এর নির্দর্শন আছে।

১০. পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের পাশে রক্ষণগুপ্তের এমনি একটি তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে, সেখানে চারীরা কুড়ুল জাতীয় অস্ত্র ধার করে নেয়।

১১. The people of India.

আগেই বলেছি প্রাচীনকালে উড়িষ্যা জৈন ভূমি বলে পরিগণিত হত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে তৈরী করা প্রচুর পরিমাণে সরাকদের ভাস্কর্য শিল্প ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে খণ্ডগিরির গুহা চিত্র সব থেকে প্রাচীন। হাতিগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, জয়-বিজয় গুম্ফা প্রভৃতি জৈন ভাস্কর্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গুম্ফার দ্বারে কোথাও প্রাণিতাত্ত্বিক যুগের হাতি। আবার কোথাও বা কাহিনী চিত্র আছে। এইসব ভাস্কর্য শিল্পকলা খণ্ডগিরির প্রাচীন গুহাগুলোর শিল্প উৎকর্ষতা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাণীগুম্ফার প্রাচীন কাহিনী চিত্র আমাদের মনকে সেকালের এক অলিখিত ইতিহাসের পাতায় টেনে নিয়ে যায়।

বালেশ্বর জেলার চরম্পা গ্রামে শাস্তিনাথের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। তাছাড়া আড়শপুরে আছে ঋষভনাথের মূর্তি। উড়িষ্যার কটকে একটি সুন্দর জৈন মন্দির আছে। এখানে বহু তীর্থকর মূর্তি সংরক্ষিত আছে। এই সব তীর্থকর মূর্তিগুলোর মধ্যে পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ, মহাবীর, অজিতনাথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে ঋষভনাথকে শিবরূপে সাজিয়ে পূজা করার রীতি আছে। প্রাচীনকালে ঋষভনাথ ও শিবকে অভিন্ন দেবতা বলে মনে করার একটা রীতি গড়ে উঠে ছিল। কেউবার জেলার আনন্দপুর সাব-ডিভিশনের নয় মাইল দূরে কোড় সিংড়ি গ্রামে শতাধিক তীর্থকর মূর্তি ও যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। এই স্থানটি আগে তোষল রাজ্যের অস্তর্গত ছিল। হয়তো এটাই ছিল অতীতের শৈলপুর গ্রাম। সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এইসব শিল্পকলা যেন আমাদের কানে কানে অতীতের কথা বলে যায়। এগুলো যেন পাষাণ ফলকে রচিত ইতিহাসের এক একটি পাতা। বল্লভ ভাইয়ের ভাষায় বলা যায়-

The Jain architecture is nothing but a kind of history, that it is a standing and living record and it supplies us a more vivid and lasting picture of a nation than history does.

উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরেও ঔই অঞ্চলের সরাক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশি। প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্যের মূল ভিত্তিটাই রচনা করেছেন শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

উড়িষ্যার কোনও কোনও পাহাড়ী অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে কেঁড়া পদ্মতোলা গান শোনা যায়। এই গানের মধ্যেও আছে সরাক সংস্কৃতির প্রভাব।

উড়িষ্যার প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এমনকি বৈদিক আর্য সংস্কৃতির গ্রন্থেও শ্রাবক সংস্কৃতির প্রচুর কথা আছে। সারলা মহাভারতে শ্রাবক সংস্কৃতির বেশ কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। এই গ্রন্থের এক স্থানে বলা হয়েছে-

রাধাচক্রে বুলু আছে সাত তাল উঁচে।  
তালে উপরে পটাল আছে যে সুসংপ্রেণ।।

এখানে “রাধাচক্র” শব্দটি শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হরিবংশ পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। সংস্কৃত মহাভারতে রাধাচক্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে আবার মনে করেন যে রাধাচক্র শব্দটি জৈন গ্রন্থ পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক সারলা মহাভারতে যে শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মধ্য যুগে শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণীর প্রভাবে বাংলা ও উড়িষ্যায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই সব গ্রন্থের মধ্যে ভাগবতের স্থান সবার উপরে। এই ভাগবত গ্রন্থের উপরেও শ্রাবক সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। উড়িষ্যার জগন্নাথ দাসের ভাগবতে ঋষভনাথের কথা আছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভনাথের তাঁর শত পুত্রকে যে সব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে কেবল মাত্র শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাবই নয়, প্রকৃতপক্ষে শ্রাবক সংস্কৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আছে-

শ্রী শ্রী ঋষভনাথের উবাচ  
তো পুত্র মানে সাবধান,  
শুনহে আমার বচন।  
যে প্রাণী যে কার্য মান  
নিরতে করে আচরণ  
সে প্রাণী ব্যর্থ এ সংসারে  
পড়ে নরক মহা ঘোরে।

কেবলমাত্র জগন্নাথ দাসের ভাগবতেই নয়, চৈতন্য দাস বিরচিত বিষ্ণুগর্ভ পুরাণ গ্রন্থেও ঋষভনাথের ও ভরতের চরিত্র আছে। এইভাবে উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্যেও সরাক সংস্কৃতির এক বিশেষ ধরণের প্রভাব দেখা যায়।

উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কিছু কাহিনী কিংবদন্তীমূলক লোককথা বা রূপকথা জাতীয় কাহিনী প্রচলিত আছে। এইসব কাহিনীগুলো মানের দিক দিয়ে খুব উন্নত ও মনকে বড়ই আকর্ষণ করে। সরাক সংস্কৃতি নিয়ে রচিত উড়িষ্যার লোক কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি কাহিনী আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব। কাহিনীটির নাম চিত্রসেন পদ্মাবতী।

কোনও এক সময়ে কলিঙ্গ দেশে বসন্তপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বীরসেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রত্নমালা। আর তাঁর ছেলের নাম চিত্রসেন।

বীরসেনের মন্ত্রী পুত্র রত্নসার চিত্রসেনের পরম বন্ধু ছিলেন। এই দুই বন্ধুর কন্দর্প নিন্দিত রূপ ছিল। তাঁদের দেখলে বসন্তপুরের মেয়েরা চোখ ফেরাতে পারত না। দুজনেই ছিলেন সুন্দরী নারীদের কামনার বস্ত। নগরের মেয়েরা সব সময় রাজপুত্র আর মন্ত্রী পুত্রের রূপ দেখতে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকত। চিত্রসেন এবং রত্নসারের এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ থেকেই জন্ম নিল জনসাধারণের মনে হিংসা। রাজ্যের প্রজারা এই দুই কুমারের চরিত্রকে কল্যাণ করলেন হিংসার নোংরা দৃষ্টি দিয়ে। তারপর তাঁরা দল বেঁধে বসন্তপুরের রাজাকে বাধ্য করলেন চিত্রসেন এবং রত্নসারকে নির্বাসন দিতে।

মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে দুই বন্ধু নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নিলেন এক গভীর জন্মলে। এই জন্মলে একদিন রাত্রে চিত্রসেন যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন রত্নসার দূর থেকে ভেসে আসা জনমানবের কলরব শুনতে পেলেন। তিনি চিত্রসেনকে ঘুম থেকে উঠালেন। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে যে দিক থেকে কোলাহল আসছিল সেই দিকে যাত্রা করলেন।

কিছুক্ষণ পর দুই বন্ধু হাজির হলেন এক মন্দিরে। মন্দিরে শাস্তিনাথের বিগ্রহ ছিল। সেখানে ষ্঵র্গবাসী কিম্ব-কিম্বীরা উৎসব করছিল। দুই বন্ধু কিম্বীরাদের অপূর্ব নৃত্য পরিদর্শন করে প্রায় মুঞ্চ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় মন্দির গাত্রে একটি অসাধারণ সুন্দরী নারীর পাষাণময়ী মূর্তি দেখতে পেলেন। নারী দেহের এত রূপ তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাই রাজপুত্র চিত্রসেন ঠিক করলেন যে, যে কোনও উপায়ে তিনি এই অসামান্য রূপবতী নারীকে বিবাহ করবেন। এই সুন্দরী নারীর নাম পদ্মাবতী। বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করে তৈরী করেছেন বিধাতা এই নারী দেহ। পদ্মাবতী নাকি এককালে পুরুষদের ঘৃণা করত। এক ভাস্কর্য শিল্পী পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী কোন পুরুষকেই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। শিল্পীর মনের মধ্যে পদ্মাবতীর যে রূপরাশি প্রবেশ করেছিল তাই দিয়ে তিনি এই পাষাণ মূর্তি নির্মাণ করে গিয়েছেন। পাষাণ ফলকে জন্ম দিয়েছেন আর এক পদ্মাবতীকে।

মন্দিরের পাশে এক সরোবর ছিল। এখানে বিশ্রাম করার সময় চিত্রসেন তাঁর পূর্ব জন্মের কথা শুনলেন। শুনলেন আর এক কাহিনী। একদিন এখানে এক সওদাগর পুত্র বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন জিন ভক্ত। তিনি জিন দেবতার পূজা দিয়ে সকলকে অমন্দান করে নিজে অন্ন গ্রহণ করলেন। সেই সরোবরে এক হংস ও হংসী বাস করত। তারা সওদাগর পুত্রের এই কাজের খুব প্রশংসনা করল। এই পুণ্যের ফলেই নাকি হংস চিত্রসেন রূপে জন্ম নিয়েছে। আর হংসী হয়েছে পদ্মাবতী।

রাজপুত্র চিত্রসেন তখনই নিজের দেশে ফিরে গেলেন। তারপর পদ্মাবতীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে পদ্মাবতীর দেখা হল। চিত্রসেন এবার পদ্মাবতীকে নিজের মনের কথা বললেন।

পদ্মাবতী জবাবে বলল, - না, আমি পুরুষদের ঘৃণা করি।

- তুমি আগের জন্মে যে পুরুষকে ভালবাসতে সেই পুরুষকেও ঘৃণা কর? জানতে চাইলেন চিত্রসেন।

- সে পুরুষ কোথায় আছেন? প্রশ্ন করল পদ্মাবতী।

- তোমার চোখের সামনে। তুমি চোখ মেলে তাকাও দেখতে পাবে। উভর দিলেন চিত্রসেন। অবাক বিশ্বায়ে তাকাল পদ্মাবতী।

তারপর পদ্মাবতীকে চিত্রসেন তাঁদের অতীত জীবনের কাহিনী শোনালেন। পদ্মাবতী মুঞ্চনেত্রে তাকিয়ে থাকল চিত্রসেনের দিকে। পুরুষের দেহে এত রূপ সে কখনও দেখেনি। চিত্রসেনের রূপে মুঞ্চ হল পদ্মাবতী। তার পুরুষ বিবেষ দূর হল। চিত্রসেন এবং পদ্মাবতী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এইসময় বসন্তপুরে মহাবীর স্বামী এসেছিলেন তাঁর অমরবাণী শোনাতে কলিঙ্গবাসীকে। রাজা বীরসেন তাঁর উপদেশে মুঞ্চ হয়ে চিত্রসেন পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দিলেন। এরপর পদ্মাবতীর একটি সন্তান হল। সংসার হল পুণ্যময়। এই কাহিনী অতি দীর্ঘ এবং এর কিছু রূপান্তরও আছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীটি বর্ণনা করলাম। এর ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও হয়েছে।<sup>১০</sup>

ভাস্কর্য শিল্প ও সাহিত্য ছাড়াও উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনে সরাক সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। ডেক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ শাহুর মতে উড়িষ্যার জগন্নাথ সংস্কৃতিতেও শ্রাবক প্রভাব আছে।<sup>১১</sup> উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরে কইলি বৈকুণ্ঠ আছে। এই কইলি বৈকুণ্ঠ শব্দটা শ্রাবক প্রভাব জাত করলেই মনে হয়। শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কৈবল্য শব্দ থেকেই এটা এসেছে বলে মনে হয়।

অনেকে ঝৰ্ভদেবকে জগন্নাথদেবের প্রতীক বলেই মনে করেন। ঝৰ্ভ সংস্কৃতিই জন্ম দিয়েছে জগন্নাথদেবের ভাব কল্পনাকে। এই কারণেই হয়তো উড়িষ্যার ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে ঝৰ্ভনাথের কথা আলোচিত হয়েছে এবং তাঁর চরিত্রটি স্থান লাভ করেছে।

জগন্নাথ যে ঝৰ্ভনাথেরই প্রতীক তার আরও কিছু প্রমাণ আছে। পুরী ও ভুবনেশ্বরে আষাঢ় শুল্কা দ্বিতীয়ায় এবং চৈত্র শুল্কা অষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা হয়ে থাকে। আষাঢ় শুল্কা দ্বিতীয়ায় প্রথম তীর্থক্ষেত্র ঝৰ্ভনাথের গর্ভ কল্যাণদের শুভ লগ্ন ছিল। তাঁর জন্ম দিনেই রথযাত্রা হয়ে থাকে। তীর্থক্ষেত্রদের গর্ভ সংধর, জন্ম,

৩২. Buddhvijoy, Chitrasen Padmavati Caritam- by Mul Raj Jain.

৩৩. উড়িষ্যা ভাষায় লেখা ‘উড়িষ্যার জৈন ধর্ম’- ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহ।

দীক্ষা, জ্ঞানপ্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি যে তিথিতে হয় সেই তিথিতেই নাকি স্বর্গের দেবতারা উৎসব পালন করে থাকেন। এইসব তিথিতে শ্রাবক সম্প্রদায় চৈত্য যাত্রা করেন। চৈত্য যাত্রার সঙ্গে রথ যাত্রার প্রচুর মিল আছে। এতে চৈত্য নির্মাণ করে তার মধ্যে জিন মূর্তি রাখা হয়। তারপর তা নিয়ে নগর পরিত্রুণ্মা করা হয়। এই রীতি রথযাত্রার রীতির সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সুতরাং রথযাত্রার ভাব কল্পনায় শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া উড়িষ্যার শৈব সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় শ্রাবক সংস্কৃতির বেশ কিছুটা দান রয়েছে। ভূবনেশ্বর অঞ্চলে বহু শিব মন্দিরই তৈরী হয়েছে শ্রাবক শিল্পীদের হাতে। বহু জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরকে শিব মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কোন মন্দিরে ব্রিশুল থাকলেই সেটা শিব মন্দির হবে এমন কোন কথা নেই। ব্রিশুল ঋষভনাথের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত।

উড়িষ্যার লোক সমাজে কল্পবৃক্ষে পূজা খুব জনপ্রিয়। বলা বাহ্য্য এই কল্পবৃক্ষ পূজা সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সেকালে শ্রাবক সংস্কৃতি বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছে। এমন কি অনার্য সংস্কৃতির উপরেও সরাক সংস্কৃতির দান কর নয়। তাই কেবলমাত্র উড়িষ্যা নয়, সর্বভারতের আর্য অনার্য সংস্কৃতির উপর জৈন সংস্কৃতির অবদান বলতে গিয়ে বলা যায়—

The characteristic feature of Jainism is its claim to universality. It also declares its object to be to lead all men to salvation and to open its arms not only to the noble Aryans but also to the low form sudra and even to the alien deeply despised in India as the Mlechha.<sup>৫৮</sup>

এ কথার আরও সত্যতাকে আমরা উপলক্ষ্য করব পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি বিষয়ক আলোচনাগুলোতে।

## পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

॥ দ্বিতীয় খন্দ ॥

সৃষ্টির কথা

॥ এক ॥

### পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির

সরাক সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। কারণ পুরুলিয়ার সরাকদের একটা পূর্ণসং

চিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে এটার প্রয়োজন ছিল। পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির আলোচনার ক্ষেত্রে এর পটভূমিকাকে আমরা অবশ্য বেশি বাড়াব না। পুরুলিয়া, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। তাছাড়া পুরুলিয়ার বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রগুলোর পুরাকীর্তির আলোচনার আগে এখানের পাথরের প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটা সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পুরুলিয়ার মন্দির শিল্পে বেশ কিছুটা কলিঙ্গ রীতির প্রভাব আছে। কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী প্রাচীন মন্দিরগুলোকে আমরা সাধারণতঃ তিনি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১। রেখা দেউল।

২। পিদা দেউল।

৩। কাথেরা দেউল।

১। রেখা দেউল।

রেখা দেউল হল পুরুষ জাতীয় দেউল। সাধারণভাবে উড়িষ্যার শিব মন্দিরগুলো সবই এই জাতীয় মন্দির। উড়িষ্যার ভূবনেশ্বরের নিম্নরাজের মন্দিরটিও এই জাতীয় মন্দির। পুরুষ জাতীয় দেবতার জন্য রেখা দেউল নির্মাণ করার রীতি আছে।

রেখা জাতীয় মন্দিরের তিনটি অংশ থাকে। যথা- মন্তক, গণ্ডি এবং বধ।

মন্তক অংশটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। কলস, খাপুরী, অসালক এবং বেঁকি। বধ অংশটাও আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন, বরাণ্ডি, উপর জঙ্ঘা, বন্ধন, তল জঙ্ঘা, পা ভাগ এবং পিছা বা আসন। রেখা জাতীয় মন্দির অনেকটা লিঙ্গাকৃতির হয়ে থাকে।

২। পিদা দেউল।

পিদা দেউল শ্রী জাতীয় দেউল। এই জাতীয় দেউলকেও তিনি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- মন্তক, গণ্ডি এবং বধ। এই জাতীয় মন্দিরের বরাণ্ডির উপরের অংশটা প্রায় ত্রিভুজাকৃতি নারীদের ভগদেশ ত্রিভুজাকার। সন্তুত : এই ভাবধারা নিয়েই এই মন্দিরের উপরের দিকটা ভগাকৃতি হয়েছে। উড়িষ্যার মিথুনভাব ধারায় (Mithun Cult) শিব মন্দির রেখা জাতীয়রাপে তৈরী হয়েছে এবং এর পাশেই পিদা মন্দির পার্বতীর জন্য তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ মন্দির তৈরীর মধ্যেও একটা মিথুন ভাবধারা কাজ করেছে।

### ৩। কাখেরা দেউল।

কাখেরা দেউল ফেরি নৌকোর আকারে তৈরী। উড়িয়া শব্দ বৈঠা কথারার অর্থ হল ফেরি নৌকো। ফেরি নৌকোর মধ্যে যাত্রী থাকে বলে এই মন্দিরকেও স্তু জাতীয়া মন্দির বলা যেতে পারে। দৈবী মন্দিররপে কাখেরা জাতীয় মন্দিরই নির্মাণ করা হয়।

পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দিরগুলো সবই রেখা জাতীয় মন্দির। পাকবিড়রা, বোঢ়াম, পাড়া, ছড়ারা, তেলকুপী, ভাঙড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সব মন্দিরগুলোই কলিঙ্গরাতিতে তৈরী রেখা জাতীয় মন্দির। বর্ধমান সীমান্তের বড়াকর এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ার মন্দিরগুলোও এই জাতীয় মন্দির। বড়াকরে চারটি পাথরের মন্দির আছে। এগুলো যদি শিব মন্দিররপে তৈরী হত তবে অবশ্যই রেখা শ্রেণীর মন্দিরের সামনে পিদা শ্রেণীর মন্দির পার্বতীর জন্য তৈরী হত। আসলে এগুলো শিব মন্দিররপে তৈরী হয় নি। এগুলো সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির। ওইগুলোর গর্ভদেশে তীর্থকর মূর্তি ছিল। তা সরিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয়েছে। বহুলাড়ার মন্দির প্রসঙ্গে একই কথা বলা যেতে পারে। বহুলাড়ার মন্দিরের গর্ভদেশে এখনও তীর্থকর মূর্তি চোখে পড়ে। পুরুলিয়ায় কোন পিদা শ্রেণীর অর্থাৎ স্তু জাতীয় পাথরের মন্দির নেই। সমস্ত মন্দিরই রেখা শ্রেণীর মন্দির। পাকবিড়রায় তিনটি পাথরের মন্দির আছে। ছড়ারায় সাতটির মধ্যে মাত্র একটি এখনও টিকে আছে। বুধপুরে পাঁচ/ছয়টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র দুটি বর্তমানে দেখা যায়। এছাড়া চেলিয়ামার পাশে বাঁদা সেটতোড় গ্রামে একটি মন্দির আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সব থেকে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতিকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ায় একটি মন্দির ইতিহাসের নীরব সাক্ষীর মত।

দেউলঘাটায় পাথরের মন্দিরগুলোর বধ অংশটুকু পড়ে আছে আর বাকি সব ভেঙ্গে গিয়েছে; অবশ্য এখানে আশৰ্চ্য সুন্দর তিনটি ইঁটের মন্দির আছে। সব মন্দিরগুলোই রেখা শ্রেণীর মন্দির (Male edifice)।

সাধারণভাবে পুরুলিয়ার সব মন্দিরের গাত্রের অলঙ্করণ বেশ মার্জিত। মন্দিরগুলোর অলঙ্করণ নানা ধরনের জটিল রীতির ভাস্কর্য শিল্পকলায় পূর্ণ থাকলেও কোথাও মিথুন মূর্তি (Couple in Coitus) চোখে পড়ে না। অবশ্য পুরুলিয়ার বিশেষ করে পাকবিড়রার পাথরের মন্দিরগুলোর অলঙ্করণ যুক্ত গায়ের ঘাল তুলে ফেলা হয়েছে। পাড়া এবং পাকবিড়রা এই দুই স্থানের মন্দিরগুলোই সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। অপরদিকে ছড়ারা, তেলকুপী, বাঁদা, সৌতোড় প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের অলঙ্করণ অনেকটা বরাকরের মন্দিরের অনুরূপ। বরাকরের মন্দিরগুলো

শিবলিঙ্গকে গর্ভে ধারণ করে মন্দির ধ্বংসকারীদের কালো হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাকবিড়রার মন্দিরগুলো তা পায় নি, এদের গাত্রাভরণ আজ মাটির তলায় কবরস্থ আছে। যাইহোক, পাকবিড়রা, বুধপুর, বোঢ়াম, পাড়া, দেউলভিড়া, ভাঙড়া, লধুড়কা, তেলকুপী, বাঁদা, সৌতোড়, বুন্দলা প্রভৃতি স্থানের পুরাকীর্তির নির্দর্শনগুলো আমরা এবার আলোচনা করে দেখব।

॥ দুই ॥

॥ পাকবিড়রা ॥

পাকবিড়রা প্রাচীন সরাক সংস্কৃতির সুবর্ণভূমি। পুরুলিয়ার যাদুঘর। এখানেই আছে পুরুলিয়া জেলার সাড়ে সাত ফুট লম্বা মহান তীর্থকরের বিগ্রহ। পুঁতি থেকে দু'মাইল পূর্বে আর পুরুলিয়া থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত পাকবিড়রা বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের লোকেরা বলে পাক কথার অর্থ পাখি আর বিড়রা কথার অর্থ তাড়ানো। সুতরাং পাকবিড়রা কথার অর্থ পাখি তাড়ানো। কি জানি এ গ্রামের জঙ্গলময় স্থানের শাস্ত ভূমিতে হয় তো এককালে প্রচুর পাখি আস্তানা গেড়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের বিরক্ত করে মারত পাখি ধরার দল। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই আছে বুধপুর। শুনেছি এখানের গাজন মেলায় প্রচুর পরিমাণে শ্যামা পাখির বাচ্চা কেনা-বেচা চলত। পাকবিড়রার এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে রচিত হয়েছিল অতীত যুগের ভাস্কর্য শিল্পের এক গৌরবময় অধ্যায়। এখানের মাটিতে সেকালের চারটি মন্দিরের সঞ্চান পাওয়া যায়। একটি একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। বাকি তিনটির গায়ের ছাল তুলে ফেলে নষ্ট করা হয়েছে। মহাকালের কালো হাতের ঘর্ষণে মন্দিরের অলঙ্করণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। পরিকল্পিতভাবে মন্দিরের অন্ম্বল্য ভাস্কর্য শিল্পের নির্দর্শন যুক্ত ছাল তুলে ফেলা হয়েছে। এর নির্দর্শন দেখতে পাওয়া যাবে মন্দির গাত্রের সর্বাঙ্গে এবং মাটির নীচ থেকে তোলা মন্দির গাত্রের অলঙ্করণের হাজার হাজার ভগ্ন শিলাখণ্ডের মধ্যে।

এখনও মন্দিরগুলোর নীচের দিকের কোন কোন স্থানের অলঙ্করণ রয়ে গিয়েছে। কিছু ভাস্কর্য শিল্পের নির্দর্শনস্বরূপ জৈন শাসন দেব-দেবীর মূর্তি ছাড়া সাধারণ অলঙ্করণ রীতির সঙ্গে বরাকরের মন্দিরগুলোর অলঙ্করণের বেশ কিছুটা মিল ধরা পড়ে। পাকবিড়রার মন্দিরগুলোর অক্ষত রূপটি কেমন ছিল তার নির্দর্শন পাওয়া যাবে বরাকরের মন্দিরগুলোর মাঝেই। প্রায় একই মডেলে এইসব মন্দির তৈরী হয়েছিল। তবে অলঙ্করণে পাকবিড়রার এই মন্দিরগুলো বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য শিল্পে পূর্ণ ছিল।

কিছুদিন আগে পাকবিড়রার মাটি থেকে প্রচুর মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের নির্দর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে আজও মাটির নীচে আরও শত শত মূর্তি ও অমূল্য

ভাস্কর্য শিল্প সম্পদ মুক্তির আশায় দিন গুণছে। কবে কোন যুগে রাজপুত্র সোণার কাঠি হাতে নিয়ে বীর বিক্রমে মাটি অপসারিত করে কবরখনার দুয়ার খুলে দেবেন জানি না। জানি না কতদিন ধরে এইসব প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো এইভাবে মাটি চাপা পড়ে থাকবে।

গ্রামের লোকেরাও এইসব শিল্পকলার নিদর্শনগুলো খুঁড়ে বার করতে চান না। তাঁদের ধারণা এগুলো মাটি থেকে বার করলেই রাতের আঁধারে চুরি হয়ে যাবে।

এখানের মূল বিগ্রহ মহান তীর্থকর মহাকাল ভৈরবে রূপান্তরিত হয়েছে। মূর্তিটি সাড়ে সাত ফুট লম্বা। চকচকে কালো পাথরে তৈরী হয়েছে। এত সুন্দর, এত নিখুঁত তীর্থকর মূর্তি পুরুনিয়ায় আর নেই। পণ্ডিতগণের মতে প্রায় দু হাজার বছর আগে মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল।

বৈশাখ মাসে এখানে এই তীর্থকর মূর্তিকেই মহাকাল ভৈরবরঘনপে পূজা করা হয়। উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রে দিনে। ছোট-খাটো গাজন মেলাও বসে। আগে গাজন সম্যাচীরা চড়ক উৎসবে যোগ দিতেন। বর্তমানে অবশ্য চড়ক পূজা হয় না, তবে খাড়া সম্যাচীদের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অনেকে মানসিক বা মানব শোধ করার জন্য পশু বলিও দিয়ে থাকেন। অহিংসা ধর্মের সাধক পুরুষ মহান তীর্থকরের চোখের সামনেই রক্তে মাটি ভিজে যায়। ছাগ শিশু আর্ত চিংকার আর তাজা রক্তের প্রেতে যে বিভঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে মহাকাল ভৈরবের ছয়বেশে মহান তীর্থকরের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। কিন্তু সে চোখের জলের হিসেব কেউ রাখে না।

পাকবিড়ার মাটি থেকে তোলা কয়েক শত ভাঙ্গোরা বিগ্রহ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। নারী মূর্তিগুলো চুরি হয়ে যায়। তীর্থকর মূর্তিগুলো পড়ে থাকে।

মূল বিগ্রহ ভৈরবনাথকে রাখার জন্য একটি ঘর বর্তমানে তৈরী করা হয়েছে। এই ঘরে এই বড় বিগ্রহটি ছাড়াও তিরিশ চালিশটি বিভিন্ন আকারের মূর্তি অতীতের অমর ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনস্মরণ পড়ে আছে। এছাড়া কিছু যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্তি আছে আর আছে জৈন শাসন দেব-দেবীর মূর্তি।

একটি নারী মূর্তি ও একটি পুরুষ মূর্তি আছে যাঁদের দুজনের র্ণ্ণ হাতে রয়েছে শিশু সন্তান। নারীর পায়ের নীচে রয়েছে ঘট আর পুরুষের পায়ের নীচে রয়েছে বাটি (cup)। উপরের দিকে চৈত্য বা বৃক্ষের প্রতিরূপ।

এককালে মিস্টার জে. ডি. বেগলার সাহেব নাকি এই ধরণের একটি মূর্তি মাটি থেকে তুলেছিলেন। একজন বিদেশী পরিদর্শক লিখেছেন-

Mr. Beglar also unearthed from one of the numerous mounds of ruins nearly five Buddhist sculpture of all age, the most remarkable being a male and a female figure under a tree possible the date palm.<sup>৩৫</sup>

মিস্টার বেগলারের মাটি থেকে তোলা যুগল মূর্তিটি পাকবিড়ার আছে, কিন্তু পাঁচটি বুদ্ধ মূর্তিকে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। খেজুর গাছের নীচে উপবিষ্ট এই যুগল মূর্তির (chaste couple) শীর্ষদেশে তীর্থকরের মূর্তি রয়েছে। অনেকের মতে এই নারী ও পুরুষ শীর্ষস্থিত তীর্থকরে যক্ষ এবং যক্ষিণী। আবার অনেকে মনে করেন এরা তীর্থকরের মাতা ও পিতা। খাজুরাহো, দেবগড় প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পাকবিড়ার অবহেলিত এই ছেট ঘরে একটি সুন্দর নারী মূর্তি আছে। সম্ভবতঃ এটি জৈন অধিকার মূর্তি। নীচের শিশু দৃষ্টে সে কথাই মনে হয়। আর একটি শিলাপটে রয়েছে সর্পের মুখে লীলায়িত নারী ও পুরুষ। বামপাশে নারী ডানপাশে পুরুষ। সম্ভবতঃ এঁরা ধরণেন্দ্র ও পদ্মাৰ্বতী। মাঝখানে তীর্থকর পার্শ্বনাথ। মূর্তির উপরের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে। নীচের দিকে দুজন নারী হাত জোড় করে বসে রয়েছে। সবার নীচে দুপাশে দুটি সিংহের মূর্তি আছে।

মন্দিরের অলঙ্করণযুক্ত ছাল বা গাত্র আবরণ যা আগে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছিল, তার কিছু অংশ বর্তমানে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। ভাঙ্গাচোরা এই সব মন্দির গাত্র অবরণের অলঙ্করণ ভাস্কর্য শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। এক স্থানের শিলাপটে রয়েছে ময়ুরের পিঠে অষ্টভূজা দেবীর মূর্তি। দেবীর মূল দুটি হাতে কোনরূপ অস্ত্র নেই। বাকি হাতে নানা ধরণের অস্ত্র বা অন্য কিছু রয়েছে বলে মনে হয়। দেবী মূর্তির ডানপাশে সিংহের মুখ দেখা যায়। নীচে চারজন করে দু পাশে আটজন তীর্থকরের মূর্তি উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আর মাঝখানে আছে ধর্মচক্র। এই অষ্টভূজা মূর্তিটি নাকি সপ্তদশ তীর্থকর কৃষ্ণনাথের শাসন দেবী আছ্যতা। উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতিতে ময়ুর বাহিনী দেবীকে শ্রতিদেবী বলা হয়েছে। যাঁর ডিম থেকে ময়ুরভঙ্গের রাজাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং এইদিক দিয়ে চিন্তা করলে এই ময়ুরবাহিনী দেবীকে জৈন সরবর্তী বলা যেতে পারে। কিন্তু জৈন সরবর্তী আবার চতুর্ভুজ। কেউ কেউ এই মূর্তিটিকে আচ্যতা মূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। পাকবিড়া থেকে ১৫/১৬ মাইল পশ্চিমে ভাঙ্গার গ্রামে একটি গোলাকার শিলা পটে ষড়ভূজা আচ্যতাৰ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এই মূর্তির নীচের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে বলে দেবীর বাহনকে

<sup>৩৫</sup>. Mr. G Coupland.

দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু স্থানেও এই ধরণের অষ্টভূজা ময়ূর-বাহিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বিভিন্ন আকারের বহু জৈন তীর্থকরদের মূর্তি রয়েছে পাকবিড়রায়। কোথাও তিনি পম্পফলা সর্পচত্রের নীচে ভাব গন্তীর পরিবেশে দণ্ডযামান। আবার কোথাও বা লীলায়িত সর্পকন্যাদের মাঝখানে আজানুল্লাস্তি বাহুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবার কোথাও বা তীর্থকরদের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে যক্ষিণীরা চামর হাতে নৃত্যরত অবস্থায়। একটি শিলাপটে রয়েছে সিংহপৃষ্ঠে নারী মূর্তি।

এইসব দেবী বা নারী মূর্তিগুলোর অলঙ্করণ প্রায় একই ধরনের। পরিপুষ্ট সুন্দর বশ্বদেশ। ভারী নিতম্ব। স্থূল কোমর ও গভীর নাভি দেশ। উন্নত নাসিকা। পাতলা ঠোঁট আর বক্ষিম ভঙ্গী। মূর্তিগুলোর হাতে পায়ে গলায় অলঙ্কার। কোমরে নিতম্ব লবিত মেখলা। শিথিল কবরী বক্ষন। মাথায় ছেঁট মুকুট।

পাকবিড়রায় একই শিলাপটে বেশ কিছু দুজন করে তীর্থকর মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া তীর্থকরের দুপুরে ছয়জন বা চবিশ জন তীর্থকরের মূর্তি রয়েছে। এইসব মূর্তিগুলো তিন থেকে চার ফুট লম্বা। সবগুলোই প্রায় অক্ষত আছে। এগুলো নাকি কয়েক মাস আগে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। সর্বাঙ্গে এখনও রয়েছে মাটির গন্ধ। এগুলো দেখলে মনে হয় যেন এই সেদিন এগুলো খোদাই করা হয়েছে। এই ধরণের বহু মূর্তি পাকবিড়রার মাটিতে স্থানে রাখিত আছে।

একটি বড় আকারের শিলাপটে খোদাই করা আছে চবিশ জন তীর্থকরের মূর্তি ১৪টি লাইন। মোট ৩৩৬টি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে এই শিলাপটে। দুর থেকে এ শিলাখন্দ শিলালিপির মত দেখায়। পাকবিড়রায় প্রায় চারটি মন্দিরের মডেল পাওয়া গিয়েছে। এই সব মন্দিরের মডেলগুলো (Miniature Temple) প্রথম সবই কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী রেখা দেউল। প্রথম মডেলটি গাঢ় বাদামী রঙের পায় সবই কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী রেখা দেউল। প্রথম মডেলটি গাঢ় বাদামী রঙের পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। মডেলটির মস্তক অংশটি অবশ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। মডেলটির মস্তক অংশটি অবশ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। এর চার মডেলটির বেঁকি অংশ থেকে বোরাণি পর্যন্ত অংশে ৩৮টি খাঁজ আছে। এর চার পাশে চারটি জৈন তীর্থকরের মূর্তি রয়েছে। এই মডেলে পাড়া নামক গ্রামের প্রাচীন পাশে চারটি জৈন তীর্থকরের মূর্তি রয়েছে। এই মডেলে পাড়া নামক গ্রামের প্রাচীন মন্দিরটি তৈরী হয়েছে। পাড়ার মন্দিরের অলঙ্করণের সঙ্গে এই মিনি মন্দিরটির অলঙ্করণেও বেশ মিল আছে। এটির নীচের দিকটি চৌকোনা হলেও উপরের অলঙ্করণেও বেশ মিল আছে। এটির নীচের দিকটি চৌকোনা হলেও উপরের অলঙ্করণেও বেশ মিল আছে।

দ্বিতীয় মিনি মন্দিরটি বর্গাকার তৈরী করা হয়েছে। এটিও বাদামী পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এই মিনি মন্দিরের মডেলে কোন মন্দির পুরানিয়ার তৈরী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটি লম্বায় প্রায় তিন ফুট। মন্দির গাত্রে সুন্দর অলঙ্করণ ও চার পাশে চারটি তীর্থকর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। এই মন্দিরের

আকারে অনেকের বাড়িতে তুলসীমঞ্চ বানানো হয়। তাছাড়া পুরানিয়ার লোক উৎসব টুসু পূজাতে টুসুর জন্য যে কাগজের ঘর বানানো হয় (চৌড়োল) তার আকার প্রায় এই মিনি মন্দিরগুলোর মতোই। মনে হয় এই ধরণের মন্দির শিল্পের বেশ কিছুটা ছাপ পড়েছে টুসু উৎসবের চৌড়োলের উপর। অনেক জৈন শিল্পকলাই পরবর্তীকালে পুরানিয়ার লোক শিল্পকলাকে সমন্বয় করেছে। তাই এই মিনি মন্দিরের প্রভাব চৌড়োলের উপর পড়েটা কোন অস্ত্রব ঘটনা নয়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ মিনি মন্দির দুটো নাকি কিছুদিন আগে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। তৃতীয় মিনি মন্দিরটার মডেলে তৈরী হয়েছিল পাকবিড়রা, তেলকুপী, বাঁদা, সৌতোড় এবং বড়করের মন্দিরগুলো। এটি একটি মন্দিরের প্রচলিত মডেল। চতুর্থ আকারের মিনি মন্দিরটি কতকটা তৃতীয়টির মতই তবে মন্দিরটির অলঙ্করণের শিল্প নেপুণ্যে মুঠো হতে হয়।

এখানে রাখিত প্রতিটি মন্দিরের মডেল এবং মূর্তিকেই ফুল, বেলপাতা ও সিঁদুর দিয়ে পুজো করা হয়। এই পূজোর মালা গলায় দিয়ে পাকবিড়রার মাটিতে সামান্য এক ছেঁট ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী হয়ে রয়েছেন বিশ্বের অহিংসার প্রতীক মহান তীর্থকর। তাঁর কপালে সিঁদুর। পায়ের নীচে ফুল ও বেলপাতা।

পাকবিড়রায় মন্দির যত আছে তার চার গুণ মন্দিরের কলস যেখানে সেখানে পড়ে আছে। এই মন্দিরের কলসগুলো মন্দিরের শীর্ষদেশে রাখা হয়। সুতরাং যতগুলো মন্দির ততগুলো কলস থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু মন্দিরের চাইতে কলসের সংখ্যা বেশি হল কিভাবে? এই কলসগুলো আবার শিল্প সম্মতভাবে তৈরী হয়েছে। এগুলো দেখলে মন ভরে যায়।

আগেই বলেছি যে পাকবিড়রায় বেশ কিছু বুদ্ধ মূর্তি বিগত শতাব্দীর পর্যটকদের চোখেও পড়েছে। আজ কিন্তু কোন বুদ্ধ মূর্তি দেখা যাবে না। এছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু বিষ্ণুমূর্তি ও গণেশমূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে এমন নির্দেশন পাওয়া যায়। পাকবিড়রার পাশেই আছে বুধপুর গ্রাম। এই বুধপুর বা মন্দিরে পূজা পাছে একটি চারহাত লম্বা থাম (Pillar)। এখানে দুটো গণেশমূর্তি ও একটা বিষ্ণুমূর্তি পড়ে রয়েছে। এগুলো যে পাকবিড়রা থেকেই আনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে পাকবিড়রায় বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরী হত। ওখানের মাটি থেকে যে শত শত ছোট আকারের তীর্থকর মূর্তি

এই সব কারণে আমার মনে হয় পাকবিড়রায় ভাস্কর্য শিল্পকলা ও মূর্তি নির্মাণের একটি কর্মশালায় শিল্পীরা নানা ধরনের মূর্তি নির্মাণ করতেন। তাঁরা এখানে জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দু এই তিনি মহান ধর্মের মূর্তি শুভ মূর্তি নির্মাণ করতেন। এখান থেকে বুদ্ধ মূর্তি এবং গণেশ মূর্তি বিদেশে সঙ্গে যুক্ত মূর্তি নির্মাণ করতেন। এখান থেকে বুদ্ধ মূর্তি এবং গণেশ মূর্তি দেশের রপ্তানি করা হত। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাভা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল।

সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে এই সব মূল্যবান শিল্পকলা বিদেশে পাঠানো হত। পাকবিড়রা অঞ্চলে গণেশ পুজার রীতি কোন দিনই বড় একটা ছিল না। অতীতে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের সামান্য প্রভাব থাকলেও কোন দিনই বুদ্ধ পুজার প্রধান্য ছিল না। এখানে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি যাতে করে বোৰা যাবে যে বৌদ্ধ ধর্মের বন্যায় পুরুলিয়ার জঙ্গলময় অঞ্চল ভেসে নিয়েছিল। বুধপুরের বুদ্ধেশ্বরের মন্দির ছাড়া আর কোন বৌদ্ধ মন্দিরের সন্ধান নিয়েছিল। বুধপুরে অবশ্য জৈন ধর্মেরও প্রভাব ছিল। এখানে এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। বুধপুরে অবশ্য জৈন ধর্মেরও প্রভাব ছিল। এমত অবস্থায় ৪/৫টি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে রয়েছে। এমত অবস্থায় পুরুলিয়ায় বুদ্ধমূর্তি আর গণেশমূর্তির ছড়াছড়ি কেন? সুতরাং এইসব বুদ্ধমূর্তি পাকবিড়রায় বুদ্ধমূর্তি এশিয়ার দক্ষিণ দেশে পাঠানো হত। এখান থেকে বুদ্ধমূর্তি ও গণেশমূর্তি দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত।

নয়া দিল্লীর জাতীয় প্রদর্শনশালায় ভৌগোলিক এবং কালান্ত্রিমানুসূচীর গণেশ সংস্কৃতির একটা চার্ট আছে (The story of Indian iconography, Ganesh:- Regional and Chronological) তাতে দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গণেশ সংস্কৃতির প্রভাব দেখান হয়েছে। অতীতে তাম্রলিপ্তি বন্দর বিভিন্ন দেশে গণেশ সংস্কৃতির প্রভাব দেখান হয়েছে। অতীতে তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়েই এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলোতে নানা ধরণের শিল্প দ্রব্য পাঠানো হত। পাকবিড়রার সঙ্গে তাম্রলিপ্তি বন্দরের গভীর যোগাযোগই প্রমাণ করে যে এখান থেকে ভাস্কর্য শিল্প ওইসব দেশে পাঠানো হত।<sup>৩৬</sup>

পাকবিড়রার অমর শিল্পকলা ঠিক কোন সময়ে তৈরী হয়েছিল তা বলা শক্ত। সাড়ে সাত হাঁট লক্ষ্মা মহান তীর্থকরের মূর্তিটি অনেকের মতে দেড় হাজার বছরেরও আগে তৈরী হয়েছিল। তবে পাকবিড়রায় তৈরী করা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে খাজুরাহো বা দেবগড়ের শিল্পকলার কিছুটা মিল আছে। সুতরাং খাজুরাহো ও দেবগড়ে যখন

৩৬. উত্তর বৌর্বিয়োর সঙ্গে সরাকদের বেশ কিছুটা যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ সরাক শিল্পীরা উত্তর বৌর্বিয়োর বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তি ও গণেশমূর্তি পাঠাত। হয়তো এই কারণে উত্তর বৌর্বিয়োর নাম হয়েছে “সারাওয়াক” বিষয়টি গবেষণা করে দেখার মত।

শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল তখন পাকবিড়রাতেও শিল্পকলা তৈরী হত। এই ঐতিহাসিক সত্যটা আমরা মেনে নিতে পারি। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। সুতরাং ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগেই পাকবিড়রার শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল এটা আমরা মেনে নিতে পারি। আর একটা কথা, খাজুরাহো ও উত্তিষ্যার শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল সেখানকার রাজা-মহারাজাদের প্রচেষ্টায়। ইতিহাসে তাঁদের নাম আছে। কিন্তু পুরুলিয়ার শিল্পকলার কোন ইতিহাস নেই। পাকবিড়রার অমর শিল্পকলা যাঁদের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছিল তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছেন।

ভারতবর্ষের মাটিতে সবচেয়ে অবহেলিত হয়েছে জৈন শিল্পকলা। সারা দেশের প্রদর্শনশালাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলে দেখা যাবে সব চাইতে কম জৈন প্রদর্শনশালাগুলোতে স্থান লাভ করেছে। তাই হয়তো পুরুলিয়ার মাটে-শিল্পকলা প্রদর্শনশালাগুলোর চারদিকে তীর্থকর মূর্তিগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। যক্ষিণী ময়দানে, পুরাক্ষেত্রগুলোর চারদিকে তীর্থকর মূর্তিগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। যক্ষিণী মূর্তিগুলো অবশ্য নারী মূর্তি বলেই বিভিন্ন স্থানে পাচার হয়ে গিয়েছে। পাকবিড়রার পুরাকীর্তিগুলোর অবস্থা দেখলে আমাদের মনে হয় যেন আমরা প্রতিদিন প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলোর অবস্থা দেখলে চাইছি। ইতিহাসকে কবর দিয়ে রাখছি। ইতিহাসের গতিকে স্তুক করে দেবার জন্য আমরা মুখ ফিরিয়ে বসে আছি। কিন্তু আমাদের উত্তর পুরুলিয়া কি এ সব দেখে আমাদের ক্ষমা করতে পারবে? তারা যদি কোনদিন আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে কি উত্তর দেব আমরা? শৃঙ্খলিত ইতিহাস তে মুক্তির পথ খুঁজবেই।

## ॥ তিনি ॥

### বোঢ়াম (দেউলঘাটা)

গ্রামের নাম বোঢ়াম। দেউল সংলগ্ন কংসাবতীর ঘাট। তাই নাম দেউলঘাট। কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলের বৃহত্তম পুরাক্ষেত্র হল পাকবিড়রা আর দেউলঘাটার স্থান হল দ্বিতীয়।

পুরুলিয়ার জয়পুর থেকে প্রায় তিনি মাইল দক্ষিণে কংসাবতীর তীরে বোঢ়াম একটি ছোট গ্রাম। নদীর দক্ষিণ পাশে পুরাক্ষেত্র দেউলঘাটা। এই অঞ্চলটি কাঁকুরে পাথুরে মাটি দিয়ে তৈরী পুরুলিয়ার বনাঞ্চলের অংশ বিশেষ। কংসাবতীতে বার মাস জল থাকে না। আষাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাস কংসাবতীর যৌবনকাল। আর বার্ষিক সময়টাতে কংসাবতীকে দেখলে মনে হয় যেন কোন অজানা প্রিয়জনের আশায় জীবনের সহ্য সঞ্চয় করে বসে আছে সে। দেউলঘাটায় ইঁট দিয়ে তৈরী তিনটে মন্দির আছে। আর আছে কয়েকটা পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তৈরী তিনটে মন্দির আছে। আর আছে কয়েকটা পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীনকালে পুরুলিয়া অঞ্চল যে পোড়া মাটির ইঁট শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা

দেখিয়েছিল এই মন্দিরগুলো তারই নির্দেশন। মন্দিরগুলোর মধ্যে দক্ষিণ দিকের মন্দিরটিই সবচেয়ে বড়। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। প্রায় ২৬ বর্গফুট স্থানের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। গর্ভগৃহ প্রায় ৯ বর্গফুট। মন্দিরটি পিরামিডের আকারে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রবেশ পথ ত্রিকোণাকার।

যেসব ইট দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরী হয়েছে তা এমনভাবে তৈরী হয়েছে যা দেখলে মনে হয় যেন মেশিন দিয়ে বানানো হয়েছে। এগুলো প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১২ ইঞ্চি চওড়া এবং মাত্র ২ ইঞ্চি পুরু। ইটগুলো বেশ পালিশ করা ব্যবহার কৈ।

তৃতীয় মন্দিরটি ৪৫ ফুটের মত উঁচু। এটি নদীর ঘাট থেকে প্রায় ১৫০ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। তৃতীয় মন্দিরটি প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছে। এই মন্দিরটি নদীর একেবারে তীরবেষ্য। আরও কয়েক বছর পরে হয়তো এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মন্দিরের ইটগুলো মনে হয় পুড়িয়ে নেওয়ার আগেই একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরী করা হয়েছিল। ইটগুলোর অলঙ্করণও মনে হয় পুড়িয়ে নেওয়ার আগেই করা হয়েছিল। মন্দিরের দেওয়ালগুলো স্বত্ত্বে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। সমস্ত অলঙ্করণগুলোই পোড়া মাটির ইট কেটে বানানো হয়েছে। এর উপর আবার পলস্তরার আস্তরণ দিয়ে অলঙ্করণগুলিকে পরিষ্কৃত করা হয়েছে। এর দেউল ত্রিগুলো এত হৃদয়গ্রাহী যে চোখ মেলে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। মন্দির ভেঙ্গে যাচ্ছে, দেওয়াল ছেঁটে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে পোড়া মাটির পোড়া হৃদয়, তবু এই সব মন্দিরগুলো সতী লক্ষ্মী রমণীর মত আজও সিঁথির সিন্দুরকে অপ্লান রেখে কংসাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। অনুল্য শিল্পকলা সমৃদ্ধ নামাবলী গায়ে দিয়ে মন্দির সুন্দরী যেন সুন্দরের পূজারী মানুষদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। মন্দিরগুলোর প্রাচীর চিত্র সবই জ্ঞানিক আকারে তৈরী হয়েছে। তাছাড়া কিছু নরনারীর মূর্তি, রাক্ষসের মুখ ও রাজহাঁসের চিত্র মন্দির গাত্রে স্থান লাভ করেছে। মন্দিরের বিস্তৃত দেওয়ালে কিছু আল্লানা জাতীয় চিত্র, কিছু সাক্ষেতক ধর্মী চিত্র চোখে পড়ে। সবথেকে বড় মন্দিরটিরও মন্তক অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে।

মন্দিরগুলোর গর্ভদেশে কিসের বিগ্রহ ছিল তা এখন জানার উপায় নেই। প্রায় শতবর্ষ আগেও বিগ্রহগুলো অপসারিত করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মিস্টার ই. টি. ডাল্টন মন্দিরগুলোকে সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির বলে বর্ণনা করেও কিছুটা বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়েছেন।

The only animals I could discern in the ornamentation were geese introduced in the scrolls : the goose is the Boeddhist emblem.  
৩৭

কিন্তু পাকবিড়রায় এমন কিছু সরাক মন্দিরের মডেল আছে যেগুলোর অলঙ্করণে রাজহাঁস দেখা যায়। তাই দেউলঘাটার মন্দিরগুলোর অলঙ্করণে রাজহাঁস আছে বলেই এগুলোকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ভাববার কোন কারণ নেই। মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন- These three Temples are all of the same type, and are no doubt correctly ascribed by the people to the srawaks.  
৩৮

এই মন্দিরগুলোকে হিন্দু শিব মন্দির বলে প্রচার করার একটা বিশেষ ধরণের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিগত শতাব্দীতে। সে সময় কোন প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারী মন্দির দেখতে এলেই স্থানীয় জনসাধারণ মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে দিতেন। এমনকি দুর্গা মূর্তিরও প্রতিষ্ঠা করা হত।

১৮৬৩-৬৪-তে মিস্টার ই. টি. ডাল্টন এই মন্দিরগুলো পরিদর্শন করেন। তখন তিনি এই সব মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখতে পাননি। তাই তিনি লিখেছেন-

The object of worship whatever they were have disappeared from the fanes...  
৩৯ এর কয়েক বছর পরে মিস্টার জে. ডি. বেগলার দেউলঘাটা পরিদর্শন করেন। তিনি এই মন্দিরের গর্ভদেশে গণেশ-কর্তিক সহ একটি দুর্গা মূর্তি দেখতে পান।  
৪০ গণেশ-কর্তিক সহ একটি ছোট আকারে চতুর্ভুজ দেবী মূর্তি দেউলঘাটায় রাখা আছে। জানি না মিস্টার বেগলার এই মূর্তি দেখেছিলেন কিনা। সম্ভবতঃ এই ধরণের মূর্তি মাটি থেকে তুলে সে সময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্থানীয় জনসাধারণ।

দেউলঘাটা পুরাক্ষেত্রের পুরাকীর্তির আর একটা দিক আছে। এটা হল এখানের ভাস্কর্য শিল্প। গণেশ-কর্তিক সহ চতুর্ভুজা যে মূর্তিটি মিস্টার বেগলার দেখেছিলেন তিনি তার কোন পরিচয় দিয়ে যান নি। মূর্তিটি সরাক শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হলেও এটি কোন হিন্দু পুরাণসম্মত দেবী মূর্তি বলেই মনে হয়। এই ধরণের দুটি মূর্তি দেউলভিড়ায় (পাড়া থানায়) রাখিত আছে। কিন্তু দেউলভিড়ার চতুর্ভুজা দেবী মূর্তির মধ্যে যে নারীসুলভ কমনীয়তা আছে দেউলঘাটার এই মূর্তির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এই মূর্তির মুখমণ্ডল পুরুষোচিত কাঠিন্যে ভরা। মহাভারতে চতুর্ভুজা দুর্গা মূর্তির কথা আছে। মহাভারতকার লিখেছেন- শবরৈঃ বর্বরেশেব পুনীন্দেশ সুপুজিতা। শবর বা কিরাত সম্প্রদায়ের এই দেবী চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণ। এই দেবীর নাম পর্ণ শবরী। তিনি মদ্য, মাংস প্রিয়া কুমারী দেবী।

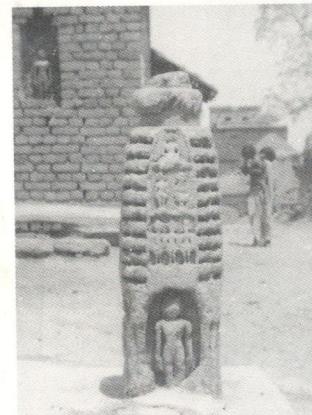
দেউলঘাটার এই অঞ্চলটা অতীতে শবর জাতির মানুষের বসবাস ছিল। তাই এখানে পর্ণ শবরীর মূর্তি থাকাটা কোন অসম্ভব ঘটনা নয়। কারণ.... Jainism declares its object to be to lead all men to salvation and to open its arms not only to the noble Aryans but also to the low born sudra and even to the alien deeply despised in India as the Mlechha.<sup>৪১</sup> কিন্তু এই মূর্তিটি কি সত্যই পর্ণ শবরীর মূর্তি? পর্ণ শবরী কুমারী দেবী। শিবের সঙ্গে তার তথনও বিয়ে হয়নি, এমত অবস্থায় এই মূর্তির দু'পাশে কার্তিক ও গণেশ থাকবে কেন? যাই হোক মূর্তিটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বহন করে এনেছে। এই তথ্যটি হল যে একাদশ শতাব্দীর আগেও দুর্গার দু'পাশে কার্তিক-গণেশকে রাখার রীতি ছিল।

পুরুলিয়ার ভাক্ষর শিল্পের সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর সূষ্ঠি হল এই দেউলঘাটাতেই প্রাপ্ত অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তিটি। এই দুর্গা মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর ভাক্ষর শিল্পাদের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। অপরাপ শিল্প সম্মত ও অনিন্দ্য সুন্দর ভঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে এই দুর্গা মূর্তি। এটি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। মূর্তির দিকে সুন্দর চালচিত্র আছে। এই অষ্টভূজা মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নেই। এর তিন দিকে সুন্দর চালচিত্র আছে। এই অষ্টভূজা মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নেই। এর বাঁ পাশের তিনটি হাত ও ডান পাশের একটি হাত ভেঙে গিয়েছে। তবু এর শিল্প শুণ এত উচ্চস্তরের যে দেবীর অঙ্গহালীর কৃতি চোখেই পড়ে না। দেবী মূর্তির স্বাঙ্গ অলঙ্করণ করা হয়েছে। এমন কি, দেবীর নিম্নাঙ্গও ঢাকা রয়েছে শুধু অলঙ্কারে। তাই দেবী নগ্ন হলেও নগ্নতা চোখে পড়ে না। দু'পাশের চালচিত্রে আছে অলঙ্কারে। তাই দেবী নগ্ন হলেও নগ্নতা চোখে পড়ে না। দু'পাশের চালচিত্রে আছে অলঙ্কারে। এছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীরও কিছু মূর্তি আছে। চালচিত্রের উপরের দিকে কিছু সাধারণ নর-নারীর মূর্তিও রয়েছে। বীণা যন্ত্র হাতে নারীর অপরাপ ভঙ্গি দেখে মুঝ্ব হতে হয়। দূরে একটি পুরুষ মূর্তি মুঝ্ব হয়ে নারীর বীণা বাদন শুনছে। চালচিত্রের ঠিক মাঝখানে দু'পাশে দুই ন্যূন্যরতা নারী অপরাপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দুই নারীর মাঝখানে একটি নক্ষা জাতীয় চিত্রের মাঝে নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দুই নারীর মাঝখানে এই চিত্রটি বৃক্ষচৈত্যও হতে পারে। ও পুরুষের মিথুন মূর্তি রয়েছে। নক্ষা জাতীয় এই চিত্রটি বৃক্ষচৈত্যও হতে পারে।

এই অসাধারণ অষ্টভূজা মূর্তিটি ন্যূন্যরতা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসুর দেবীর দুই পায়ের ঠিক মাঝখানে আছে। দেবীর ডান পদ আছে, মাথা কাটা মহিয়ের পৃষ্ঠাদেশে। প্রচলিত রীতিতে অসুর দেবীর বামপাশে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুর দেবীর একটু ডানপাশে রয়েছে। প্রচলিত দুর্গা মূর্তির প্রতিটি হাতেই কিছু না কিছু



কালভৈরব, পাকিস্তান



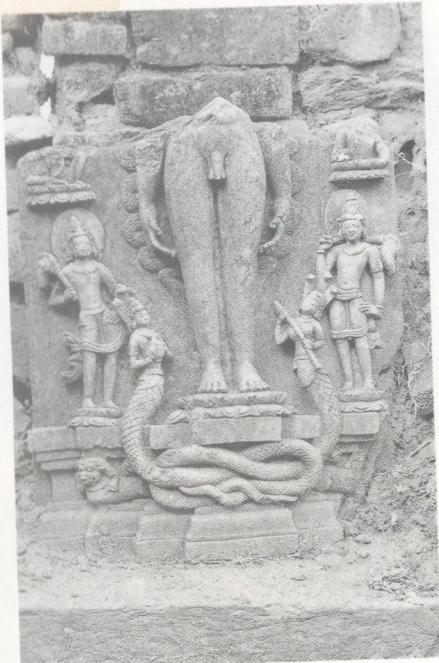
সরাক জৈন মন্দির



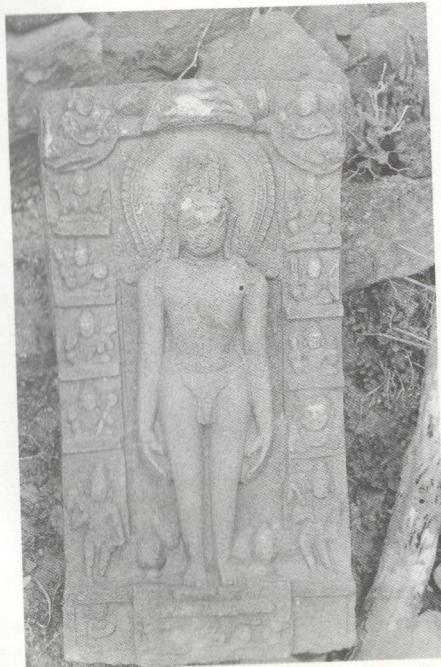
সরাক মন্দির



সরাক সংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্রস্থল



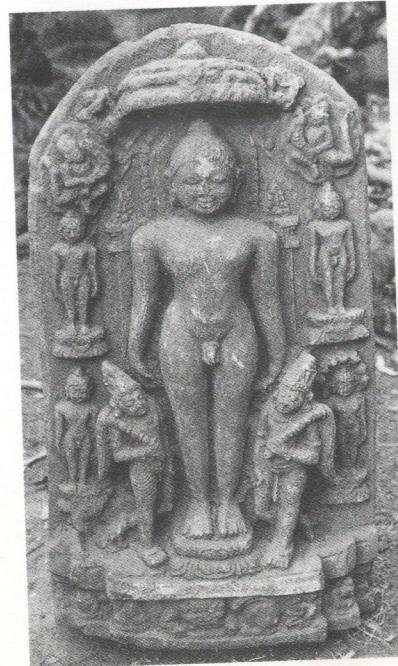
পার্শ্বনাথ, পাকবিরা, ৯ম শতাব্দী



ঝয়ভনাথ, পাকবিরা, ১০শ শতাব্দী



ঝয়ভনাথ, মানভূম



মহাবীর, পাকবিরা



শান্তিনাথ, পুরাতাত্ত্বিক পুরাকীর্তি।



দেউলবিঘা, বাঁকুড়া।

অন্তর্থাকে, কিন্তু এই দুর্গা মূর্তির সম্পূর্ণ অক্ষত চারটা হাতের মধ্যে দুটো হাতে কোনরূপ অস্ত্র নেই। অবশ্য একটা হাতে বিশেষ ধরণের সাক্ষেত্রিক চিহ্ন আছে। এই ধরণের চিহ্ন জৈন দেবী মূর্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

অসুর, মহিষ, সিংহ সৃষ্টিতে শিল্পী অপরাধ কল্পনার জাল বুনেছেন। অসুর দুর্গা প্রতিমার চাইতে আনুপাতিকভাবে খুব ছোট। অসুর মূর্তিটাকে দাঁড় করালে দেড় ফুটের বেশি হবে না। মহিষ, সিংহ প্রভৃতিগুলো আরও ছোট খেলনার মত। এতে মনে হয় কিছুটা তৎকালীন লোক সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। প্রাচীন ডোগরা লোকে সময় সময় দুর্গা প্রতিমার পায়ের কাছে এই ধরণের ছোট আকারের অসুর, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি দেখা যায়।

দেউলঘাটায় আরও কয়েকটি ছোট আকারের মূর্তি রাখা আছে। একটি ছোট গণেশ মূর্তিও আছে। দেউলঘাটাতে কয়েকটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। একটি মন্দিরের সারা গর্ভদেশ জুড়ে পাথরের তৈরী এক বিরাট আকারের গৌরীপট আছে। এই গৌরীপটের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একটি শিবলিঙ্গ আছে। আগে শিবলিঙ্গটি গৌরীপটের উপরে এমনভাবে লাগান ছিল যে তা যোরালে ঘূরত। এখন অবশ্য এই গৌরীপটটি ডাকাতেরা ভেঙে দিয়েছে। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে এই গৌরীপটের ভিতর বুঁধি কোন গুপ্তধন লুকানো আছে।

শিবলিঙ্গ, দুর্গা মূর্তি আর সরাকদের তৈরী মন্দির দেউলঘাটাকে অনেকটা মিথুন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল করে গড়ে তুলেছিল মনে হয়। সরাক প্রভাবিত পুরাক্ষেত্র হলেও এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কিছুটা ছাপ পড়েছিল। মনে হয় শিল্পীদের কোন জাত নেই। সরাক শিল্পীরা যে হাতে তীর্থকর মূর্তি তৈরী করেছেন ঠিক সেই হাতেই দুর্গা মূর্তি বানিয়েছেন। ফলে অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তির মধ্যেও হয়তো কিছুটা জৈন প্রভাব পড়ে গিয়েছে। তবে এ মূর্তি যে নিছক জৈন মূর্তি বা জৈন শাসনদেবীর মূর্তি নয় এটা বলতে কোন বাধা নেই। আর একটা কথা, পুরাতাত্ত্বিক মন্দিরগুলোতে কলিসের মন্দির শিল্পের ছাপ পড়লেও ভাস্কর্য শিল্পে উত্তিয়ার প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছে। একমাত্র পুরাতাত্ত্বিক পাড়া থানার দেউলভিড়া ছাড়া আর কোথাও ভাস্কর্য শিল্পে মিথুন সংস্কৃতি (Mithun-cult)-র ছাপ দেখা যায় না। এটা এখানে ভাস্কর্য শিল্পের উপর সরাক সংস্কৃতির বড় ধরণের একটা প্রভাব কিনা তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। এখানের অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তির চালচিত্রে যে মিথুন মূর্তির সঙ্কান পাওয়া যায় সেটাও একটা সাধারণ যুগলমূর্তি (chaste couple) এতে কোনরূপ প্রণয়ভাববারা ফুটে উঠেনি।

॥ চার ॥

## ॥ বুধপুর-পলমা-মহাদেব বেড়া ॥

কংসাবতীর কোলে আরো কিছু পুরাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বুধপুর, পলমা ও মহাদেব বেড়া উল্লেখযোগ্য।

এর আগে পাকবিড়িরার শিল্পকলা গণেশ মূর্তির আলোচনা প্রসঙ্গে কংসাবতীর কোল ঘেঁষা হাম বুধপুরের কথা এসে গিয়েছিল। বুধপুর অতীতের খুব নাম করা পুরাক্ষেত্র বলে এর বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে তাছাড়া বুধপুর পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য স্থান। আমরা আগেই বলেছি বুধপুর বা বুধপুর বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা জড়িত। পুরুলিয়া জেলার বুধপুরেই বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা মনে পড়ে যায়। জেলার অন্যান্য পুরাক্ষেত্রে কিছু কিছু বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেলেও সেখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নাম গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুধপুরে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির ছাড়াও আর চারটি বড় আকারের মন্দির ছিল। এই চারটি মন্দিরই ছিল সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।

বুধপুরের অবস্থান ভৌগোলিক দিক দিয়েও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একপাশে কংসাবতী আর অপরপাশে পরসা পাহাড় (Highest point of which forms a station of the great Trigonometrical survey, Long., 86.43 E, lat, 23.7°N) গ্রামের উত্তর পূর্বদিকে একটি বিরাট বড় আকারের পুরুর রয়েছে।

চারটি মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের চারদিকে পাথরের দেওয়ালগুলোর ভগ্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অংশ পড়ে রয়েছে। এগুলো গ্রানাইট স্টেন বলে মনে হয়। চারটি ভগ্ন মন্দিরকেই Lieutenant Beavan সরাকদের তৈরী মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন।<sup>৪২</sup> এখানে পড়ে থাকা ভগ্নশিলা খণ্ডগুলোর মধ্যেও প্রচুর অলঙ্করণ আছে। তাছাড়া স্তম্ভের উপর উপবিষ্ট সিংহ ও তীর-ধনু হাতে পুরুষ মূর্তিগুলোও ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে মনকে আকর্ষণ করে। এখানে বেশ কিছু বড় আকারের স্তম্ভ পড়ে রয়েছে। এই পাথরের স্তম্ভগুলো প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া। স্তম্ভগুলোর গায়ে খোদিত চিরগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাছাড়া মন্দিরের কোন স্থানে এত বড় আকারের স্তম্ভ লাগান ছিল তা অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই স্তম্ভগুলো পরিদর্শনের পরে এখানের মন্দিরগুলোর সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা আমাদের গড়ে উঠে। এই সব মন্দির যে খুব বড় আকারের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বুধপুর প্রাচীন সংস্কৃতির দিক দিয়েও একটি পুরাক্ষেত্র। অতীতে পুরুলিয়া অঞ্চলের সব চাইতে বড় গাজন মেলাটি অনুষ্ঠিত হত এই বুধপুর গ্রামে। দূর-দূরাত্ম থেকে হাজার হাজার নর-নারী সমবেত হত এখানের গাজন মেলায়। লোকসঙ্গীত আর লোকন্ত্যের আসর বসত এখানে। বিগত শতাব্দীতেও বুধপুরের মেলা ছিল খুব জমজমাট। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিস্টার বিভান এই মেলা দেখে মুক্ত হন।<sup>৪৩</sup> সে সময় এই মেলায় হাজার হাজার শ্যামাপাখি ও তোতাপাখির বাচ্চাকে রাজমহলের পাহাড় থেকে ধরে এনে বিক্রি করা হত। সে সময় সারা দেশের পাখি ব্যবসায়ীরা এই মেলায় আসতেন পাখির বাচ্চা কিনতে। এখানের পাখির বাচ্চা কলকাতাতেও রপ্তানি করা হত।

কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলের পাশেই আছে আনাই জামবাদ গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই একটি পুরাক্ষেত্র আছে। নাম মহাদেব বেড়া। এই পুরাক্ষেত্রটি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচনায় এখানের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পুরুলিয়া থেকে পুরাণে মানবাজার রোড ছাড়িয়ে হাঁটা পথ। মহাদেব বেড়ায় একটি প্রাচীন পাথরের মন্দির ছিল। বহুদিন আগেই ভেঙ্গে গিয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষে খনন করেই বেশ কয়েকটি তীর্থকর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ধানবাদ জেলার সরাকেরা এখানে একটি আধুনিক মন্দির নির্মাণ করেছেন। তীর্থকর মূর্তিগুলোও দেওয়ালে লাগান অবস্থায় বেশ সুরক্ষিত আছে। এখানের সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তীর্থকর পার্শ্বনাথের। উচ্চতায় এটি প্রায় সাড়ে চার ফুট। চওড়ায় দুই ফুট। মূর্তির দুই পাশে সর্পকল্যাদের দেখা যায়। মূর্তিটি বেশ নিখুঁত ও সুন্দর আছে। এখানে পার্শ্বনাথের আর একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি অবশ্য বেশ ছোট। উচ্চতায় প্রায় দু'ফুট ছয় ইঞ্চি। মূর্তিটির দু'পাশে চারজন তীর্থকর মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে।

আর একটি মূর্তি সন্তুতঃ তীর্থকর চন্দ্রপ্রভুর। চালচিত্রে অর্ধচন্দ্র দৃষ্টে তাই মনে হয়। তাছাড়া একটি ঝুঝভদ্দেবেরও মূর্তি আছে। এখানে থেকে বেশ কিছু তীর্থকর মূর্তি বাইরে পাচার হয়ে গিয়েছে।

তীর্থকর মূর্তি ছাড়া এখানে একটি কার্তিক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কার্তিক মূর্তিটি একটি ময়ুরের উপর বসে আছে। ময়ুরের মুখটি ভাঙ্গা। এই মূর্তিটি খুব একটা উন্নত পাথর দিয়ে তৈরী হয় নি। তাই এটিকে খুব পুরাতন শিল্পকলার নিদর্শন বলে মনে হয় না। একটি ছোট আকারের বিশ্বও মূর্তি ও এখানে পাওয়া গিয়েছে।

একই ধর্মসম্প্রে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তীর্থকর মূর্তির উপস্থিতি একটা বিশেষ ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেটা হল মূর্তি করে দেওয়ার ইতিহাস। অতীতে হয় তো এখানেও বেশ কিছু তীর্থকর মূর্তি রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনার কথা আমরা বোড়ামের পুরাক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সেখানে একটি কৃপের মধ্যে বহু তীর্থকর মূর্তিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ওখানে একটি ভাঙ্গা শিব মন্দিরও প্রচুর তীর্থকর মূর্তি দেখেছিলেন। মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তাঁর বোড়াম পরিদর্শনকালে লিখেছেন-

The grove Temple was dedicated to Siva : but amongst the images were several figures like those already described, that were in all probability the Jain figures belonging to the brick Temples.<sup>ss</sup>

মহাদেব বেড়ার এই ধর্মসম্প্রে হয়তো এইসব জৈন বিগ্রহগুলো সঞ্চিত ছিল। পলমা বলরামপুরের পাশে একটি গ্রাম। এই গ্রামটিও কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই পলমা গ্রামের শিব মন্দিরের দেওয়ালে হেলানো অবস্থায় একটি বড় আকারের তীর্থকর মূর্তি মস্তকবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এটির মস্তকবিহীন উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত ফুটের মত। এখানের শিব মন্দিরের ভিত্তিরে একটি ছোট আকারের ঝুঁতুনাথের মূর্তি আছে। তাছাড়া এখানের দুর্গা মন্দিরে ও একটি তীর্থকর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিগত শতাব্দীতে এখানে একটি পাথরের মন্দির দেখতে পাওয়া যেত। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের আমলে সরাকদের তৈরী প্রাচীন মন্দিরের পাথর দিয়ে এই মন্দিরটি বানানো হয়েছিল। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থকর মূর্তি মিস্টার ই. টি. ডাল্টন পরিদর্শন করেছিলেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে। কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মিস্টার জে. ডি. বেগলার যখন এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন তখন মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তব্য স্মরণীয়-

The Sculpture of Male figures standing in pedestals and under canopies with Egyptian head dress, the arms hanging down straight by their sides the hands turned in and touching the body near the knees, described by Lieutenant Money and identified by Colonel Dalton as images of the Tirthankaras of Jains are no longer before Mr. Beglar's visit in 1972.<sup>ss</sup>

মিস্টার বেগলারের পুরুলিয়া ভ্রমণ কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না তবে তাঁর পরিদর্শনকালে অনেক জৈন মূর্তি অপসারণ ও জৈন মন্দিরে শিব দুর্গার মূর্তি

স্থাপনের ঘটনা ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেউলঘাটার বোড়ামের মন্দিরের আলোচনার সময় এটা লক্ষ্য করেছি। জানিনা এটা স্থানীয় জনসাধারণের একটা বিকৃত মানসিকতা এর মধ্যে অন্য কিছু লুকিয়ে ছিল কিনা।

॥ পাঁচ ॥

॥ পাড়া ॥

গ্রামের নাম পাড়া। পুরুলিয়ার প্রাচীনতম পুরাক্ষেত্র এই পাড়া। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বছরের সরাক সংস্কৃতির স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রাম। এখানেই আছে পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম একটি পাথরের মন্দির। এই মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্প নিয়ে শুধু পুরুলিয়া নয় সারা বাংলা গর্ব করতে পারে। সারা ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে পাড়ার মন্দির অন্যতম।

পাড়াতে দুটি প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পাথরের আর অপরটি ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছে। সম্ভবতঃ আর একটি পাথরের মন্দির এখানে ছিল, যা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যে মন্দিরের পাথর দিয়ে রঘুনাথজীর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

এখানে পাথরের মন্দিরটির মধ্যে রয়েছে সরাক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নির্দশন। মন্দিরটি গাঢ় বাদামী রঙের পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। মন্দির নির্মাণের কৌশলের মধ্যে এমন একটি নতুন তথ্য রয়েছে যা জেলার আর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। এই মন্দিরের প্রতিটি পাথরের খণ্ডকে মাঝখানে ছিদ্র করে লোহার রড দিয়ে তা গেঁথে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কোন পাথরের খণ্ডই তুলে নেওয়া বেশ শক্ত। মন্দির নির্মাণে এই লোহের ব্যবহারটি গবেষকদের কাছে মন্দিরটির কাল নির্ণয় করতে কিছুটা সাহায্য করবে।

মন্দিরের পাথর এবং শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই ধরা পড়ে যে মন্দিরটি আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেরও আগে নির্মিত হয়েছিল। অনেকে তো মন্দিরটির বয়স আড়াই হাজার বছর বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে জীবন্ত প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী তাঁর বঙ্গ সংস্কৃতির কথা গ্রন্থে লিখেছেন- “এই সরাকেরাই জেলাটির প্রাচীনতম বাসিন্দা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তৈরী করা মন্দিরের ধর্মসাবশেষ আজও পাড়া, বোড়াম প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়।”<sup>ss</sup> তাঁর কথা সীকার করলে বলতে হয় যে পাড়ার এই বড় ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরটি আড়াই হাজার বছর ধরে সরাক সংস্কৃতির উদ্ধান পতনের সাক্ষীরূপে পুরুলিয়ার মাটিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মুছে গেছে গায়ের অলঙ্কার মহাকালের শ্রোতে, ক্ষয় হয়ে গিয়েছে দেহের

সর্বাঙ্গ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে গায়ের বর্ণ, তবু মহাকালের মহাসমুদ্রে আলোক স্তম্ভের মত সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের দিক নির্ণয় করে বলছে- আমি ইতিহাস হয়ে এখনও বেঁচে আছি। ভয় কি? আমার বুকের উপর পাষাণ ফলকে লেখা ইতিহাস তোমাদের পথ দেখাবে।

এককালে পাড়ার এই মন্দিরের সারা গায়ে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ছিল। মহাকালের শ্রোতে ভেসে আসতে আসতে তা মুছে গিয়েছে। এখনও কোন কোন স্থানে অলঙ্করণের সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা দেখলে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পাথর কেটে এত সুন্দর নিখুঁত ও শিল্প নেপুন্যে সমৃদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের নির্দশন যাঁরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের প্রশংসনা না করে পারা যায় না। মন্দির গাত্রের অলঙ্করণের মধ্যে নৃত্যরতা নারীর ছন্দনময় দেহ ভঙ্গিমা দেখে নয়ন ও মন সার্থক হয়ে যায়। কোন সে কালের হৃদয় হতে এসেছে এই নাচের ছন্দ কেউ তা জানে না। কিন্তু অতীতের বাক্যহীন এই নৃত্য পদছন্দের আবেদন ক্ষণিকের জন্য মনকে দুলিয়ে দেয়। অতীতের ভুলে যাওয়া বাক্যহীন কোন গানের মত মনের কোণে ঘা দেয়।

অতীতের মেয়েরা যে নৃত্য চর্চার মাধ্যমে শরীর চর্চাও করতেন এই নৃত্য ভঙ্গি যেন সে কথাও আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মনে হয় যেন নাচের তালে তালে বর্তমানকালের জিমন্যাস্ট মেয়েদের শরীর চর্চার অপূর্ব কৌশল দেখছি আমরা।

পাড়ার মন্দিরে আরও এক ধরনের নর্তকীর চির খোদিত করেছেন অতীতের ভাস্কর্য শিল্পীরা। এ ধরণের নর্তকীদের দেখলে মনে হয় অপরূপ সাজে সেজে নৃত্য পটীয়সী নারী যেন লীলায়িত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছেন নৃত্যশালার দিকে। অথবা সলজ্জ ভঙ্গিমায় নর্তকী নৃত্যশালার দুয়ারে দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছেন।

মন্দির গাত্রে আছে ক্ষয়ে যাওয়া যক্ষিণী মূর্তি। আছে অশ্বারোহী পুরুষ। আছে নৃত্যরত অবস্থায় ঘোড়া। কোন কোন স্থানে কিছু কিছু কাহিনী চিত্রও আছে। কিন্তু মূর্তিগুলো ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বলে তা ঠিক বোঝা যায় না। এছাড়া পাড়ার মন্দির গাত্রে আছে নানা ধরণের নানা আকারের নক্সা, চিত্র, ফুল। নক্সা চিত্রগুলো জটিল আকারে জ্যামিতির জ্ঞানের উপর তৈরী হয়েছে।

মন্দিরের বাইরের দিকে তিনটি কোলুঙ্গির আকারে ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই সব স্থানে ছোট আকারের তীর্থকর মূর্তি রাখা ছিল। বর্তমানে ওই সব তীর্থকর মূর্তি হ্রাসন্তরিত করা হয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলোর দুই পাশে দুটি করে নারী চামর হাতে নৃত্যরতা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া নানা আকারের নর ও নারীর মুখ এখানে ওখানে দেখা যায়। সব কিছুই ক্ষয়ে গিয়েছে।

পাড়ার মন্দিরটিই এখানের একমাত্র প্রাচীন মন্দির যার উপর কোন মানুষের কালো হাত পড়েনি। পাকবিড়রার মত পাড়াতে ধর্মান্ধ মানুষদের কোনরূপ অত্যাচার হয়নি। এই মন্দির মহাকালের প্রেতেই ক্ষয়ে গিয়েছে। মন্দিরের উপরের দিকের প্রায় সমস্ত ভাস্কর্য শিল্পকলাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে যে অংশ মাটির মধ্যে আছে সে অংশের মাটি অপসারিত করলে মন্দিরের অলঙ্করণের প্রকৃত রূপটা ধরা যেতে পারে বলে আমার ধারণা। তবে মন্দিরের বেশ কিছুটা অংশ মাটির মধ্যে থাকলেই এটা আশা করা যায়। মন্দিরটির মস্তক অংশটি ভেঙ্গে গিয়েছে। কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী এটিও রেখা দেউল।

পাড়ার এই প্রাচীনতম মন্দিরটির ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে একমাত্র পাকবিড়রার মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পের তুলনা করা যেতে পারে। তবে পাকবিড়রার মন্দিরের গাত্রালঙ্কার আজ ভূলুষ্ঠিত। তাই এর সামগ্রিক রূপটা দেখা আমাদের সন্তুষ্য নয়। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বরাকরের মন্দিরগুলো প্রায় অক্ষত আছে। কিন্তু অলঙ্করণ রীতিতে ওইসব মন্দিরের সঙ্গে পাড়ার মন্দিরের কোন মিল নেই। পাড়ার মন্দিরের অলঙ্করণ রীতির সঙ্গে উড়িষ্যার কোনারকের মন্দিরের কিছু মিল আছে। অবশ্য পাড়ার মন্দিরে কোনারকের মন্দিরের মত কোন মিথুন মূর্তি নেই। তবু অনেকে পাড়ার এই মন্দিরকে পুরুলিয়ার কোনারক বলে থাকেন।

পাড়ার মন্দিরের গাঢ় বাদামী রঙের পাথরগুলো মনে হয় বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। কারণ এই ধরণের পাথর পুরুলিয়া জেলায় পাওয়া যায় না। এগুলো বেশ শক্ত পাথর। আর শক্ত বলেই দেড় থেকে দু'হাজার বছর ধরে মহাকালের সঙ্গে লড়াই করে আজও টিকে আছে।

পাকবিড়রায় কিছু মন্দিরের মডেল পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি মন্দিরের মডেলের সঙ্গে পাড়ার মন্দিরটি প্রায় মিলে যায়। অবশ্য অলঙ্করণ রীতিটা পাড়ার মন্দিরের সম্পূর্ণ আলাদা।

পাড়ার মন্দির গাত্রে অলঙ্করণের মাঝে যে সব মূর্তি আছে সেগুলো খুব ছোট। তাই দূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না। মীচের দিকে অবশ্য কিছুটা বড় আকারের কিছু মূর্তি চোখে পড়ে। কোনারকেও এই ধরণের ছোট আকারের মূর্তি প্রচুর চোখে পড়ে। হয় তো তথনকার দিনে মন্দির গাত্রে ছোট আকারের মূর্তি গড়ারই একটা বিশেষ রীতি ছিল। আজ যদি পাড়ার মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায় থাকত তবে কোনারকের সূর্য মন্দিরের মতই এই মন্দিরটিও একটি দশনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হত।

পাড়ার এই বিখ্যাত মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় চালিশ ফুটের মত। অক্ষত থাকলে হয় তো মন্দিরটি পঁয়তালিশ ফুটের মত হত। গ্রামের মানুষের কাছে এই মন্দিরটি লক্ষ্মীর মন্দির বলে পরিচিত। প্রবেশ পথ আয়তাকার গর্ভদেশে বেশ ছোট। এতে কোন বিগ্রহ নেই।

মন্দিরটির নাকি রাজা মানসিংহের আমলে কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারের কোন নির্দশন মন্দির গাত্রে পাওয়া যায় না। অতীতে মন্দিরটির কোনৱপ সংস্কার সাধন হয়ে থাকলে এটি এমন করে ধ্বন্সের পথে নেমে যেতে না। পুরুলিয়ার কোন মন্দিরকেই আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে বা বেসরকারীভাবে কোনদিন সংরক্ষিত রাখা হয় নি।

এই মন্দিরের কয়েক মিটার পশ্চিমে পাড়ার দ্বিতীয় মন্দিরটি অবস্থিত। এটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। হয় তো হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। মন্দিরটি ইঁট দিয়ে তৈরী। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুটের মতো। এই মন্দিরের শুধু মণ্ডপের অংশই ভাস্তেনি; গণ্ডিরও বেশ কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। নির্মাণরীতিতে দেউলঘাটার ইঁটের মন্দিরগুলোর ছাপ আছে। প্রবেশ পথ ওই মন্দিরগুলোর মতোই ত্রিকোণাকার। এটিও পিরামিড তৈরীর রীতিতে তৈরী হয়েছে। তবে দেউলঘাটার মন্দিরের ইঁটগুলোর মতো এই মন্দিরের ইঁটগুলো অতটা উন্নত নয়। তাছাড়া দেউলঘাটার মন্দিরগুলোর গাত্রে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে তা পাড়ার এই মন্দিরে অনুপস্থিত। মন্দিরের গর্ভদেশে একটি ষড়ভূজা দুর্গা মূর্তি আছে। মূর্তিটি খোদিত হয়েছে একটি গোলাকার শীলাপটে। প্রসঙ্গজন্মে বলে রাখি এই ধরণের একটি দুর্গা মূর্তি ভাঙড়া গ্রামেও পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটি সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত আচৃতা মূর্তি। পাড়ার এই অচৃতা মূর্তিটি এত ক্ষয়ে গিয়েছে যে এর নাক, মুখ, চোখ কিছুই দেখা যায় না। এই মূর্তিটিই এই মন্দিরে গ্রামের লোকদের কাছে উদয়চক্রী দেবীর রূপে পুজো পাচ্ছে।

পাড়ার তৃতীয় মন্দিরটি কেবল ছিল তা আজ আর বলা যাবে না। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেই মন্দিরটি ভেঙ্গে গিয়েছে। অথবা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এ মন্দিরের পাথর দিয়েই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি আধুনিক মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি বর্তমানে রঘুনাথজীর মন্দির বলে পরিচিত।

পাড়াতে কয়েকটি তীর্থঙ্কর মূর্তি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আর দেখা যাবে না। উইসব তীর্থঙ্কর মূর্তি নাকি কাশীপুরের রাজ পরিবারের লোকেরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন। এখানে দুটি যক্ষিণী মূর্তি ছিল। যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এখানে রক্ষিনী ও বক্ষিনীর লোককথা। বর্তমানে এই দুটি যক্ষিণী মূর্তি ও আর নেই। এরা মানুষের কাছে রাক্ষসীরূপে পরিচিত হয়েও মানুষের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

পাড়াতে ভাঙা মন্দিরের কতগুলো থাম এখানে সেখানে পড়ে আছে। গ্রামের মাঝখানে এই ধরণের একটি ছোট আকারের থাম যম বলে পুজো পেয়ে থাকে।

পুরুলিয়া তথা সারা পশ্চিমবাংলার গৌরের হল পাড়ার এই পাথরের মন্দিরটি। দেড় থেকে দুঁহাজার বছর ধরে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এটি ধ্বনি পথের যাত্রী। কিন্তু হার মানে নি। আজও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে অতীত যুগের গৌরবময় ভাস্কর্য শিল্পের নির্দশন। এখনও এর বুকের উপর্যোগী হয়ে আছে এমন সব অতুলনীয়া নারী মূর্তি, আশ্বারোহী পুরুষ মূর্তি, নৃত্যরত মানুষের দেহধারী অশ্ব, যারা অতীতের নাম না জানা গান গেয়ে যায়। এদের নাচের তালে তালে যে ইতিহাসের জর্ম হয় তা পড়ে দেখার সময় আমাদের থাকে না। আমাদের অতীত ভগ্ন মন্দিরের অন্দরে কল্পনার বারে বারে কথা কয়ে যায়; সে কথা কেউ শোনে আবার কেউ শোনে না। কিন্তু তবু ওরা থামে না। মোমের বাতির মত নিজের দেহটা ক্ষয় করে করে আমাদের চোখের সামনের অন্ধকারকে অপসারিত করেই চলেছে।

॥ ছয় ॥

॥ দেউলভিড়া ॥

দেউলভিড়া পাড়া থানারই অপর একটি পুরাক্ষেত্র। পাড়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এই পুরাক্ষেত্রটি অবস্থিত। সামনেই রয়েছে হাড়াই নদী। তিনমাস ছাড়া বছরে আর কোন সময় জল থাকে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাস হাড়াই পার হয়ে দেউলভিড়ায় যেতে বেশ বেগ পেতে হয়।

পুরুলিয়া জেলার দেউলভিড়া ও র্যালিবেড়া এই দুটি পুরাক্ষেত্রে তীর্থকর মূর্তির ছড়াছড়ি থাকলেও শৈব সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বেশ কিছুটা ছাপ রয়েছে।

এর আগে আমরা দেখেছি যে মন্দির শিল্পে উড়িষ্যার কলিঙ্গরাজির প্রভাব থাকলেও উড়িষ্যার মিথুন সংস্কৃতির প্রভাব পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পে বড় বেশি পড়ে নি। তবে দেউলভিড়ায় এবং র্যালিবেড়ায় উড়িষ্যার মিথুন সংস্কৃতির (Muthuna Cult) প্রভাব বেশ কিছুটা পড়েছে বলেই মনে হয়। এমন কি খাজুরাহোর শিল্পকলার প্রভাবও এখানে পড়েছে। র্যালিবেড়া এবং দেউলভিড়া উভয় স্থানেই শৈব ও দুর্গার মিথুন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দেউলভিড়ায় প্রাপ্ত শৈব ও দুর্গার মিথুন মূর্তিতে (Heavenly Amorous Couple) শৈবের বাম জঙ্ঘাতে পার্বতী বসে আছেন। শৈব ও পার্বতীর গায়ে অলঙ্কার থাকলেও নগতা খুব বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। শৈবের বাম হাত পার্বতীর পিঠের উপর দিয়ে

তার বাম স্তনে এসে ঠেকেছে। শিবের হাতের বেশ কয়েকটা আঙুলই রয়েছে পার্বতীর স্তনের উপরে। ঠিক এই ধরণের মিথুন মূর্তিতে শিব ও দুর্গাকে দেখা যায় ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরে। খাজুরাহোর পার্শ্বনাথের মন্দিরেও শিব পার্বতীর এই ধরণের মিথুন মূর্তি দেখা যায়। এছাড়া এই ধরণের মিথুন মূর্তি প্রত্নতত্ত্ব প্রদর্শনশালা খিচিৎ-এ দেখা যায়। খাজুরাহোর শিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি ১৯৫০ থেকে ১০০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। আর ভুবনেশ্বরের শিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল ৭৫০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়। সুতরাং দেউলভিড্যার পুরাক্ষেত্রের মূর্তি নির্মাণের কাল সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হবে।

পুরাণে বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণয় লীলার বর্ণনা থাকলেও ভাস্কর্য শিল্পে কোন দেব-দেবীরই মিথুন মূর্তি (couple-in-coitus) বড় একটা দেখা যায় না। যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা করা হয়েছে, পুরাণে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার দেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন সেখানে ভাস্কর্য শিল্পে কোথাও রাধাকৃষ্ণের এমন মিথুন চিত্র নেই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কোন অঙ্গে হাত দিয়ে বসে আছেন। ভাস্কর্য শিল্পে শিবই একমাত্র দেবতা যাঁকে দেখা যাবে কাম-উন্মত্ত অবস্থায়। দেউলভিড্যায় হঠাতে এই ধরণের শিব পার্বতীর মূর্তি আবিষ্কার হওয়াতে পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের একটা নতুন চিঞ্চার উদয় হয়েছে। দেউলভিড্যার এই মিথুন মূর্তি সরাক প্রভাবিত মূর্তি একথা বলা যাবে না। তাই পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের জন্মদাতা একমাত্র সরাক সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুলিয়া এই কথা বলারও কোন যুক্তি নেই। তবে দেউলভিড্যা পুরাক্ষেত্রে বেশ কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এখানের পুরাক্ষেত্রে সরাকদের প্রভাব ছিল না এমন কথাও বলা যাবে না। সরাক শিল্পীরা হিন্দু দেব-দেবী মূর্তি তৈরী করতে পারেন। হয় তো বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রে তা করেছেন। কিন্তু এই ধরণের মিথুন মূর্তি আর কোন পুরাক্ষেত্রে পাওয়া যায় না কেন সেটা অশ্যাই ভাববার কথা। এই কারণে অনেকে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির ইতিহাসে তিনটি যুগের কথা বলেন। প্রথম সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন যুগ, দ্বিতীয় বৌদ্ধ যুগ এবং তৃতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ যুগ। কিন্তু এইভাবে যুগ ভাগ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা বলা শক্ত। অনেক জৈন শিল্পকলাই তৈরী হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। ওই সময়ে আবার হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলাও তৈরী হয়েছে।

দেউলভিড্যায় দুটো চতুর্ভুজা দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর এক হাতে শিবলিঙ্গ রয়েছে। অন্য হাতে কমগুলু। দুই পাশে গশেশ ও কার্তিক। দেউলঘাটাতে প্রাপ্ত (বোঢ়াম) চতুর্ভুজ দুর্গা মূর্তির সঙ্গে এই দুটো মূর্তির বেশ মিল আছে।

তবে বোঢ়ামের দেউলঘাটাতে প্রাপ্ত চতুর্ভুজা মূর্তিগুলো এত সুন্দর নয়। ওই মূর্তিগুলোর নারী সুলভ কমনীয়তা নেই। আর এখানে প্রাপ্ত এই চতুর্ভুজা নারীরা অনিন্দ সুন্দরী। দেখলে মনে হয় শিব লোকের সুন্দরী পার্বতী যেন শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে নাচতে নাচতে কেলাসে যাত্রা করেছেন। এই দুটো মূর্তির মধ্যেও জৈন শিল্পকলার ছাপ বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য আকারের দিক দিয়ে চতুর্ভুজা জৈন সরস্বতীর মূর্তির সঙ্গে এগুলোর বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি প্রায় একই ধরণের।

এখন প্রশ্ন, দেউলভিড্যার এই শিব পার্বতীর মিথুন মূর্তির (orgiastic couple) মধ্যে কি কোন বৌদ্ধ প্রভাব আছে? সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকেই চীন দেশের বৌদ্ধ ধর্মে বামাচার অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের রাজা ভাস্কর বর্মন চীন দেশের বামাচারী বৌদ্ধদের একটি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বামাচার প্রচারের ক্ষেত্রে তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া চীন পরিবারজক হ্যান চুয়াং হয় তো চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচার এদেশের মাটিতে এনে থাকতে পারেন। আমাদের দেশে যখন সর্বপ্রথম মিথুন সংস্কৃতি (Mithun cult) ভাস্কর্য শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, তখন চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচার এদেশের মাটিতে আসন পেতে বেশ শক্ত করেই বসেছিল।

তাছাড়া দেব-দেবীর মিথুন চিত্র (Heavenly orgiastic couple) প্রাচীনকাল থেকেই ত্বরিত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এরও প্রভাব পড়েছে ভারতীয় শিল্পীদের উপর। অতীতের ভারতীয় বৌদ্ধরাও এই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার শিকারে পরিগত হয়েছিল। এর অনিবার্য ফসলস্বরূপ আদিবুদ্ধ কল্যাণ গৌরীদেবীর সঙ্গে সদাশিবের বিবাহের মতো ঘটনা এসে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়। আদ্যাশক্তি চাণ্ডিকাই হলেন আদিবুদ্ধ কল্যাণ। এককালে কান্যকুজের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন চীন পরিবারজক হ্যান চুয়াংয়ের সম্বর্ধনার জন্য গাজন উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। সদাশিবের সঙ্গে আদিবুদ্ধ কল্যাণ পার্বতীর বিবাহের পর সদাশিব পার্বতীকে বামে বসিয়ে গাজনে নেমেছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধ বামাচারীদের প্রভাবে সদাশিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তির (orgiastic couple) সৃষ্টি হতে পারে। ইতিপূর্বে ভাস্কর্য শিল্পে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের মিথুন মূর্তিতে চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচারের প্রভাব স্থাকার করে নিয়েছেন। তাই দেউলভিড্যার এই শিব ও দুর্গার মিথুন মূর্তিটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সদাশিব ও পার্বতীদেবীর প্রভাবে তৈরী হওয়াটা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। আর যদি এই শিব-পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি শৈব প্রভাবেই তৈরী হয়ে থাকে তবু বলা যায় যে সেই শৈব ধর্মের ক্রম বিকাশের পথে বৌদ্ধ প্রভাব নেই। এমন কথা বলা যায় না।

দেউলভিড়া পুরাক্ষেত্রে প্রচুর শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। শিবলিঙ্গগুলো সব নতুন। এগুলো কোনদিন পূজো করা হয়নি। অবশ্য বেশ কিছু শিবলিঙ্গ ফেটে গিয়েছে। এখানের পুরাক্ষেত্রে খনন কাজ চালালে আরও কিছু মূর্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। শিবলিঙ্গগুলোর পাথর অবশ্য খুব একটা ভাল নয়। এগুলো এই অঞ্চলের বেলে পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু পুরাক্ষেত্রে এই ধরণের বেলে পাথরে তৈরী মূর্তি ও পাওয়া অঞ্চলে বেশ কিছু পুরাক্ষেত্রে এই ধরণের বেলে পাথরে তৈরী মূর্তি ও পাওয়া গিয়েছে। বিহার, বাংলার সীমান্ত অঞ্চল বেলুঝা অঞ্চলে বেলে পাথরে তৈরী বহু শিবলিঙ্গ দেখা যায়। তাছাড়া সুর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বহু অঞ্চলে এই জাতীয় পাথরে তৈরী তীর্থক্ষেত্র মূর্তি দেখা যায়। পাথরে তৈরী তীর্থক্ষেত্র মূর্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে।

॥ সাত ॥

॥ ছড়া ॥

পুরুলিয়া থেকে চার মাইল উত্তরপূর্বে ছড়া গ্রাম। সমস্ত গ্রামটি একটি নীচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অবশ্য দূর থেকে এই পাহাড় দেখা যাবে না। তবে পাহাড়ের গেলেই দেখা যাবে গ্রামের সমস্ত ঘর-বাড়িগুলোই পাহাড়ের শক্ত পাথরের গ্রামে গেলেই দেখা যায়। ১৯৩১ সালে গ্রামের লোক সংখ্যা ছিল ১৫৩২ জন। বর্তমানে তা প্রায় চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই ছড়ার বুকে লুকিয়ে আছে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির এক গৌরবময় ইতিহাস। এর মাটিতে আছে প্রাচীনকালের বহু ভাস্কর্য শিল্পের নির্দর্শন। ছড়া এককালে সরাক সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। এর পাশেই রয়েছে ঝাঁপড়া, পাড়া, কেলাহু, জবড়ার প্রভৃতি সরাক প্রভাবিত গ্রামগুলো।

এখানে সরাকেরা সাতটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। মন্দির আকারে অবশ্য খুব বড় নয়। গ্রানাইট পাথর দিয়ে এগুলো তৈরী হয়েছিল। এগুলো সবই কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী রেখা দেউল। এই মন্দিরগুলো পাঁচ থেকে নয় ফুট লম্বা এবং দুই থেকে আড়াই ফুট চওড়া বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। দুইটি পাথরের থেকে আড়াই ফুট চওড়া বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। এগুলো স্টেন মিলস্টেনে সিমেন্ট জাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয়নি। এগুলো স্টেন কার্ণেলীয়ার পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছিল। উচ্চতায় মন্দিরগুলো মস্তকবিহীন অবস্থায় ত্রিশ ফুটের মতো। মস্তক থাকলে হয়তো আরও পাঁচ ফুট বাঢ়ত।

ছড়ার এই ধরণের সাতটি মন্দিরের মধ্যে বর্তমানে মাত্র একটি মন্দির অবহেলায় অনাদরে পরিত্যক্ত বাড়ির মতো টিকে আছে। এটা এখন ভিক্ষাজীবী মানুষ আর রাস্তার কুকুরের আবাসস্থল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেও আরও একটি মন্দির ছিল। কিন্তু সেটি বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরের বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ডগুলো পড়ে আছে গ্রামের এখানে সেখানে। এইসব মূল্যবান পাথরের মন্দিরগুলো মহাকালের কালো হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হয়তো আরও কয়েকটা শতাব্দী টিকে থাকতে পারত, কিন্তু ধর্মীয় বিকার গ্রহ হয়তো তাই লোভী মানুষের নিষ্ঠুর হাতের আক্রমণ এরা সহ করতে পারেনি। তাই মন্দিরগুলোর মূল্যবান পাথরগুলো বর্তমানে এখানের বড় বড় বাড়িগুলোর দেওয়াল চাপা পড়ে নীরবে নিষ্ঠুরে অশ্রু বিসর্জন করছে। ছড়ার গ্রামের বড় মানুষদের এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে এইসব মন্দিরের মূল্যবান পাথর লাগানো না হয়েছে। শুধুমাত্র ছড়ার গ্রামের মানুষই নয়; অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও মন্দির ভেঙ্গে পাথর ও বিগ্রহ নিয়ে চলে গিয়েছে। এটা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত বড় ধরণের অবক্ষয় তা কল্পনা করা যায় না।

এখানে বড় বড় জৈন বিগ্রহগুলো এখন কোথায় আছে তা কেউ জানেন। পুরুরে, নদীতে, জঙ্গলে, কুরোতে আর কবরের মাঝে কত বিগ্রহ মানব চক্ষুর অস্তরালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখেন নি।

বড় বড় বিগ্রহগুলোর কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছেট আকারের শতাধিক বিগ্রহ ছিমিভূম অবস্থায় এখানের মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কিছু কিছু শিব মন্দিরে, বাসন্তী মন্দিরে, দুর্গা মন্দিরে ও ধর্ম ঠাকুরের মেলায় স্থান লাভ করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

ছড়ার মহাবীর শিব মন্দিরে প্রবেশ করে মহাদেব হয়েছেন। শিবের সঙ্গে নিত্য পূজা চলছে মহাবীরের। কোন কোন শিব মন্দিরে আবার তিনি শিবলিঙ্গের ঠিক পাশেই অবস্থান করছেন। মন্দিরগুলো ভেঙ্গে যখন গ্রামের লোকেরা মূল্যবান পাথরগুলো বাড়ি তৈরীর জন্য নিয়ে যায় তখন বিগ্রহগুলো স্থান পায় শিব মন্দিরে। সময় সময় তীর্থক্ষেত্র মূর্তিগুলো দিগন্বর শিবরূপে প্রামাণ্যদের শ্রান্কাও কেড়ে নিয়েছে। গ্রামের অনেকের ধারণা আবার এইসব বিগ্রহ বিশ্বকর্মার তৈরী। শিব ঠাকুর এখানে বাঘছাল খুলে দিগন্বর হয়েছেন। ছড়ার বিশ্বকর্মার তৈরী। শিব ঠাকুর এখানে বাঘছাল খুলে দিগন্বর হয়েছেন। ছড়ার তবে বাসন্তী পূজার সময় ফুল, বেলপাতা থেকে এটি ও বঞ্চিত হয় না। ছড়ার ধর্মমেলার পাশে একটি ঘরে বেশ কিছু তীর্থক্ষেত্র মূর্তির কাটা মুণ্ড রাখা আছে। এগুলো গ্রামের লোকের কাছে শিব মুণ্ড। প্রতিদিন এগুলো ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করা হয়। মহাবীরের একটি পদ্মাসন বর্তমানে ধর্মঠাকুর রূপে পূজো পাচ্ছে। তার পাশেই আছে চারটি মন্দিরের মডেল (Miniature Temple)। বেশ শক্ত পাথর দিয়ে এগুলো তৈরী হয়েছে এবং এখনও অক্ষত আছে। এই মিনি মন্দিরগুলো একটি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। এগুলো প্রায়

দু'ফুট উঁচু এবং ছয় থেকে আট ইঞ্চি চওড়া। এই ধরণের একটি মিনি মন্দির বরাহভূম পরগনার পবনপুরে পাওয়া গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কোনসময় এই মিনি মন্দিরটি ভারতীয় মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বড় বড় তীর্থকর মূর্তিগুলো কিভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং এই ভাঙ্গা বিগ্রহগুলোকে শিব মন্দিরে কবর দেওয়া হয়েছে তার একটা বড় আকারের নির্দশন পাওয়া যাবে লধুড়কা গ্রামের পাশে একটি শিব মন্দিরে। প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা বিগ্রহগুলোকে ভারী লোহার ঘন্টা দিয়ে মাঝখানে ভঙ্গা হয়েছে। এই ধরণের চার পাঁচটি বিগ্রহের নীচের দিকটা পড়ে রয়েছে এই শিব মন্দিরে। পুরুলিয়া থেকে কাশীপুর যাওয়ার বড় রাস্তার মধ্যেই পাওয়া যাবে লধুড়কা গ্রাম। এই গ্রামেও একটি সরাক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। এখানেও একটি ক্ষয় হয়ে যাওয়া শিলাপটে খেজুর গাছের নীচে তীর্থকরের মাতা ও পিতাকে দেখা যাবে।

ভাঙ্গাচোরা বেশ কিছু সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মূর্তি পড়ে আছে স্পষ্টপৃকৃত অবস্থায় নাটীর স্থানে। এখানের সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তিটি সন্তুষ্টবৎঃ আদিনাথ বা খ্ববন্ধনাথের। খোদিত পাথরটির উচ্চতা প্রায় ৫৫ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ২৬ ইঞ্চি। মূল মূর্তিটি একটি পদাফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটির দুইপাশে চৰিশজন তীর্থকরের মূর্তি পদ্মের উপর দণ্ডযামান। এখানের দ্বিতীয় মূর্তিটি ৪৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৩ ইঞ্চি চওড়া পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছে। মূল জৈন মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৩০ ইঞ্চি। এইসব মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে অতুলনীয়। ছড়িরার শিল্পকলার মতো এগুলোও দিনে দিনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

॥ আট ॥

॥ তেলকুপী ॥

পুরুলিয়া জেলার মধ্যে যেসব পুরাক্ষেত্রে সরাক শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির একটা মিশ্রনথ দেখা যায় তেলকুপী সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতীতে এখানে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সরাকদের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছিল এখানের পুণ্যভূমিতে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় এখানে একটা মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা টানা হয়েছিল মনে হয়। তেলকুপীতে যেমন প্রচুর পরিমাণে তীর্থকর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ঠিক তেমনি পৌরাণিক বহু দেব-দেবীর বিগ্রহও পাওয়া গিয়েছে। এই সব দেব-দেবীর বিগ্রহ নির্মাণের কৌশলের রীতিতে পাল শিল্পকলার ছাপ দেখা যায়।

মধ্যযুগে তেলকুপীর খুব নামডাক ছিল। এর প্রাচীন নাম তেলকাম্পী। কথিত আছে পাতকুম রাজ্যের জমিদার বিক্রমাদিত্য এখানে এসে গায়ে তেল মাখতেন। তাই গ্রামের নাম তেলকুপী।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পুরুলিয়া অঞ্চলের আরও দুটি পুরাক্ষেত্রের নাম জড়িয়ে আছে। একটি পবনপুর আর অপরটি দালমি। পবনপুর বরাহভূমের পাশে অবস্থিত। এখানের ভুলা গ্রামে প্রাচীন মন্দির ও কিছু প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে একটি বিরাট বড় পুকুর আছে। এখান থেকে একটি মন্দিরের মডেল বিগত শতাব্দীতে ভারতীয় মিউজিয়ামে পাঠানো হয়েছে। এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও কিছু নির্দশন পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় পুরাক্ষেত্রটি হল দালমি। দালমি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটা তেলকুপী গ্রাম থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বিক্রমাদিত্যের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বিক্রমাদিত্যের ফোর্ট (Vikramaditya's fort) নামে বিরাট একটা ধ্বংসস্তুপ পড়ে আছে। এখানেও একটা বড় পুকুর আছে। নামটা অবশ্য ছোট পুকুর। এছাড়া এখানে একটা ইঁটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মন্দিরটি অবশ্যই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন মন্দির।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই দালমি থেকে প্রায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে তেলকুপীতে আসতেন দামোদরে স্থান করতে। সেকালে বারংগী তিথিতে দামোদরে স্থান করাটা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হত। তাই কিছুদিন আগেও হাজার হাজার মানুষ বারংগীর তিথিতে এখানে এসে দামোদরে স্থান করতেন। তখন তেলকুপীতে বসত পুরুলিয়া অঞ্চলের বিখ্যাত বারংগীর মেলা। গাজন মেলা হিসেবে এই মেলার স্থান ছিল দ্বিতীয়। আর বৃহত্তম মেলাটি বসত বুধপুরে। অবশ্য এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বারংগীর মেলার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

তেলকুপীতে একই আকারের বহু মন্দির তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে মাত্র তিনটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনটি মন্দিরই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সবচেয়ে বড় মন্দিরটি দামোদরের একেবারে কোলর্হেঁয়ে অবস্থিত। এই মন্দিরে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মন্দিরটি ভেঙ্গে গিয়েছে। এর ধ্বংসস্তুপের মাঝেই আর একটি মন্দির তৈরী করা হয়েছে। এই নতুন মন্দিরটির আকার অনেকটা শিব মন্দিরের মতো। সন্তুষ্টবৎঃ মূল মন্দিরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর মন্দিরের বিখ্যাত বিগ্রহ ভৈরবনাথকে নতুন মন্দিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এই মন্দিরটির বক্ষদেশ পর্যন্ত দামোদরের পলিমাটির তলায় ডুবে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে পুরুলিয়ার জাগ্রত দেবতা ভৈরবনাথের বিগ্রহ। তেলকুপীর এই বিখ্যাত ভৈরবনাথের বিগ্রহটি আসলে কিন্তু তীর্থকর মহাবীরের মূর্তি। ইনি অতীতে বিরুপ নামে পূজো পেতেন। পরবর্তীকালে এই অহিংসা ধর্মের সাথক পুরুষ হিন্দু ব্রাহ্মণ

সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভৈরবনাথে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা পাকবিড়িরায় দেখেছি সাড়ে সাত ফুট লম্বা মহান তীর্থকর মহাবীরকে মহাকালে ভৈরবের রূপান্তরিত হতে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিতে মহাকাল ভৈরবের রূপটা কি তা আমি জানি না। তবে তীর্থকরদের দিগন্ধরূপ ভৈরবনাথের একটা আকর্ষণীয় রূপ কল্পনা করে নিতে এই অঞ্চলের জনগণকে সাহায্য করেছে। তেলকুপীর ভৈরবনাথের বিগ্রহ যে চৰ্তুবিশ্ব তীর্থকর মহাবীরের মূর্তি সেকথা মিস্টার ই. টি. ডাপ্টনও স্থীকার করেছেন-

There is another of these Temples at Telkupi on the Damodar and there is there an image still worshipped by the people in the neighbourhood which they call Birup. ....it is probably intended for the 24th Tirthankara Vira or Mahavira, last Jain.<sup>৪১</sup>

মন্দিরের বিগ্রহটি আমি ছোটবেলায় নিজেও দেখেছি। মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম তেলকুপীর বারগীর জেলায়। বিগ্রহ দেখে জানতে চেয়েছিলাম- ঠাকুর কাপড় পরে না কেন? সেদিন মায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি।

মন্দিরের বিগ্রহ তীর্থকর মূর্তি হলেও মূল মন্দিরের নির্মাণ রীতিতে ও শিলাখণ্ডের অলঙ্করণে একটা মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ ছিল। কারণ তেলকুপীর মন্দিরটি কোন রাজা মহারাজাদের দ্বারা তৈরী হয় নি। এটা কোন সাধক পুরুষের দ্বারাও নির্মিত হয় নি। দেউলঘাটার মতো তেলকুপী সাধক পুরুষদের সাধন ভজনের স্থান নয়। এই স্থানটা গভীরভাবে যুক্ত ছিল দেশের অর্থনীতির সঙ্গে। মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের দ্বারা। আর এই কারণেই রাজা বিক্রমাদিত্যের এই অঞ্চলে ঘন ঘন আগমন ঘটত। তবু মন্দির নির্মাণে সরাক শিল্পীদের হাতের ছাপ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। অনেকে মন্তব্য করেছেন মন্দিরটি ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির হলেও অংশতঃ সরাক ভাস্তৰ্য শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত। (Mainly Brahmanical but partly Jains).

কিছুটা কিংবদ্ধীর আকারে হলেও তেলকুপীর একটা ইতিহাস আছে। এককালে এই গ্রাম ছিল এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিল্পনগরী। মিস্টার ডাপ্টন নাকি একসময় এই শিল্পনগরীর তোরণদ্বার আবিক্ষার করেছিলেন। এককালে তাত্ত্বিকপ্ত থেকে ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর হয়ে একটা রাস্তা তেলকুপীতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য এই রাস্তা দামোদর পার হয়ে পাটলিপুত্রে দিকে চলে গিয়েছিল। তাত্ত্বিকপ্ত থেকে শিল্পপতিরা এই রাস্তা দিয়েই পাটলিপুত্রে

যেতেন। পথে পড়ত তেলকুপী নগর। তখনকার দিনে তেলকুপী ছিল এক বিখ্যাত সরাইখানা। এ প্রসঙ্গে মিস্টার কুপল্যান্ড লিখেছেন-

According to tradition, the temples at Telkupi are ascribed to merchants and not to Raja or holyman and the inference is that a large trading settlement sprung upto this point where the Damodar River would present at any rate in rainy seasons, a very considerable obstacle to the Travellers and Merchants.<sup>৪২</sup>

তেলকুপীর এই ইতিহাসের প্রমাণস্বরূপ মন্দিরের ভাস্তৰ্য শিল্প ছাড়াও বেশ কিছু পৌরাণিক দেব-দেবীর বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এই সব নির্দশন বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল। এই সব মূর্তিগুলোর মধ্যে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পার্বতী, দুর্গা, মহিষাসুর, কামদেব, রতি, গণেশ ও নৃসিংহ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিগুলো আমি নিজের চোখেও ছোটবেলায় দেখেছি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার দেশের দুর্ভাগ্য এই ক্ষুদ্র রচনার সঙ্গে সেগুলোর কোন ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারলাম না। কারণ এইসব অসাধারণ শিল্পকলার নির্দশনগুলো সবই আজ দামোদরের পলিমাটিতে চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে ভৈরবনাথরূপী মহান তীর্থকর মূর্তিটিও। পাঁচেত ডাম যখন বাঁধা হল তখন ডুবে গেল তেলকুপী গ্রাম। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অতীতের শিল্প নগরীর শেষ স্মৃতি। সেদিন কেউ চিন্তা করল না অমূল্য শিল্পকলার কথা। কেউ ওগুলো সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করল না। কেবল মাত্র পাশের গ্রামের গুরুতরি লোকেরা একটা হাঙ্কা আকারের বিষ্ণুমূর্তি ও কিছু তীর্থকরমূর্তি তেলকুপী থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। এই বিষ্ণু মূর্তিটিই বর্তমানে তেলকুপীর সর্বশেষ শিল্পকলার নির্দশন।

গুরুত্বিতে রাখা এই বিষ্ণুমূর্তিটির শিল্পরীতি পর্যালোচনা করলে এখানকার শিল্প সংস্কৃতির কিছুটা স্বরূপ আমরা পেতে পারি। বিষ্ণুমূর্তিটি চার ফুট ছয় ইঞ্চির মত লম্বা। দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। সম্ভবতঃ এই মূর্তি পাল আমলে অর্থাৎ দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর কোন সময় তৈরী হয়েছিল। এই ধরণের একটি বিষ্ণুমূর্তি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের রাখা আছে। যাদুঘরের মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। অবশ্য এই মূর্তির সঙ্গে তেলকুপীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির মন্তক আবরণ অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানকার বিষ্ণু মূর্তিটির মন্তক আবরণ তৈরী হয়েছে জৈন শিল্পরীতিতে। পাকবিড়িরায় প্রাপ্ত জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত জৈন শাসন দেব-দেবীদের মন্তক আবরণ (Head dress)

অংশের সঙ্গে এই মূর্তির মন্তক আবরণে কিছু মিল ধরা পড়ে। জানি না এটা কোন জৈন প্রভব কি না।

তেলকুপীর এই বিষ্ণু মূর্তিটি যে শিল্প রীতিতে তৈরী হয়েছে সেই শিল্প রীতিতেই তৈরী হয়েছে একটি আকর্ষণীয় পুরুষ মূর্তি। এই মূর্তির দেবী দুর্গার মতো দশটি হাত আছে। মূর্তির দু'পাশে দুটি যক্ষিণী মূর্তিও আছে। এই দশভূজ দেবতার কি পরিচয় আমার জানা নেই। তবে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে মূর্তিটি বাসুদেবরাপে পূজো পাচ্ছে। মূর্তিটি দেখা যাবে রঘুনাথপুরের এক মাইল উত্তরে বুন্দলা গ্রামের এক পুরাক্ষেত্রে। এখানে এক বিরাট আকারের গৌরীপটু সহ শিবলিঙ্গ আছে। আর আছে একটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সন্তুষ্টঃ এই মূর্তিটি ও একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। সর্পছত্রের নীচে দশভূজ পুরুষ মূর্তি পুরালিয়ার আর কোন পুরাক্ষেত্রে দেখা যায় না।

তেলকুপীর পাশে একটি গাছের তলায় একটি নারী মূর্তি পড়ে আছে। এই দেবী মূর্তিটি পার্বতী মূর্তি রূপে গ্রামের মানুষদের কাছে পূজো পাচ্ছে। মূর্তিটির দু'পাশে কিছু অস্তুত মানুষের মূর্তিও খোদিত আছে। হস্তীমুখ মানব এবং অশ্বমুখ মানবের কথা আমরা মঙ্গলকাব্যে পড়েছি। এই নারী মূর্তির ডান পাশের উপরে একজন হস্তীমুখ মানব ও একজন অশ্বমুখ মানব মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নেই। নীচের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে। দেবী মূর্তির মুখটাও ভেঙ্গে গিয়েছে। শিল্পরীতিও খুব একটা উন্নত ধরণের নয়। বেলে পাথরে খোদাই করা মূর্তিটি জানি না হিন্দু না জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।

তেলকুপীর শিল্পকলায় যতই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব থাক এর প্রাচীন রূপটি যে জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তার প্রমাণ বহু তীর্থকর মূর্তি ও মন্দিরগুলোতে পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি এখানে তিনটি মন্দির এখনও টিকে আছে। একটি মন্দিরে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ থাকলেও বাকি দুটো মন্দির পুরোপুরিভাবেই জৈন মন্দির। বরাকরের মন্দির নির্মাণের শিল্পরীতিতে তৈরী এগুলো রেখা দেউল।

বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এখানে একটি বড় আকারের গণেশ মূর্তি দেখেছিলেন। গণেশ মূর্তিটি কালো চকচকে পাথরে তৈরী হয়েছিল। অবশ্য এটিও বর্তমানে আর নেই। ভৈরবনাথের মন্দিরের ভাস্তোরা শিল্পাখণ্ডে কিছু ছেট আকারের গণেশ মূর্তি দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ভগ্ন শিল্পাখণ্ডে এমন কিছু পুরুষ ও নারী মূর্তি রয়েছে যা দেখলে লোকশিল্পকলার নির্দর্শন বলে মনে হয়। এগুলো হঠাৎ ঢেকে পড়লে পুরীর জগন্নাথদেবের অসমাপ্ত রূপের কথা বা ধ্যানমং তীর্থকরদের কথা মনে পড়ে যায়।

তেলকুপী এখন মৃত নগরী। তেলকুপী এখন সম্পূর্ণভাবেই ইতিহাস। স্মৃতিটুকু পড়ে আছে শুধু। আমাদের উত্তর পুরুষেরা আর তেলকুপী নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাবে না। তেলকুপীর ভৈরবনাথের শেষ আরতির শিখা নিভে গিয়েছে দামোদর নদী পরিকল্পনার অস্তর্গত পাঁচেত বাঁধের শেষ লগ্নে। দামোদর নদী পরিকল্পনার অস্তর্গত পাঁচেত বাঁধের জলের তলায় যেন দেশের অম্বুল সম্পদ স্বরূপ বেশ কিছু প্রাচীন শিল্পকলা হারিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনি কংসাবতী নদী পরিকল্পনায় কংসাবতীর বাঁধের জলেও বহু গণেশ মূর্তি নাকি ডুবে গিয়েছে। পাকবিড়ারা পরিদর্শনকালে বুধপুর গ্রামের লোকদের মুখে এই কথাটা শুনেছিলাম। আমরা আমাদের দেশের পুরাকীর্তিগুলোকে এমনভাবে নষ্ট হবার সুযোগ করে দিই যা অন্য কোন দেশের মানুষ ভাবতেই পারে না।

তেলকুপী আর পাকবিড়ারা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করলেই একটা বিষয় আমাদের মনকে বড় বেশি আকর্ষণ করে। সেটা হল এই অঞ্চলের ভৈরব সংস্কৃতি। এখানে যে ভৈরব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছেন তীর্থকর মহাবীর। তাই ভৈরব শব্দটি এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার জাত না সরাক সংস্কৃতি এর জন্মদাতা তা ভাববার বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এখানের ভৈরব সংস্কৃতিটি বাভীরাম শব্দ থেকে এসেছে। আর এই ভৈরব সংস্কৃতিটি (Vira Cult) এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সংস্কৃতি। এই কারণে অনেকে পাকবিড়ার মহান তীর্থকর মূর্তির বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে কুপল্যাণ্ডের মন্তব্য মূল্যবান- তিনি ই. টি. ডাল্টনের কথার উদ্ভৃতি দিয়ে লিখেছেন He (Mr. Dalton) placed them in the district as far back as 500 or 600 years before Christ indentifying the colossal image now worshipped at Pakbirra under the name of Vira the 24th Tirthankara.

তাই এখানের ভৈরব সংস্কৃতিটা জৈনধর্ম জাত এবং জৈনধর্ম থেকে আগত বলা যেতে পারে। এই ভৈরব সংস্কৃতি এখানের শিব সংস্কৃতিকেও পরিপূর্ণ করেছে। পুরালিয়া অঞ্চলে তিনজন শিব স্থানীয় দেবতার খুব বেশি নামডাক আছে। এই তিনজন হলেন- তেলকুপীর ভৈরবনাথ, আনাড়ার বাণেশ্বর, আর তালাজুড়ির বর্ণেশ্বর।

॥ নয় ॥

॥ চেলিয়ামা ॥

সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন ভাস্তোর শিল্প সারা পুরালিয়াতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনুসন্ধান করলে প্রায় প্রতিটি প্রাচীন গ্রামেই সেকালের সরাক সংস্কৃতির নির্দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। দামোদর মন্দির তীর্থবৃত্তী অঞ্চল

চেলিয়ামাতেও এককালে গড়ে উঠেছিল সরাক সংস্কৃতির এক বিরাট পুরাক্ষেত্র। তেলকূপীর শিল্প সংস্কৃতির সুবর্ণ যুগের সঙ্গে যুক্ত ছিল চেলিয়ামার সরাক সংস্কৃতি।

পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামা একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রাম থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে বাঁদা নামক স্থানের পলাশবনের মাঝে আকাশ খুঁড়ে মাথা উঁচু করে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেকালের বিরাট এক পাথরের মন্দির। সাধারণ মানুষের ভাষায় দেউল। বহু দূর থেকে এই দেউলের শীর্ষদেশ দেখা যায়। উচ্চতায় ৫৫ ফুটের মত। মন্দিরটির মস্তকের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে।

মন্দিরে যেতে ভাল রাস্তা নেই। পলাশ জঙ্গলের কাঁটা ঝোপ মাড়িয়ে যেতে হয়। মনে হয় ওখানে কেউ যায় না। পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ির মত পড়ে রয়েছে। মন্দির গর্ভে বাদুড় আর চামচিকাদের বাস। সময় সময় বৃষ্টি-বাদুলার দিনে পথ হারাণো গরু আশ্রয় নেয় মন্দিরে। এই মন্দিরটি দেখে তেলকূপীর ভৈরবনাথের মন্দিরটি কেমন ছিল তা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। আমি যেন ছোটবেলায় দেখা তেলকূপীর মন্দিরটাকেই খুঁজে পাই চেলিয়ামার এই বাঁদা পুরাক্ষেত্রের মন্দিরটির মধ্যে। অবশ্য তেলকূপীর মন্দির গাত্রে যে ধরণের ভাস্কর্য শিল্পের নির্দশন ছিল তা এই মন্দিরে নেই। মন্দিরটি অলঙ্কৃত নয়। তবে মন্দিরে গায়ের খাঁজ ভাঁজগুলো চারদিকে চার রকমের। মন্দিরের গর্ভদেশে আগে নাকি বিগ্রহ ছিল। এখন নেই। মন্দিরের চার পাশে প্রায় ৪০০ বর্গ মিটার স্থান জুড়ে নানা আকারের ভগ্ন শিলাখণ্ড পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ শিলাখণ্ডই স্তম্ভের আকারে তৈরী। প্রায় দেড় থেকে দুই ফুটের মত চওড়া এইসব স্তম্ভগুলো প্রায় ছয় সাত ফুট লম্বা। তবে অলঙ্করণহীন। এছাড়া আছে তিন ফুট চওড়া ও ছয় ফুট লম্বা পাটার আকারে কিছু শিলাখণ্ড। এগুলো দিয়ে এখানের কোন মন্দির বা বাসগৃহের ছাদ তৈরী করা হয়েছিল। শিলাখণ্ডগুলো এত ভারি যে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এই কারণে এইগুলো চুরি হয় না। মন্দিরের এক পাশে বেশ কিছু বাসগৃহ বা আশ্রম জাতীয় কোন সাধনার ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছিল, এমন কিছু নির্দশন মন্দিরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানের মাটির নীচেও বহু আকারের ভগ্ন শিলাখণ্ড রয়েছে। খনন কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালালে হয়তো আরও কিছু ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

চেলিয়ামার এই মন্দিরটি আজকের মত আগেও অবহেলিত ছিল। পুরুলিয়া অঞ্চলের অন্যান্য পুরাক্ষেত্রগুলোর কথা পাশ্চান্ত্য পশ্চিতবর্গ কিছু না কিছু সিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চান্ত্য পশ্চিতবর্গ চেলিয়ামার বাঁদার এই মন্দির প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। অস্ততঃ তাঁদের রচনায় আমার চোখে পড়েন। মন্দিরটি তেলকূপী থেকে বেশি দূরে নয়। দামোদর নদীরও বেশ কাছে।

অতীতের পুরাক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে চেলিয়ামার কোন যোগাযোগ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। পাড়া এবং তেলকূপীর মধ্যবর্তী অঞ্চল চেলিয়ামা। তাখলিপু থেকে পাকবিড়ার, বুধপুর হয়ে যে রাস্তাটি দালমি হয়ে বেনারসের দিকে চলে গিয়েছিল তারই একটা শাখা ছড়িয়ে পাড়া হয়ে চেলিয়ামার দামোদর পার হয়ে কাতেরাস গড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। ঐ রাস্তার আর একটি শাখা অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চল দিয়ে পালগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছিল। চেলিয়ামার যোগাযোগ তেলকূপীর সঙ্গে ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য যখন দালমি থেকে তেলকূপীতে আসতেন তখন অবশ্যই পথে পড়ত চেলিয়ামার এই পুরাক্ষেত্র বাঁদা বা বাঁদামেট তোড়।

চেলিয়ামার এই পুরাক্ষেত্রে কোন তীর্থকর মূর্তি চোখে পড়ে না। তবে চেলিয়ামার গ্রামের মাঝখানে মহামায়ার স্থানে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কিছু সিংহের মূর্তি আঁকা থাম চোখে পড়ে। ছোটখাটো ভাঙ্গা তীর্থকর মূর্তি ও গ্রামের দিকে চোখে পড়ে। এখানে বেশ কিছুটা দূরে রক্ষণ্পুরে একটি পার্শ্বনাথের বিগ্রহ আছে। চাষীরা এই শিলাখণ্ডে কুড়ুল জাতীয় অস্ত্র ধার করে নেয়। ফলে এই মূর্তিটি ক্ষয়ে গিয়েছে।

এই গ্রামের পাশেই শাঁকা গ্রামের পুরুর পাড়ে পড়ে আছে আর একটি তীর্থকর মূর্তি। মূর্তিটি উন্টানো অবস্থায় আছে। এটার উপর বসে রাখাল বালকেরা জটলা করে। এই পুরুরের আর এক পাড়ে সায়ের বুড়ি নামে দেবীরাপে পুঁজো পাচ্ছেন অন্য এক ভগ্ন তীর্থকর মূর্তি। শাঁকা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে দুবড়া গ্রামে। এখানের এক মন্দিরে এক তীর্থকর মূর্তিকে সিমেন্টের পলেস্ট্রার আস্তরণ লাগিয়ে হনুমান বানানো হয়েছে। ভাবলে দুঃখ হয়, কোন্ সে কালের মহান ভাস্কর শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করেছেন অহিংসা ধর্মের সাধক পুরুষের পবিত্র দেহ। পাষাণ ফলকে সে দেহ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আজ আমরা সেই অমর শিল্পীর দেশের উন্নত পুরুষ হয়ে সেইসব অমূল্য শিল্পকলাকে শুধু নষ্ট করছি না, ওগুলোর চরম অবমাননা করছি।

আগেই বলেছি পাতকুম রাজ্যের জমিদার বিক্রমাদিত্য দালমি থেকে এই পথ দিয়েই তেলকূপীতে যেতেন। তাই তাঁর নামটি এই মন্দিরটির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে। চেলিয়ামার একজন জানালেন যে এই মন্দিরটি নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় তৈরী হয়েছিল। কথাটা যদিও ঠিক নয়, তবু এই মন্দিরের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িয়ে থাকাটা কোন অসম্ভব নয়। হয় তো তিনি মন্দিরটির কিছু সংস্কার সাধন করে থাকবেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় এই অঞ্চলে সরাকদের প্রভাব খুব কমে গিয়েছিল। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটে। ১৬৯১

খৃষ্টানদের কাছাকাছি কোন সময় চেলিয়ামার রাধা বিনোদের মন্দিরটি তৈরী হয়।  
এই মন্দিরের আশৰ্য্য সুন্দর টেরাকোটা শিল্প দেখে মুঝ হতে হয়।

॥ দশ ॥

॥ শেষের কথা ॥

আমরা গোড়ার কথাতে পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের স্পষ্ট হিসেবে সরাকদের কথা আলোচনা করেছি। পুরুলিয়ার বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রগুলোর শিল্পকলার আলোচনা করে দেখেছি, এতে প্রায় প্রতিটি পুরাক্ষেত্রেই সরাকদের প্রভাব দেখা গিয়েছে। সরাকদের পুরাক্ষেত্রগুলোর নামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যে সব পুরাক্ষেত্রের আলোচনা করেছি, সেগুলোর নামের মধ্যে ‘ড়’ অক্ষরটা অবশ্যই আছে। একমাত্র তেলকূপী বাদ দিয়ে আর সব পুরাক্ষেত্রের প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে। যেমন- পাকবিড়ারা, বোড়াম, ছড়ারা, পাড়া, দুবড়া, লধুড়কা, দেউলভিড়া, র্যালিবেড়া, মহাদেব বেড়া, বাঁদা মৌতোড় প্রভৃতি। এইসব পুরাক্ষেত্রের শিল্পকলার মধ্যে প্রায় ১০০ শতাংশই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা বা বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য বৌদ্ধ শিল্পকলা ও বুদ্ধ মূর্তিগুলো সব পুরাক্ষেত্র থেকে উৎপাদ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বুদ্ধ মূর্তির চাহিদা থাকাতে পুরাক্ষেত্রের মধ্যে খুব কমই বুদ্ধ মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। জৈন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত একমাত্র যাঙ্কিণী মূর্তিগুলো নারী মূর্তি বলেই এগুলো পুরাক্ষেত্র থেকে পাচার করা হয়েছে। পুরুলিয়ার পুরাক্ষেত্রগুলোতে হিন্দু ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত খুব কমই শিল্পকলা পাওয়া গিয়েছে। বিষ্ণু মূর্তি, গণেশ মূর্তি, কার্তিক মূর্তি, দুর্গা মূর্তি এবং শিব পার্বতী মূর্তি যা পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা তীর্থকর মূর্তির চাইতে একেবারে নগণ্য। সুতরাং কোন পুরাক্ষেত্রেই হিন্দু ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বড় রকমের প্রভাব ছিল এমন কথা বলা যায় না। দেউলঘাটা (বোড়াম), র্যালিবেড়া, দেউলভিড়া এবং তেলকূপাতে কিছু সৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একমাত্র শিব পার্বতীর মিথুন মূর্তি বাদ দিয়ে আর সব মূর্তিতে কিছু কিছু জৈন প্রভাব দেখা গিয়েছে। পুরাণে দিনের যতগুলো মন্দির এই জেলায় আছে এর মধ্যে সবগুলোই কলিঙ্গ রাজির রেখা দেউল এবং সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির। এমন কি বর্ধমানের বরাকরের মন্দিরগুলো এবং বাঁকুড়ার বহলাড়ার মন্দির (সিদ্ধেশ্বরের মন্দির) জৈন মন্দির ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা আমরা আগেই পর্যালোচনা করে দেখেছি। সুতরাং ভাস্কর্য শিল্পকলার দিক দিয়ে এখানে যদিও কিছু সৌরাণিক দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং এই দিক দিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কিছুটা অবদান আছে, কিন্তু প্রাচীন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায়ের দান একেবারে নগণ্য। অবশ্য মধ্যযুগে বৈষ্ণব প্রভাবিত কিছু মন্দির তৈরী হয়েছে। তবে এগুলো আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

আমরা দেখেছি এখানের পুরাক্ষেত্রগুলোতে কিছু বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বড় রকমের প্রভাবের নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি বুধপুরে (বুদ্ধপুরে) পর্যন্ত পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে চারটি মন্দিরই সরাক প্রভাবিত মন্দির ছিল। খুব কম সময়ের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এই জেলার উপর হয় তো পড়েছিল। তবে তা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত হল, The original Buddhistic Civilisation was succeeded by Brahmanical dynesty which was eventually destroyed by the oboriginal population, the Bhumij.

কোন পুরাক্ষেত্রে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা দেখা গেলেই যে ধরে নিতে হবে যে ঐ পুরাক্ষেত্রটি একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিগ্রহণ করেছিলেন এমন কথা ভাববার কোন যুক্তি নেই। একই শিল্পী নানা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা তৈরী করতে পারেন। এবং পুরাক্ষেত্রগুলোতে সেইসব শিল্পকলা সংরক্ষিত থাকতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল পাকবিড়ার। এখানের শিল্পীরা যেমন হাজার হাজার তীর্থকর মূর্তি গড়েছেন ঠিক তেমনি শত শত বুদ্ধ মূর্তি এবং গণেশ মূর্তিও বানিয়েছেন। পাকবিড়ার শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম বিদেশে রপ্তানি করতেন। এই কথাটা যদি সত্য হয়, তবে পাকবিড়ার কতদিন সরাকদের হাতে ছিল, বা কতদিন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, বা কতদিন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, এসব চিন্তা করাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আগেকার দিনে প্রতিটি পুরাক্ষেত্রে শিল্পীরা কাজ করতেন। বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাই ভাস্কর্য শিল্পকলার মাধ্যমে পুরাক্ষেত্রগুলোর পরিচয় জানার চেষ্টা না করে মন্দিরগুলো পর্যালোচনা করে পুরাক্ষেত্রগুলোর পরিচয় জানতে হবে। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন মন্দিরগুলো প্রায় সবই জৈন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং পুরাক্ষেত্রগুলোও সবই সরাক প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের ধারণা এখানের তীর্থকর মূর্তিগুলো সরাক শিল্পীদের তৈরী, বৌদ্ধ শিল্পকলা ও বুদ্ধ মূর্তিগুলো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তৈরী, আবার সৌরাণিক দেব দেবী মূর্তিগুলো হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তৈরী। এই তথ্যটা যদি ঠিক হত, তবে তীর্থকর মূর্তিগুলোর সঙ্গে দুর্গা মূর্তি, গণেশ মূর্তি ও বিষ্ণু মূর্তিগুলো এমন করে করবাস্থ হত না, বা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যেত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির ও শিল্পকলা নষ্ট করার বেশ কিছুটা দায়িত্ব হিন্দু ব্রাহ্মণদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ওঁদের হাতে তীর্থকর মূর্তির সঙ্গে গণেশ মূর্তি নষ্ট হল কিভাবে? কিভাবে

দেউলঘাটার অষ্টভুজা দুর্গার অদ্যহানী ঘটল ? মুসলমানরা এই অঞ্চল কোনদিন আক্রমণ করেনি—এটা ইতিহাস সম্মত কথা। তাই এখানের শিল্পকলা ধ্বংস করার কাজে এখানের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে এখানের আধিবাসীদের কিছুটা হাত ছিল বলে মনে হয়। এতেই প্রমাণিত হয় এখানের সমস্ত শিল্পকলাই সরাক শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল। যাঁরা সরাক মন্দির এবং শিল্পকলা নষ্ট করেছেন তাঁরা কোনটা তীর্থকর মূর্তি আর কোনটা বিষ্ণু মূর্তি তা বিচার করে দেখেন নি। এই কারণে পুরাক্ষেত্রগুলোর একই কবর থেকে ভাঙ্গাচোরা তীর্থকর মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, দুর্গা মূর্তি ও বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে।

এখানের জনগণ তীর্থকর মূর্তিকে পাকবিড়রায় মহাকাল ভৈরব আর তেলকূপীতে ভৈরবনাথ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু প্রাচীন শিব মন্দিরেও শিবাসনে তীর্থকর মূর্তি পূজা পাচ্ছে। এমন অবস্থায় এই বিরাট ধ্বংস লীলার সমস্ত দায়িত্ব এখানের সাধারণ আনন্দদের হাতে তুলে দেওয়া ইতিহাস সম্মত হবে বলে আমার মনে হয় না। তাই কিভাবে পুরুলিয়া অঞ্চলের এক বিরাট শিল্প সভ্যতার অপম্যুৎ ঘটেছে সেটা একটা বিতর্কিত বিষয় বলে আমার মনে হয়। এ নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কতটা দায়ী সে বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে।

## বাঙ্গালার আদিধর্ম

প্রবোধচন্দ্র সেন

।।। ।।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনসাঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া দেশের বিভিন্ন প্রদেশে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল (খঃ ৬৩০-৬৪৪) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিখিত বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানা যায়। পূর্বভারত তথা বাঙ্গালাদেশের ধর্ম সম্প্রদায়গুলির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাহার প্রধান কথাগুলি সংক্ষেপে সংকলন করিয়া দিতেছি :

১। বৈশালী (এই রাজ্যটি বর্তমান বিহারের উত্তরাংশে তিরহুত বিভাগে অবস্থিত ছিল) — মুজ়ফফরপুর জিলার হাজিপুর মহকুমার অন্তর্গত বর্তমান বেসার নামক পল্লীতে প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত আছে। হিউএনসাঙ্গ-এর বিবরণ হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এখানকার আধিবাসীরা বিশেষ ধর্মপরায়ণ ছিল এবং বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধেরা একসঙ্গেই বাস করিত। এখানে কয়েক শত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তৎকালে তিন চারটি ব্যক্তিত বাকি সকলগুলীই ধ্বংসদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যাও খুব কম ছিল। পক্ষান্তরে দেবমন্দিরগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না (There are some tens of Deva Temples)। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্মেরও বহু সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু দিগন্বর নির্গৃহদের (অর্থাৎ জৈনদের) সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়।

২। মগধ (বর্তমান পাটনা ও গয়া জিলা) এই স্থানের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরূপ ছিল। এখানে পঞ্চাশটি বৌদ্ধ সঙ্গারাম ছিল এবং তাহাতে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। ভিক্ষুদের অধিকাংশ ছিল মহাযানপন্থী। দেবমন্দির এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কম ছিল না। মগধের জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে হিউএনসাঙ্গ স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিবরণ হইতেই জানা যায় যে প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিবর্জ (পাটনা জিলার অন্তর্গত আধুনিক রাজগীর) নগরের অদূরবর্তী ‘বিপুল’ নামক পর্বতের উপরে একটি স্তুপ ছিল এবং এখানে বহু দিগন্বর জৈন বাস করিত ও তপস্যাদি করিত। তাহারা উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের প্রতি মুখ ফিরাইয়া ধর্ম সাধনা করিত

(Beal II. 158, Walter II. 154-55)। তাহা ছাড়া নালন্দাতেও (পাটনা জিলার বিহার মহকুমার অন্তর্গত বড়গাঁও নামক স্থান) দিগন্বর জৈনদের গতিবিধি ছিল বলিয়া অনুমান করিবার হেতু আছে (Beal II. 84)।

৩। দ্বীরণ পর্বত (মুন্দের জেলা)– মগধ হইতে পুর্বদিকে একটি বৃহৎ অরণ্য অতিক্রম করিয়া হিউএনসাঙ্গ আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বীরণ পর্বত নামক দেশে প্রবেশ করেন (Waters II. 178, 335)। এখানে তিনি দশ-বারোটি বৌদ্ধ সংঘারাম এবং চারি সহস্রের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। ইহাদের অধিকাংশই হীনযান সম্প্রদায়ের সম্মিতীয় শাখাভুক্ত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বারোটি দেবমন্দিরও তিনি দেখিতে পান। এইখানে হিউএনসাঙ্গ এক বৎসর বাস করেন।

৪। চম্পা (ভাগলপুর জেলা)– দ্বীরণ পর্বত হইতে তিনি চম্পা দেশে আসেন। এখানেও অনেকগুলি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। কিন্তু অধিকাংশই ধ্বংসদশা প্রাপ্ত এবং উহাদের অধিবাসী ভিক্ষুদের সকলেই হীনযানপন্থী। সংখ্যাও মাত্র দুই শতাধিক ছিল। দেবমন্দির ছিল প্রায় কুড়িটি। জৈনদের সমন্বয়ে তিনি কিছুই লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তৎকালে চম্পায় জৈন ধর্মাবলম্বী কেহ ছিল না এমন মনে করা যায় না। হিউএনসাঙ্গ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি বৌদ্ধ ধর্মের কথা বিশেষভাবে বলিয়া অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। এমন অবস্থায় তাহার নীরবতা হইতে কোনো সিদ্ধান্ত করা সম্ভাবন হইবে না। মনে রাখা উচিত যে, আধুনিককালেও ভাগলপুর শহরে একটি প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির আছে।

৫। কজন্দল (আধুনিক রাজমহল)– হিউএনসাঙ্গ চম্পা হইতে কজন্দলে আসেন। এখানে তিনি ছয়-সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাম, তিনি শতাধিক ভিক্ষু এবং দশটি দেবমন্দির দেখিয়া ছিলেন। জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

৬। পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ)– হিউএনসাঙ্গ কজন্দল হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসেন। এখানে তিনি কুড়িটি সংঘারাম ও তিনি হাজারের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। ইহাদের অনেকে হীনযানপন্থী ও অন্যরা মহাযানপন্থী। দেবমন্দির ছিল প্রায় একশত এবং ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কিন্তু দিগন্বর নির্গুহের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে কিছু দূরে একটি স্তুপ অবস্থিত ছিল। হিউএনসাঙ্গ লিখিয়াছেন, এই স্তুপটি সম্ভাট অশোক নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ভগবান তথাগত বুদ্ধ এইস্থানে তিনি মাস অবস্থান করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৭। কামরূপ (আসামের অন্তর্গত গোহাটি অঞ্চল)– চৈনিক পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পূর্বদিকে যাত্রা করেন ও একটি বৃহৎ নদী (করতোয়া) অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে উপনীত হন। তিনি বলেন, কামরূপের অধিবাসীরা সকলেই দেবোপাসক। কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম কখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং কামরূপে একটিও বৌদ্ধ সংঘারাম নির্মিত হয় নাই; যেসব বৌদ্ধরা কামরূপে বাস করিত তাহারা গোপনেই ধর্মোপাসনাদি সমাপ্ত করিত। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই বহু লোক ছিল এবং দেবমন্দিরও ছিল কয়েক শত। জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও কামরূপে তখন পর্যন্ত বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

৮। সমতট (শ্রীহাট্ট ত্রিপুরা প্রদ্বৃত্তি অঞ্চল)– কামরূপ হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া হিউএনসাঙ্গ সমতটে আসেন। এখানে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস ছিল। বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল ত্রিশটির অধিক এবং তাহাতে দুই হাজার ভিক্ষু বাস করিত। এই ভিক্ষুরা ছিল সকলেই স্থবর সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবমন্দির ছিল প্রায় একশত। কিন্তু দিগন্বর নির্গুহের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

সমতটের রাজধানীর কর্মসূত্র (কুমিল্লার নিকটবর্তী বড়কামতা) হইতে অদূরে একটি স্তুপ অবস্থিত ছিল। হিউএনসাঙ্গ-এর মতে এটি সম্ভাট অশোকের নির্মিত এবং এইস্থানে বুদ্ধদেব সাতদিন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৯। তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুরের অন্তর্গত আধুনিক তমলুক)– সমতট হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া হিউএনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তিতে উপনীত হন। এখানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল দশটি এবং তাহাতে প্রায় এক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। দেবমন্দির ছিল পঞ্চাশটির অধিক। তাম্রলিপ্তি নগরীর নিকটেই একটি স্তুপ ছিল এবং হিউএনসাঙ্গ-এর মতে এটিও সম্ভাট অশোকের নির্মিত।

১০। কর্ণ সুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জিলা)– সমতট হইতে উত্তরদিকে যাত্রা করিয়া কর্ণ সুবর্ণে আসেন। এখানে দশটি সংঘারামে দুই সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। ইহারা সকলেই হীনযান সম্প্রদায়ের সম্মিতীয় শাখাভুক্ত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবোপাসকদের মন্দির ছিল প্রায় পঞ্চাশটি।

কর্ণ সুবর্ণ নগরের নিকটেই ‘রঞ্জ মৃত্তিকা’ নামে একটি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল এবং এই সংঘারামটির নিকটে কয়েকটি স্তুপ অবস্থিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে এইসব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন

এবং সন্নাট অশোক পরবর্তীকালে এ স্থানগুলিতে একেকটি করিয়া স্তুপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

১১। ওড় (উত্তর্যা)– কর্ণ সুবর্ণ হইতে পরিব্রাজক ওড়দেশে যান। সেখানে একশতাধিক বৌদ্ধ সংগ্রাম ও দশ সহস্র মহাযানপন্থী ভিক্ষু ছিল। দেবমন্দিরের সংখ্যা তিনি দিয়াছেন পঞ্চাশ। তাছাড়া, যে সব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ঐসব স্থানে দশটি অশোক স্তুপও অবস্থিত ছিল।

১২। কঙ্গোদ (গঞ্জাম জিলা)– এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ছিল দেবোপাসক। এদেশে বৌদ্ধ সংগ্রাম ছিল না। দেবমন্দির ছিল শতাধিক।

১৩। কলিঙ্গ (উত্তর্যার দক্ষিণে)– এখানে বৌদ্ধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মাত্র দশটি সংগ্রাম ও পাঁচশত মহাযানপন্থী ভিক্ষু তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবৌদ্ধের সংখ্যা ছিল খুব বেশী এবং তাহাদের মধ্যে দিগন্বর নির্ঘন্থরাই ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। দেব মন্দিরের সংখ্যা দিয়াছেন একশত।

ধর্মসম্প্রদায়গুলির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব ভারতে (তথা বাঙ্গলায়) পৌরাণিক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনি সম্প্রদায়ের ধর্মই সমানভাবে প্রচলিত ছিল। তখন বাঙ্গাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের দুইটি শাখাই অর্থাৎ হীনযান ও মহাযান এই দুইটি শাখাই বিদ্যমান ছিল, একথাও চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতেই স্পষ্টরূপে জানা যায়। কিন্তু এই সময়ে বাঙ্গাদেশে বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল এবং অনুমান হয়। কারণ হিউএনসাঙ্গ নিজেই বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে (যথা বৈশালী ও চম্পা) বৌদ্ধ সংগ্রামগুলির অধিকাংশই ধ্বংসদশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হিউএনসাঙ্গ-এর পূর্ববর্তী চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাত্ত্বলিষ্ঠি নগরীতে দুই বৎসরকাল (খঃ ৪০৯-৪১১) বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সে সময়ে তাত্ত্বলিষ্ঠি জনপদে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং উক্ত জনপদে বৌদ্ধ সংগ্রাম ছিল বাইশটি। কিন্তু হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে ছিল মাত্র দশটি। সুতরাং দেখিতেই দুইশত ত্রিশ বৎসরের (খঃ ৪০৯-৬৩৯) মধ্যে তাত্ত্বলিষ্ঠিতে বৌদ্ধ ধর্মের অনেকখানি অবনতি ঘটিয়াছিল। হিউএনসাঙ্গ-এর বিবরণীতে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেও কামরূপ, কঙ্গোদ ও কলিঙ্গ এই তিনটি জনপদে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে বহু শতাব্দীব্যাপী প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। তাহারই ফলে উক্ত তিনটি জনপদে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই এবং এই প্রতিযোগিতার ফলেই তাত্ত্বলিষ্ঠিতেও ফাহিয়ানের সময় হইতে হিউএনসাঙ্গ-এর

সময় পর্যন্ত এই প্রায় আড়াইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এতটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

হিউএনসাঙ্গ-এর বিবরণ হইতেই জানিতেছি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেও পূর্ব-ভারতে জৈন ধর্ম যথেষ্ট প্রবল ছিল। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজক ছিলেন বৌদ্ধ। তাই তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। জৈন বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই কাজ সারিয়াছেন। তথাপি দেখিতেছি বৈশালী, পুনৰ্বৰ্দ্ধন, সমাট এবং কলিঙ্গ এই চারটি জনপদে দিগন্বর জৈন সম্প্রদায় ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। মগধেও বহু জৈন ছিল। তাহা ছাড়া, অন্যান্য জনপদগুলিতেও যে যথেষ্ট সংখ্যক জৈন ছিল না এমন মনে করা সঙ্গত বোধ হয় না। ঐসব জনপদগুলিতেও জৈনরা সংখ্যা গৌরবে অপেক্ষাকৃত হীন ছিল বলিয়াই হিউএনসাঙ্গ সে বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও তিনি নীরব। কোন জনপদে কতগুলি দেবমন্দির ছিল তিনি শুধু সেকথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কোন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত এবং কোন সম্প্রদায়ের কয়টি মন্দির ছিল সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই, তথাপি সে সময়ে বাঙ্গাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে কিছু কিছু সংখ্বাদ অবগত হইবার উপাদান আমাদের আছে। এছলে সেবিষয়ে বেশী আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। সুতরাং সংক্ষেপে দুই চারটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। আমরা জানি কর্ণ সুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্গ ছিলেন শৈব এবং তাঁহার পরম শক্তি কর্ণ সুবর্ণ বিজেতা কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মণও ছিলেন শিবোপাসক। কিন্তু কর্ণ সুবর্ণপতি জয়নাগ ছিলেন পরম ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব (E.P. Ind. XVIII. P.63)। বাঙ্গাদেশ যে গুপ্ত সন্নাটরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এই সময়ের তাত্ত্বশাসন প্রভৃতি হইতে পাওয়া মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এই সময়ের তাত্ত্বশাসন প্রভৃতি হইতে পাওয়া। তাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গাদেশে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দামোদরপুরে প্রাণ্ড দুইখানি তাত্ত্বশাসন (চতুর্থ ও পঞ্চম) হইতে জানা যায় যে সমাট বুধগুপ্ত (খঃ ৪৭৭-৪৯৬) এবং তৃতীয় কুমারগুপ্ত (খঃ ৫৪৩) আমলে পুনৰ্বৰ্দ্ধন ভূক্তিতে কোকামুখ স্বামীর জন্য একটি এবং শেতবৰাহ স্বামীর জন্য দুইটি তাত্ত্বশাসনের নির্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএনসাঙ্গ এইসব মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। শুশনিয়া পর্বতলিপি (E.P. Ind. XIII. P.133) হইতে জানা যায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুনৰ্বৰ্দ্ধন (বীকুড়া জিলা)

অন্তর্গত বর্তমান পোথরণ নামক গ্রাম) অধিপতি চন্দ্রবর্মন ছিলেন চত্রস্বামীর (অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক)।

গুপ্তযুগে (খঃ ৩১৯-৫৫০) বাঙ্গাদেশে ব্রাহ্মণধর্মের অবস্থা কিরণপ ছিল অর্থাৎ কোন কোন দেবতার উদ্দেশে মন্দির নির্মাণ ও উপাসনা হইত সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। সে সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্মও যথেষ্ট প্রবল ছিল এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ শতাব্দী অপেক্ষা প্রবলতরই ছিল, ফাহিয়ানের বিবরণ হইতে এই অনুমান হয়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ফাহিয়ান (খঃ ৪০৯-৪১১) বাঙ্গাদেশের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া যান নাই। তিনি শুধু চম্পা (ভাগলপুর) এবং তাত্ত্বিকিত্ব নামান্য কিছু বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন (Legge, P.100)।

গুপ্তযুগে বাঙ্গাদেশের অবস্থা কিরণপ ছিল সে বিষয়েও সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সময়ও বাঙ্গায় নিশ্চয়ই জৈন ধর্মের প্রভাব খুব বেশি ছিল। নতুবা হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে বাঙ্গায় জৈনদের এতখানি প্রভাব থাকা সম্ভব হইত না। পাহাড়পুর (রাজসাহী জিলায়) প্রাপ্ত একটি তাত্ত্বিক সন্ধান হইতে জানা যায়, ৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে নাথশর্মা এবং রামী নামে ব্রাহ্মণ দম্পতি পুন্ড্রবর্দ্ধনের (বগুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান মহাস্থান গড়) নিকটবর্তী ‘বট গোহালী’ (আধুনিক গোয়ালভিটা, পাহাড়পুরের নিকটে) নামক স্থানে জৈন বিহারের পূজ্যার্চনাদি কার্যের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত বিহারে শ্রমণাচার্য নির্গত গুহনন্দীর শিষ্যপ্রশিক্ষ্যরা অধিষ্ঠিত ছিলেন (E.P. Ind. XX. PP.61-63)। ইহা হইতে বোঝা যায় গুপ্তযুগে বাঙ্গাদেশের জৈনধর্ম শুধু যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নয় সঙ্গতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণরাও জৈনধর্ম ও জৈন আচার্যদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিত এবং কার্যতঃ ভূমিদান করিয়া সহায়তা করিত। ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বট গোহালীর এই জৈন বিহারটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে পুন্ড্রবর্দ্ধন নগরের অন্তিম দুরে অবস্থিত ছিল এবং সম্পূর্ণ শতকের প্রথমভাগে হিউএনসাঙ্গ পুন্ড্রবর্দ্ধন জনপদে বহু দিগন্বর নির্গত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আনুমানিক খঃ ৪০০ অন্তে পাটলীপুর নগরে জৈন সম্প্রদায়ের একটি সভা আহুত হয় এবং ঐ সভাতে জৈনদের ধর্মশাস্ত্র সমূহ যথাযথভাবে বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ শাস্ত্রসমূহ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তাই গুপ্ত সম্রাটদের অভ্যন্তরের চরম সময়ে ৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতের অন্তর্গত বলভী নগরীতে জৈনদের আর একটি সভা আহুত হয় এবং ঐ সভাতে জৈন শাস্ত্রসমূহ নৃতনভাবে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ হয়। এই

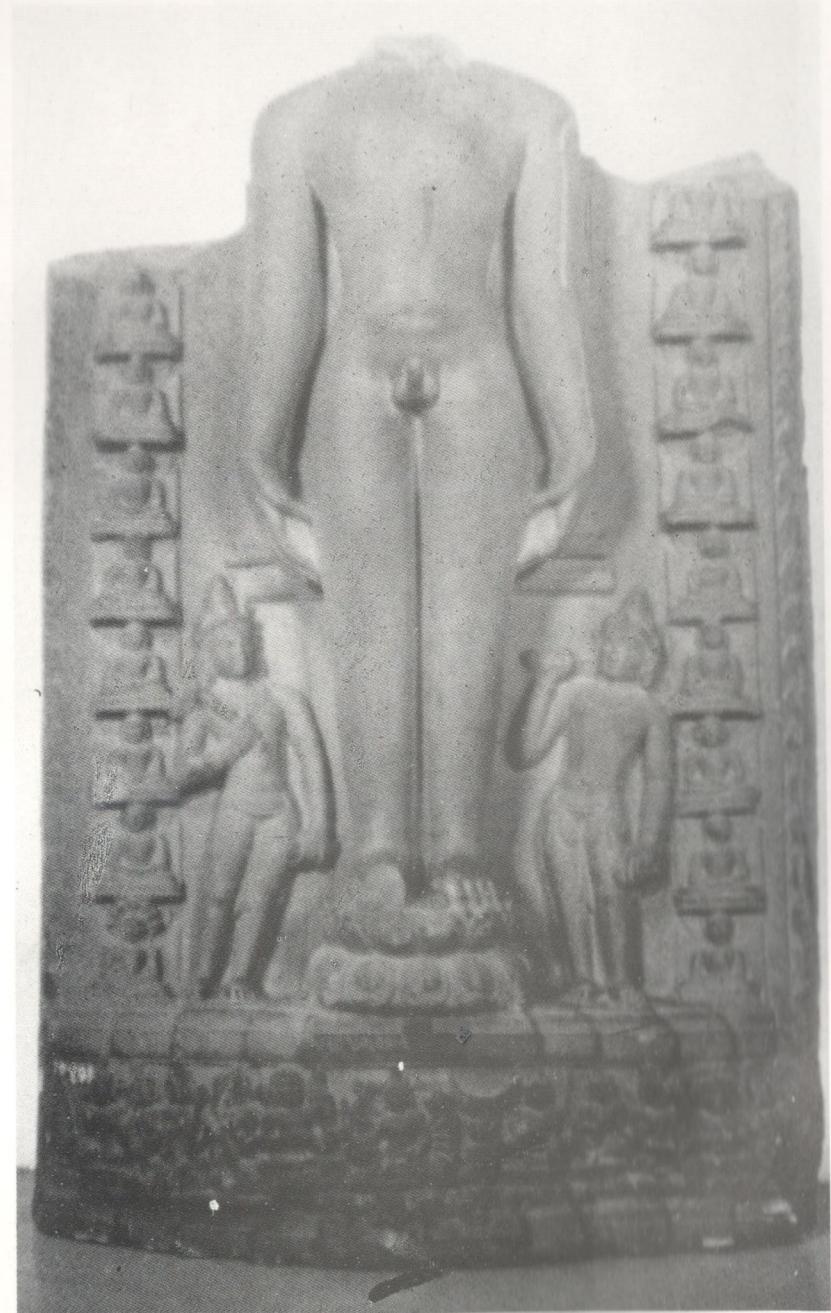
শাস্ত্রগ্রন্থসমূহই বর্তমানে জৈন ধর্মের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু এগুলি এ সময় রচিত হয় নাই। তাই গ্রন্থসমূহ হইতে বহু প্রাচীন তথ্য জানিতে পারা যায়। অবশ্য স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের প্রভাবও এই গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়।

যাহা হউক, এই শাস্ত্রসমূহের অন্যতম প্রধান গ্রহের নাম কল্পসূত্র। এই গ্রন্থখানি হইতে জৈন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার নাম জানিতে পারা যায়। এই শাখাগুলির মধ্যে এছলে তাত্ত্বিকিত্ব, কোটিবর্ষিয়া, পুন্ড্রবর্দ্ধনিয়া (দাসী) কর্বিত্যা বা খৰটিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাত্ত্বিকিত্ব মেলিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের প্রাচীন নাম। প্রাচীন কোটিবর্ষ নগর দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত ছিল। পুন্ড্রবর্দ্ধন নগর বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাস্থান গড় নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া পঞ্চতোরা মনে করেন। মহাভারতে ভীমের দিঘিজয় প্রসঙ্গ কর্বট জনপদের উল্লেখ পাই। বরাহ মিহিরের (মৃত্যু ৫৮৭ খঃ) বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থেও কর্বট জনপদের উল্লেখ আছে। এই জনপদটি রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে তাত্ত্বিকিত্ব নিকটেই অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, তাত্ত্বিকিত্ব, কর্বট, কোটিবর্ষ ও পুন্ড্রবর্দ্ধন এই চারিটি স্থান গুপ্তযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থখানিও খৃষ্টীয় ৪৫৭ অন্তে সম্রাট কুমারগুপ্তের রাজত্ব সময়ে (খঃ ৪১৫-৪৫৫) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাঙ্গাদেশের তাত্ত্বিকিত্ব, কোটিবর্ষ প্রভৃতি চারিটি স্থানে জৈনধর্ম বিশেষ প্রবল ছিল। পুরোক্ত পাহাড়পুর তাত্ত্বিক সন্ধান হইতে বটগোহালী নামক স্থানে অবস্থিত যে জৈন বিহারের কথা জানা গিয়াছে তাহা পুন্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে খুব দূরে ছিল যে জৈন বিহারের কথা জানা গিয়াছে তাহারাও এই পুন্ড্রবর্দ্ধনিয়া শাখার অস্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সময় হইতে নির্গত অর্থাৎ জৈনরা পুন্ড্রবর্দ্ধনিয়া শাখার অন্তর্গত ছিল এবং এই সময় হইতে কিছু পরবর্তীকালে হিউএনসাঙ্গ পুন্ড্রবর্দ্ধনে যে সমস্ত নির্গতদিগকে দেখিয়া ছিলেন তাহারাও এই শাখাভুক্তই ছিল। ফাহিয়ান এবং হিউএনসাঙ্গ উভয়েই তাত্ত্বিকিত্ব নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ তাহাদের কেহই তাত্ত্বিকিত্ব জৈন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। অথচ দেখিতেছি তাত্ত্বিকিত্ব জৈনদের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল। সেই জন্যই পূর্বে বলিয়াছি হিউএনসাঙ্গ-এর নীরবতা হইতে কোনো সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয় এবং যেসব জনপদের বর্ণনায় তিনি জৈনদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই সে সব জনপদেও অঞ্চলিক্তর জৈন ছিল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

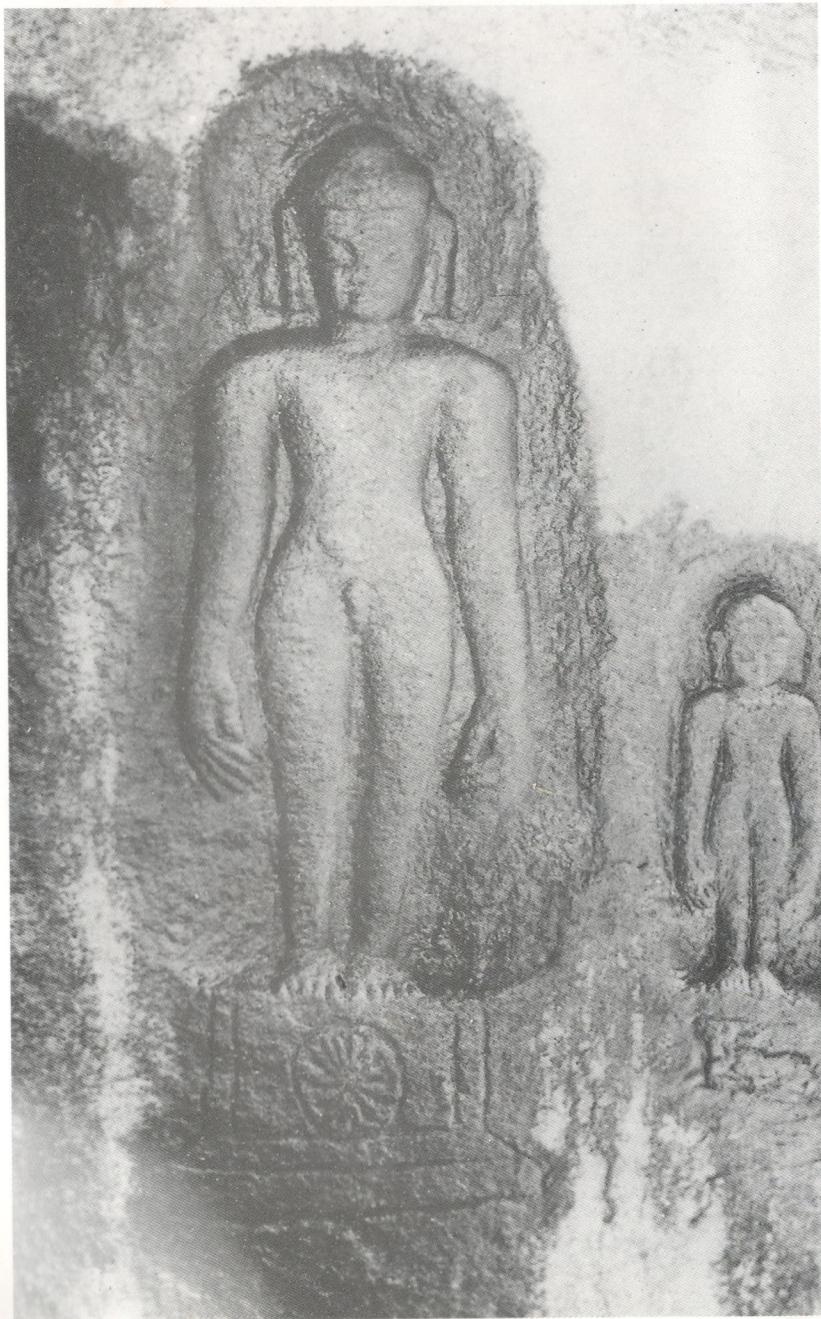
অতএব আমরা দেখিতেছি, গুপ্তযুগে বাঙ্গালাদেশে জৈন, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব শৈব এই চারিটি ধর্মসম্প্রদায়ই বেশ প্রতিপত্তির সহিত বিদ্যমান ছিল। এখন প্রক্ষ হইতেছে এই ধর্মগুলি কিরণে ও কোন সময় বাঙ্গালাদেশে বিস্তারলাভ করিল এবং কোন ধর্মটি সকলের আগে এদেশে প্রাধান্য লাভ করে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালাদেশের প্রাক গুপ্তযুগের ইতিহাস বড় তমসাচ্ছন্ন। নানাস্থান হইতে উঙ্গবৃত্তি করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে ইতিহাসটুকু রচনা করা যায় তাহাও ধর্ম বিষয়ক নয়। কাজেই গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ধর্ম বিষয়ক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বৃথা। অথচ এই সময়ে যে পুরোকৃত ধর্মসম্প্রদায়গুলি বাঙ্গালায় অবিরাম প্রসার লাভ করিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন নাম ভাগবত ধর্ম। এই ধর্মটির উৎপত্তি অতি প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। খঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মথুরা অঞ্চলে এই ধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকে তক্ষশীলার গ্রীকরাজ Antialcides পঞ্চম শুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের বিদিশাস্থিত রাজসভায় হেলিওডোরাস নামক দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই যবন (অর্থাৎ গ্রীক), দৃত ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পরম ভাগবত যবন হেলিওডোরাসের প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের পরম বৈষ্ণব যবন হরিদ্বাসের কথা স্বভাবতই মনে আসে। পূর্বেই বলিয়াছি মগধের সন্নাটরা সকলেই ছিলেন ভাগবত সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব খঃ পৃঃ চতুর্থ শতক হইতে খঃ চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভাগবত ধর্ম বাঙ্গালায় ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। খঃ চতুর্থ শতকে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মন ছিলেন চক্ৰবৰ্ষামীর উপাসক, এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালায় ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম নির্দর্শন।

পূর্বে বলিয়াছি যে খঃ পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে কোকামুখ নামক দেবতার জন্য একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই কোকামুখ সন্তুষ্টঃ শিবের এক রূপ। যদি তাহাই হয় তবে ইহাকেই বাঙ্গালার শৈব ধর্মের প্রথম ঐতিহাসিক নির্দর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীকালে কর্ণসুবৰ্ণরাজ শশাঙ্ক ও কর্ণ সুবৰ্ণ বিজেতা ভাস্কর বর্মন উভয়েই শৈব ছিলেন। শৈব ধর্ম বাঙ্গালায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিল তারা বর্তমানে বলা দুষ্কর। এই ধর্মটি ভারতবর্ষের একটি আদিম ধর্ম। সিঙ্গু দেশের অস্তর্গত মহেঝোদড়ো নামক স্থানে শিবলিপি, শিবমূর্তি প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক শৈব নির্দর্শন পাওয়া গিয়াছে। খগ্বেদের দেবতা রংদ্রকেও অনেকে শিব হইতে অভিন্ন মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন বাঙ্গালার প্রাচীনতম অধিবাসী অঙ্গ বঙ্গ পুঁড় প্রভৃতি tribe বা



চন্দ্রপ্রভ, দিনাজপুর



জৈনমূর্তি, সূর্যপাহাড়, আসাম



পার্শ্বনাথ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ



পাড়ার প্রাচীনতম সরাক জৈন মন্দির



পার্বনাথ, বর্ধমান

জনশুলির মধ্যে তাত্ত্বিক লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গ পূজার সহিত প্রাচীগতিহাসিক শৈব ধর্মের যোগ থাকা বিচিত্র নয়। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে শৈব ধর্ম বাঙ্গলার আদি ধর্ম। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে যে শৈব ধর্মের প্রচলন দেখিতে পাই তাহা অনেকাংশেই আদিম শৈব ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র। এই পরবর্তী শৈব ধর্মকে নব শৈব ধর্ম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই নব শৈব ধর্মের সুস্পষ্ট প্রাচীন নির্দশন পাই খৃষ্টীয় ১ম শতকের কুষাণ রাজাদের মুদ্রায়। পতঙ্গলির মহাভাষ্যেও শিবোপাসনার উল্লেখ আছে। এই সময়ের কত পূর্বে বা কত পরে এই নৃতন শৈব ধর্ম বাঙ্গলায় প্রবেশ করে তাহা বলা সম্ভব নয়।

এই কুষাণ যুগেই মহাযান ও হীনযান এই দুইটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আমরা দেখিয়াছি হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে বাঙ্গাদেশে হীনযান ও মহাযান এই উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই ছিল। কুষাণ যুগে বৌদ্ধদের মধ্যে যে নৃতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় তাহারই নাম মহাযান। এই মহাযানী বৌদ্ধরা প্রাচীন পঞ্চদিগকে হীনযান আখ্যা দান করে। সুতরাং হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে বাঙ্গায় যে হীনযান সম্প্রদায় ছিল সেইটিই বাঙ্গায় প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়, একথা মনে করা যাইতে পারে। মহাযান সম্প্রদায় অবশ্যই কুষাণ যুগের পরে বাঙ্গায় প্রসার লাভ করে। কিন্তু কিভাবে বাঙ্গায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিল সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গুপ্তযুগে বাঙ্গাদেশে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম ছাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মও প্রচলিত ছিল। আমরা গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের (খঃ ৪১৫-৪৫৫) সময়ের দুইখানি (৪৪৩ এবং ৪৪৮ খৃষ্টাব্দের) তাত্ত্বাসন হইতে জানিতে পারি যে ঐ সময়ে পুনৰ্বৰ্দ্ধন ভূক্তিতে (অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে) ব্রাহ্মণরা অগ্নিহোত্র, পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ত্রিয়াধর্ম করিত। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙ্গায় কোন সময়ে প্রবেশ লাভ করিল সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। \*

## ॥ ২ ॥

ভাগবত, শৈব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া একথা মনে করিবার হেতু আছে যে খৃষ্টের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতেও বাঙ্গায় জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম (অপর মতে দ্বিতীয়) শতকে কলিঙ্গধীপতি খারবেল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার হাতিগুম্ফা লিপি হইতে জানা যায় তিনি জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জৈন সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ

যাত্রীবান ছিলেন। সীমা রাজ্যের একাদশ বাসমে তিনি কলিপ নগরে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে এই সম্প্রদাদের একটি সভা আহুন করিয়াছিলেন এবং ঐ সভায় জ্ঞেন শাস্ত্র সমূহ আলোচিত হইয়াছিল। ত্রি বৎসরই তিনি ভেঙ্গদিশকে বহু ষ্ঠেত বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব বৎসরে তিনি নমরাজ কর্তৃক কলিপ হইতে নীত একটি জ্ঞেন শুর্তি বাণ্ডি করিয়াছিলেন। এই সমস্ত তথ্য হইতে স্পষ্টই বোধ যায়, ঐ সময়ে কলিপ রাজ্য জ্ঞেন সম্প্রদাদের একটি প্রধান কেন্দ্র হিল। আমি পূর্ব অবক্ষেত্রে দেখাইয়াছি (জেন্থাফের পূর্ব প্রকাশিত কোন প্রথম কলিপের সম্মে বস্তের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং যে সময়ে কলিপে জ্ঞেন ধর্মের এত প্রাথমিক ছিল সে সময়ে বাঙ্গলাদেশেও যে এই ধর্মের অনেকখানি প্রভাব হিল এবন বনে করা অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে যান রাখা উচিত যে হিউএনশঙ্ক কলিপ দেশে জ্ঞেন সম্প্রদাদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি বলিয়া উল্লেখ করিয়া পিয়াছেন এবং তৎকালে বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানেও জ্ঞেন প্রভাব স্থব বেশী ছিল। উঙ্গ হাতিশঙ্ক দিলি হইতেই আরও জনায় সজ্ঞাটি জ্ঞেন হইলেও তিনি বানাণদের প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেন। হাতিশঙ্কা লিপিতে বৌদ্ধদের কোন উল্লেখ নাই।

স্তুপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সম্রাট অশোকের (খঃ পঃ ২৭২-২৩২) সাম্রাজ্যভূত ছিল। তিনি সীমা রাজ্যের এরোদশ বৎসরে (২৬০ খঃ পূর্বাব্দে) কলিপ রাজ্য জ্ঞেন (Rock Edict XIII)। বসন্দে অশোকের সাম্রাজ্যভূত ছিল কলিপ এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু বসন্দেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভূত বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ অশোক নিম্নেই দ্বিতীয় শুল্কাসনে করিয়াছেন। উক্ত প্রত্যাত্মক প্রমাণ আছে। অশোক নিম্নেই প্রত্যাত্মক প্রমাণে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতবর্ষে একবারও আবহিত হয়েছিল। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ হইতে যান হয় বাঙ্গলাদেশে যে অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(R.E. XIII) সীমা সাম্রাজ্যের বিহুভূত প্রত্যাত্মক প্রমাণ হইতে জ্ঞেন তাঁহার প্রত্যাত্মক প্রমাণ আছে। এই প্রচারিত দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত ছিল। অন্যান্য প্রত্যাত্মক রাজ্যগুলির মধ্যে কলিপে কোনটি ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না। সকলগুলি তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরিচয়দিকে অবস্থিত ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় দুইবাবের একবারও অশোক প্রত্যাত্মক প্রমাণ আছে। সুতরাং স্থভাবতই অনুমান হয় যে বাঙ্গলাদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভূতই ছিল। আর ইহুই স্থভাবিক। কারণ মাঝের অব্যবহিত প্রত্যবর্তী হইয়া বাঙ্গলাদেশের পক্ষে বিরাট শত্রিণীলী নৌব সাম্রাজ্য হইতে আজৰাক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি সম্প্রদায় সম্প্রদাম শতকে হিউএনশঙ্ক পুরুষবর্ধন, সম্ভাত, কর্ণশুরণ, তামলিষ্টি ও উজ্জ

এই স্থানগুলিতে করয়েকটি বৌদ্ধ স্থুল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে এইসব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ শতবীর এই প্রচলিত ধারণা কততুর সত্ত অর্থাৎ বুদ্ধবর্ধন, সম্ভাত, কর্ণশুরণ প্রভৃতি হাতে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু এবং এসব স্থুল সত্তই অশোকের নির্ভিতে কিনা তাহা বর্তমান সময়ে নিঃসংযোগে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তথাপি বাঙ্গলাদেশে অশোকের রাজত্ব ও স্থুল নির্মাণ সম্মতে সম্ভূত প্রতিক্রিয়া একেবারে অব্যুক্ত রাজগুলির মধ্যে বাঙ্গলার কোন কারণ এই যে, অশোক সীমা সাম্রাজ্যের প্রত্যঙ্গ রাজগুলির প্রয়োগেই জনপদের উল্লেখ করেন নাই। বিউতিমতঃ, দিয়াবদান প্রয়ে অতি স্পষ্টরূপেই পুরুষবর্ধন নামকে অশোকের রাজ্যভূত বলিয়া যান হয় না। তাহার প্রথম নয়, উক্ত প্রয়ে অন্য বলা হইয়াছে পুরুষবর্ধন নামক লগর, তৎপূর্বে পুরুক্ষ নামক পর্বত, তৎপরে প্রত্যঙ্গ এই। এই প্রত্যঙ্গ কিম্বের ও কোন সময়ের স্থুলকর্ম পুরুষবর্ধন নামক পর্বত, উল্লেখ করেন নাই। কথাটি অবশ্য মুদ্রণের মুখে বসানো স্থে বিষয়ে কেনো উল্লেখ নাই। কথাটি পুরুষবর্ধন পুরুষের মুখে হইয়াছে। কিন্তু যান হয় এই পুরুক্ষক পর্বত অশোকের সাম্রাজ্য ও তৎকালীন বৌদ্ধ প্রভাবের সীমাত্ত বলিয়া গণ্য হইত। যদি তাহাই হয় তবে অনুমান করিতে হইবে যে পুরুষবর্ধনের পুরুষবর্তী কালবাসে অশোকের সাম্রাজ্যের ও বৌদ্ধ জগতের সীমার বাহিরে ছিল এবং এই সম্পূর্ণ শৃতকেও হিউএনশঙ্ক কালবাসে পৌরুষবর্তের প্রতিবে দেখিতে পান নাই। পুরুষবর্ধন সাম্রাজ্যভূত ছিল তাঁহার প্রমাণ অশোকবদান প্রত্যঙ্গ অন্যান্য বৌদ্ধ রচনা হইতেও পাওয়া যায়। সিংহলের মহাবৰ্ধন নামক বৌদ্ধগুহ হইতে জানা যায় তামলিষ্টিও অশোকের রাজ্যভূতই ছিল। অশোকবদানেও তাঁহার অনুমান প্রমাণ আছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে যান হয় বাঙ্গলাদেশে যে অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, অশোকের রাজত্বকালে (খঃ পঃ ২৭২-২৩২)

বাঙ্গলাদেশে কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম যে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষে বাহিরেও বহুদেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিল। কর্ণলয় মুকুটে কলিপদেশে বাঙ্গলায় ও অন্যান্য সম্প্রদামের গোক ছিল। তাহা ছাড়া অশোক নিজেই বাঙ্গলায় ও তাঁহার প্রচারকার্য চলিয়াছিল। কর্ণলয় মুকুটে কলিপদেশে বাঙ্গলায় অন্যান্য ও অন্যান্য সম্প্রদামের কাহারও অভানা নাই। সুতরাং বাঙ্গলায় ও অন্যান্য সম্প্রদামের প্রত্যবর্তী হইয়া বাঙ্গলাদেশের পক্ষে বিরাট শত্রিণীলী নৌব বিষয়ে বাঙ্গলায় ও অন্যান্য সম্প্রদামের একবার যবন জনপদ ছাড়া এবং কোন জনপদ নাই। যেখানে বাঙ্গলায় ও অন্যান্য সম্ভাব্য হইতে পারে না। কোনো

(বৌদ্ধ ভিক্ষু) ছিল। সিংহলের মহাবৎ্শ, দ্বীপবৎশ নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে জানা যায় অশোক পূর্বদিকে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশেও ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গলা দেশের সর্বত্রই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে বাঙ্গলার পূর্বতম প্রাচী সমতট্টেও বহু সঙ্গোরাম, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অশোক স্তুপ বিদ্যমান থাকা বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু অশোকের প্রচারের ফলে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম কতখান প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অন্যান্য জনপদের ন্যায় কলিঙ্গেও তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসন্দেহেও কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। আমরা দেখিয়াছি জৈন ধর্মেরই প্রাচান্য; সপ্তম শতকে সেখানে বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমরা পরে দেখিব অশোকের পূর্ববর্তী যুগেও কলিঙ্গে জৈন ধর্মের প্রভাবই বেশী ছিল। কলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গেও অশোকের প্রচারের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে বাঙ্গলার পূর্বতম প্রাচী সমতট্টে বহু বৌদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু দিগন্বর জৈনদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। সমতট্টের ন্যায় পুনৰ্বৰ্দ্ধনেও জৈনরাই ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। পূর্বে দেখিয়াছি গুপ্তযুগেও বাঙ্গলায় জৈনদের প্রভাব খুব বেশী ছিল এবং পুনৰ্বৰ্দ্ধন, কোটিবর্ষ, তাস্মিন্পি ও কর্বটি ছিল তাহাদের প্রধান কেন্দ্র।

সুখের বিষয়, অশোকের সময়েও পুনৰ্বৰ্দ্ধনে জৈনন্দের বিশেষ প্রভাব ছিল তাহার প্রমাণ আছে। দিব্যাবদান, অশোকাবদান, সুমাগধাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই জানা যায় অশোকের রাজত্বের সময়ে পুনৰ্বৰ্দ্ধনে নির্গৃহদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নির্গৃহ ও সন্দর্ভ (অর্থাৎ বৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। আমরা পরে দেখিব পুনৰ্বৰ্দ্ধন প্রভৃতি জায়গায় জৈন ধর্মের প্রসার অশোকের বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল।

এছলে বিশেষভাবে বলার কথা এই যে অশোকের রাজত্বকালে পুনৰ্বৰ্দ্ধনে শুধু যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, গোসাল মজ্জলিপুত্রের (খঃ পৃঃ ৫০০-৪৮৪) প্রবর্তিত আজীবিক ধর্মও এই সময়ে পুনৰ্বৰ্দ্ধনে প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নয়, দিব্যাবদানের একটি উপাখ্যান হইতে দেখা যায় সে সময়ে পুনৰ্বৰ্দ্ধনে আঠারো হাজারেরও বেশী আজীবিক ছিল। অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আজীবিক ধর্মের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণও আছে। একটি অনুশাসনে (Pillar Edict VII) অশোক বলিয়াছেন তিনি বৌদ্ধ,

জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপকারার্থ ধর্মমহামাত্রদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আমরা আরও জানি, অশোক খলতিক (গয়া জিলার অস্তর্গত বরাবর) নামক পর্বতে আজীবিকদের জন্য তিনটি গুহা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অশোকের পৌত্র দশরথও খলতিক পর্বতের নিকটেই নাগার্জুন নামক পর্বতে আজীবিকদের জন্য আরও তিনটি গুহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অতএব খঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে মগধে আজীবিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে পুনৰ্বৰ্দ্ধন প্রভৃতি বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানেও তাহাদের প্রতিপত্তি থাকা কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গলায় আজীবিক ধর্ম কখন প্রবেশ করিল এবং ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব কি সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করিব। এছলে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে পরবর্তীকালে আজীবিক ধর্ম কিরণপে ও কখন ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গলা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা নিঃসংশয়রূপে জানা যায় না। তবে আজীবিক সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে জৈন সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এরপ মনে করিবার পক্ষে কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

খঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে মৌর্য রাজবৎশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খঃ পৃঃ ৩২২-২৯৮) ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের চাইতে জৈন ধর্মই প্রবলতর ছিল বলিয়া মনে হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত নিজেও সন্তুষ্টঃ জৈনধর্মবলস্বী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতের অস্তর্গত সুদূর কর্ণত্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। জৈন-সাহিত্যে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত চরিশ বছর রাজত্বের পর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কর্ণটে চলিয়া যান এবং সেখানে বর্তমান মহাশূরের অস্তর্গত শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে জৈন ভিক্ষুরূপে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জৈন প্রবাদটি ঐতিহাসিকেরা অবিশ্বাস করেন নাই। যাহা হউক যে সময়ে জৈন ধর্ম সুদূর কর্ণট পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় একচ্ছত্র সন্দাতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল সে সময়ে ঐ ধর্ম যে মগধের প্রাচুর্যবর্তী বাঙ্গলা দেশেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, তাস্মিন্পি, কোটিবর্ষ, পুনৰ্বৰ্দ্ধন ও কর্বটি এই চারিটি স্থানের নামে জৈন সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা ছিল। এই সকল স্থানে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অশোকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত। কারণ আমরা দেখিয়াছি অশোকের রাজত্বকালেও পুনৰ্বৰ্দ্ধনে জৈন (এবং আজীবিক) ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএনসাঙ্গ-এর সময়েও পুনৰ্বৰ্দ্ধনে জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চাইতে প্রবলতর ছিল; সুতরাং অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হইবার

পূর্বেই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বাঙ্গা দেশে জৈন ধর্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মৌর্য বংশের পূর্ববর্তী মগধের নন্দরাজ বংশও খুব সম্ভবতঃ জৈন ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল (Oxford Hist., Smith, P.75)। আমরা কলিঙ্গ রাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি হইতে জানি নন্দবংশীয় কোনো রাজা কলিঙ্গ হইতে একটি জিন মূর্তি মগধে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই নন্দরাজ পুরাণের 'সর্বক্ষণাত্মক', 'একরাট' মহাপদ্ম নন্দ ব্যতীত আর কেহই নহেন। মহাপদ্ম নন্দই সম্ভবতঃ কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক হাতিগুম্ফা লিপির ঐ উক্তিটুকু হইতে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে মগধের নন্দরাজগণ জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সেই সময়ে জৈন ধর্ম বৈশালী ও মগধ হইতে সুদূর কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সেই সময়ে বাঙ্গাদেশও জৈন ধর্মের প্রভাবের বাহিরে ছিল না, এমন অনুমান করিতে পারি। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব এই অনুমান একেবারেই অমূলক নহে।

নন্দবংশের পূর্বে মগধের হর্ষক রাজবংশও জৈন ধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিল। এই বংশের সুবিখ্যাত রাজা বিষ্ণুসার (বা শ্রেণিক) এবং তৎপুত্র অজাতশত্রু (বা কুণিক) জৈন ধর্মের প্রবর্তক বৈশালীর বর্ধমান মহাবীরের সহিত ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন (Camb. Hist., P.157)। বিষ্ণুসার (খঃ পৃঃ ৫৪৩-৪১১) ও অজাতশত্রু (খঃ পৃঃ ৪১১-৪৫৯) ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। কারণ ইহাদের রাজত্বকালেই মগধের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ইহাদের রাজত্বকালেই বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ভারতবর্ষের এই তিনটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গ্রৌতমবুদ্ধ (জন্ম খঃ পৃঃ ৫৬৩, নির্বাণ খঃ পৃঃ ৫২৭, মৃত্যু খঃ পৃঃ ৪৮৩), জৈনধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর (জন্ম খঃ পৃঃ ৫৪০, কৈবল্য খঃ পৃঃ ৪৯৮, মৃত্যু খঃ পৃঃ ৪৬৮) এবং আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক গোসাল মংখলিপুত্র (কৈবল্য খঃ পৃঃ ৫০০, মৃত্যু খঃ পৃঃ ৪৮৪) ইহাদের রাজত্বকালেই নিজেদের ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুসার এবং অজাতশত্রু বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং উভয়ের প্রচারিত ধর্মের প্রতিই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয়। তবে অজাতশত্রু সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে জৈন ধর্মের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন (Camb. Hist., PP. 160-61, 163)।

অজাতশত্রুর পুত্র উদয় বা উদায়ীও (খঃ পৃঃ ৪৫৯-৪৪৩) সম্ভবতঃ জৈনধর্মবলাস্থীই ছিলেন (ঐ, পঃ ১৬৪)। অজাতশত্রু এবং তৎপুত্র উদয়ের সময় হইতেই জৈন ধর্ম বৌদ্ধধর্মের চাহিতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই হাতাহিয়া পড়িয়াছিল। অশোকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে জৈন ধর্মের প্রভাবই বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং এই সময়েই জৈন ধর্ম বাঙ্গাদেশে প্রাথম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। সুখের বিষয় এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। এছলে সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

বুদ্ধদেব নিজে কিংবা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যরা বাঙ্গাদেশে কখনও বিশেষভাবে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন এমন কোনো নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বাঙ্গাদেশ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই নাই বলিলে চলে। বাঙ্গাদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের এই নীরবতা ঐতিহাসিকদের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছে। বাঙ্গাদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে যে দুয়েকটি উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায়ের তিনি স্থলে বলা হইয়াছে এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ সুন্নদের (অর্থাৎ সুন্নাদের) সেদক বা সেতক নামক নিগমে (অর্থাৎ নগরে) বিহার করিতেছিলেন। তেলাপন্ত জাতকে আছে সুন্নরট্টে অর্থাৎ সুন্নারাষ্ট্রে দেসক নামক নিগমের নিকটবর্তী কোনো বনে বাস করিবার সময় ভগবান বুদ্ধ জনপদ কল্যাণী সুন্ন সম্বন্ধে শিষ্যদের নিকট একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। এই সেদক বা দেসক সম্ভবতঃ একই। এই দুইটি উক্তি হইতে মনে হয় বুদ্ধদেব কোনো সময়ে সুন্নদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ রাতে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বুদ্ধদেবের বাঙ্গাদেশে ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে বঙ্গীশ এবং উপসেন বঙ্গস্তপুত্র নামে দুইজন বৌদ্ধভিক্ষুর নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষের মনোরম পূরণী নামক টীকায় বঙ্গস্তপুত্র কথার অর্থ করা হইয়াছে বঙ্গস্ত ব্রাহ্মণের পুত্র। কিন্তু বঙ্গস্ত ব্রাহ্মণ বলিতে কি বোঝায় তাহা আমরা জানি না। সুতরাং বঙ্গীশ এবং বঙ্গস্তপুত্রের সঙ্গে বঙ্গদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অঙ্গুত্তরনিকায়ে সুবিখ্যাত ঘোষ জনপদের তালিকায় একবার মাত্র বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। অন্য সর্বত্র কিন্তু ঘোষ জনপদের তালিকায় বঙ্গের পরিবর্তে বংস অর্থাৎ বৎস জনপদের নাম দেখা যায়। তাহাতে মনে হয় অঙ্গুত্তরনিকায়ের তালিকায় ভ্রমক্রমে বৎসের পরিবর্তে বঙ্গ লেখা হইয়াছিল। অবশ্য এই সময়ে বঙ্গ জনপদ বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে বাঙ্গাদেশ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পর প্রথম দুয়োক শতাব্দীতে ঐ ধর্ম বাঙ্গাদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে জৈন সাহিত্যে বাঙ্গাদেশ খুব গৌরবের হ্রাস অধিকার করিয়াছে। ভগবতী নামক পঞ্চম জৈন আগমে যে বোলটি জনপদের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অঙ্গ ও বঙ্গের নামই সর্বাংগে উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন কি মগধের পূর্বে। এই তালিকায় রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নামও আছে। তাহার পর প্রজ্ঞাপনা নামক চতুর্থ জৈন উপাসনে ভারতবর্ষের আর্য অধিবাসীদিগকে নয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম ভাগে ক্ষত্রিয় জাতিগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম ভাগের মধ্যেই অঙ্গ (রাজধানী চম্পা), বঙ্গ (রাজধানী তাম্রলিপ্তি), কলিঙ্গ (রাজধানী কাথ্যনপুর) এবং রাঢ় (রাজধানী কোড়িবরিস অর্থাৎ কোটিবর্ষ) এই কয়টি জনপদের উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখিতেছি জৈন সাহিত্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং রাঢ় আর্য ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পাইয়াছে। তাহার পর আচারান্মসূত্র নামক প্রথম জৈন অঙ্গ হইতে জানা যায় রাঢ় দেশের তখন দুইটি ভাগ ছিল, একটি নাম সুত অর্থাৎ সুন্মাতৃমি ও অপরটির নাম বজ্রভূমি এবং এই রাঢ় দেশে দিগন্বর সম্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিবার সময় বর্ধমান মহাবীর বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত বজ্রভূমির একটি অংশের নাম ছিল পণ্ডিত (বা প্রণীতি) ভূমি। জৈন ভগবতী গ্রন্থের মতে এই পণ্ডিত ভূমিতে বর্ধমান মহাবীর ও গোসাল মঞ্জলিপুত্র ছয় বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থবির ভদ্রবাহ বিরচিত জৈন কল্পসূত্রের মতে বর্ধমান এখানে মাত্র এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় বর্ধমান নিজেই বাঙ্গাদেশে ধর্মপ্রচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে জৈন ধর্ম বাঙ্গায় বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গাল জনপদগুলি জৈন সাহিত্যে এতখানি মর্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে রাঢ় দেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল এবং ঐ ধর্মগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হইয়াছিল। রাঢ়ের অন্তর্গত সুন্মা জনপদে সেদক (বা দেসক) নগরের নিকটে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং রাঢ়েরই অন্তর্গত বজ্রভূমিতে (বা পণ্ডিত ভূমিতে) বর্ধমান ও গোসাল নিজেদের ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এই প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম হটিয়া গেল এবং জৈন ধর্ম জয়ী হইল বলিয়াই মনে হয় এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙ্গাদেশে সম্বন্ধে এমন নীরব ও জৈন সাহিত্য এদেশের আর্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এমন

সচেতন। রাঢ়ের অন্তর্গত যে বজ্রভূমিতে বর্ধমান ও গোসাল বাস করিয়াছিলেন সেই বজ্রভূমির অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিলাম জৈন প্রজ্ঞাপনার মতে রাঢ়ের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। কোটিবর্ষ ছিল আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। সুতরাং তৎকালে রাঢ়ের বিস্তৃতি ছিল দিনাজপুর পর্যন্ত। পক্ষান্তরে আধুনিক রাঢ়ের অন্তর্গত তমলুক বা তাম্রলিপ্তি ছিল তৎকালে বঙ্গের রাজধানী। যাহা হউক জৈন কল্পসূত্র হইতে দেখিতে পাই বর্ধমান সাধারণতঃ চম্পা, বৈশালী, মিথিলা, রাজগৃহ, শ্রাবণী প্রভৃতি জনপদের রাজধানীতেই বর্ষা কাটাইতেন। রাঢ়ের বেশায়ও যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে বলিতে হইবে কোটিবর্ষের নিকটবর্তী ভূখণ্ডই তখন বজ্রভূমি ও তদন্তর্গত পণ্ডিত ভূমি নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ বর্তমান দিনাজপুর জিলা তৎকালে পণ্ডিতভূমি বা বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে নিঃসংশয় রূপে কিছু বলিবার সাহস করা যায় না। কিন্তু যখন দেখি পরবর্তীকালে কোটিবর্ষের নামে জৈন সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছিল এবং পুনৰ্বদ্ধনে অনেক নির্গুহ ও আজীবিকের বসতি ছিল তখন মনে হয় যে পণ্ডিত (বা বজ্র) ভূমিতে বর্ধমান ও গোসাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় সে পণ্ডিতভূমি কোটিবর্ষের চতুর্দিকবর্তী ভূখণ্ড হওয়া বিচ্ছিন্ন নয়, বিশেষতঃ যখন পণ্ডিত বা বজ্রভূমি ও কোটিবর্ষ উভয়ই রাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে বাঙ্গাদেশে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেরই প্রচার আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম হারিয়া যাওয়াতে জৈনধর্মই সম্ভবতঃ প্রাধান্য লাভ করে। এছলে স্বভাবতই প্রশ্ন মনে জাগে আজীবিক ধর্মের কি গতি হইল? আজীবিক সম্প্রদায়ের কোন স্বতন্ত্র সাহিত্য পাওয়া যায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রসাদে আমরা জানি গোসাল মঞ্জলিপুত্র নালন্দায় বর্ধমান মহাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তদবিধি কিছুকাল তিনি বর্ধমানের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং গোসাল মহাবীরের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। তিনি বর্ধমানের দুই বৎসর পূর্বেই (খৃষ্ট পূর্ব ৫০০) কৈবল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ ৩ ॥

আজীবিকরাও নির্গুহের মত দিগন্বর সম্যাসী ছিল। তবে তাহারা প্রত্যেকেই হাতে একটি করিয়া মন্ত্র অর্থাৎ বাঁশের লাঠি ধারণ করিত। এই

জন্য তাহাদিগকে মন্ত্রী বলা হইত (পাণিনি ৬.১.১৫) এবং এই জন্যই গোসালকে বৌদ্ধ এবং জৈনরা মন্ত্রীপুত্র বা মঙ্গলিপুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। আজীবিকরা জ্যোতিষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধর্মত ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে আজীবিক ও নির্গৃহ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল (Camb. Hist., P.162)। যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি বর্ধমানের সঙ্গে গোসালও অনেকদিন রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অনুমান করা যায়, তিনি রাঢ় দেশেও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গাদেশে আজীবিক ধর্মের প্রসারের কিছু কিছু প্রমাণও আছে। যথা, জৈন আচারাদ্যসূত্র হইতে জানি বর্ধমান যখন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তিনি সেখানে অনেক ঘষ্টিধারী সন্ন্যাসী দেখিতে পান। কোন কোন পঞ্চিত মনে করেন এই ঘষ্টিধারী সন্ন্যাসীরা আজীবিক। বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা স্থানে আজীবিক সন্ন্যাসী উপক এবং ব্যাধ কন্যা চাঁপা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। এই গল্প হইতে জানা যায় বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গে আজীবিক ধর্ম বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। গল্পটি সংক্ষেপে এই :- মগধরাজ্যে বোধগয়ার নিকটে নাল বা নালক গ্রামে উপকের জন্ম হয়। তাহার গায়ের রঙ কালো ছিল বলিয়া তাহাকে ‘কালো উপক’ বলা হইত। একদা উপক গায়া হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে বক্ষহার (বাঁকুড়া?) জনপদে (সরসথ জোতিকার মতে বঙ্গ জনপদে) পোঁছিয়া একটি ব্যাধের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্যাধজ্যেষ্ঠ তাহাকে মাংসরস দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া নিজের গ্রহে স্থান দিল। ব্যাধ একদিন পুত্র ও ভ্রাতাকে লইয়া শিকারে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় নিজকন্যা চাঁপার উপর আজীবিক সন্ন্যাসীর পরিচয়ীর ভার দিয়া গেল। সন্ন্যাসী কিন্তু ব্যাধ কন্যার রূপে মুঞ্চ হইয়া তাহাকে লাভ না করা পর্যন্ত অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুপণ করিলেন। ব্যাধ শিকার হইতে ফিরিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আজীবিক সন্ন্যাসী উপকের সহিত চাঁপার বিবাহ দিল এবং উপক ব্যাধের শিকারের মাংস বহন ও বিজ্ঞয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। সংবৎসরাত্তে উপকের সুভদ্র নামে এক পুত্র জন্মিল। একদা পুত্র সুভদ্রা কাঁদিতে থাকিলে চাঁপা ‘ওরে আজীবিকের পুত্র’ ওরে মাংসবাহীর পুত্র, কাঁদিস নে’ বলিয়া সুর করিয়া তাহার কান্না থামাইয়াছিলেন। এই কথাগুলি শুনিয়া উপকের মনে অত্যন্ত ধিক্কার উপস্থিত হইল এবং তিনি কোন অনুনয় বিনয় না শুনিয়া বক্ষহার জনপদ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যদেশে চলিয়া গেলেন এবং শ্রাবণ্তীর নিকটে জেতবনে পোঁছিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। চাঁপাও ইহার অন্তিকাল পরেই পুত্রকে নিজ পিতার নিকট রাখিয়া শ্রাবণ্তীতে গিয়া বৌদ্ধসঙ্গে যোগ দেন এবং ভিক্ষুগীদের মধ্যে বিশেষ

প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাহার রচিত গাথা বৌদ্ধ থেরী গাথা সমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে এবং আজও আমরা তাহা পাঠ করিতে পারি।

যাহা হউক এই গল্পটি হইতেও বোঝা যায় মগধে এবং বক্ষহার জনপদে তৎকালে আজীবিকের অভাব ছিল না। বক্ষহার জনপদ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না; ইহা বাঁকুড়ার প্রাচীন নাম হইতে পারে। তবে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই জনপদটি মগধের পূর্বদিকে এবং মধ্যদেশের বহির্ভূক্ত সুতরাং বাঙ্গাদেশের অস্তর্ভুক্ত ছিল। যাহা হউক আমরা দিব্যাবদান গ্রন্থ হইতে নিঃসংশয়ে জানি অশোকের সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের সহিত আজীবিক ধর্মের প্রবলু প্রতিযোগিতা চলিতেছিল এবং তৎকালে পুণ্ড্রবর্ধনে আজীবিকদের সংখ্যা অন্ততঃ আঠারো হাজার ছিল বলিয়া ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি খঃ পৃঃ পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ হইতে তৃতীয় শতকে অশোকের রাজত্বের সময় পর্যন্ত এই কিঞ্চিদবিক দুই শত বৎসর কাল বাঙ্গাদেশে জৈন ও আজীবিক ধর্মের প্রাধান্যই চলিতেছিল। অশোক এবং তৎসৌত্র দশরথ আজীবিকদিগকে বরাবর ও নাগাভূনি পর্বতে (উভয়টিই গয়া জিলায়) যে ছয়টি গুহা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমার পূর্বেক্ষণ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। অতএব দেখিতেছি অশোকের পূর্ববর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া কঠোর প্রতিযোগিতার ফলে বৌদ্ধধর্মই হাটিয়া গিয়াছিল এবং জৈন ও আজীবিক ধর্মই টিকিয়া ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিল, জৈন ধর্মও আভ্যরণ্তা করিয়া রহিল। কিন্তু আজীবিক ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া গেল। পূর্বে একটু আভাস দিয়াছি যে, আজীবিক ধর্ম কালক্রমে জৈন ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। আজীবিক সম্প্রদায় ও দিগন্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মত ও অনুষ্ঠানগত নানাপ্রকার সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়ার বিশেষ বাধা ছিল না। এই দুই সম্প্রদায়ে যে কালক্রমে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল এই অনুমানের পক্ষে দু'একটি প্রমাণও আছে। প্রথম প্রমাণ দিব্যাবদান। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই একই ঘটনা প্রমাণও আছে। প্রথম প্রমাণ দিব্যাবদান। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই একই ঘটনা প্রমাণও আছে। প্রথম প্রমাণ দিব্যাবদান। এই ঘটনার সময়েই নির্গৃহ ও আজীবিকের পার্থক্যটা তৃতীয় পক্ষের নিকট অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে বলিয়াছি দিগন্বর আজীবিকেরা জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। জাতকের প্রমাণ হইতে জানা যায় বুদ্ধের জীবিত কালেই আজীবিকরা জ্যোতিষী করিয়া বেড়াইত। দিব্যাবদানের মতে চতুর্থগুণের

পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় পিদলদাস নামে এক আজীবিক জ্যোতিষী ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএনসাঙ্গ-এর সময়ে নির্গৃহ অর্থাৎ জৈনরাই জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল (Beal II. P.168)। ইহাতেও মনে হয় আজীবিক সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেই মিশিয়া গিয়াছিল। যদি এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে হিউএনসাঙ্গ বাঙ্গালার নানা স্থানে বিশেষতঃ পুনৰ্বৰ্দ্ধনে যে নির্গৃহদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহারা বস্তুতঃ নির্গৃহ ও আজীবিক এই দুই দিগন্বর সম্প্রদায়ের মিলিত সম্প্রদায়ের তৎকালীন প্রতিনিধি।

আমরা বাঙ্গালাদেশের ধর্ম সম্প্রদায়গুলি ইতিহাস অনুসরণ করিতে করিতে খঃ পঃ পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছি। বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের আরম্ভ এইখানেই। ইহাদের ইতিহাসকে আর পেছেনে লইয়া যাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্মের আরম্ভ তো এইখানে নয়। এই ধর্মের ইতিহাসকে তো আরও অনেক শতাব্দীর মধ্য দিয়া অনুসরণ করা হয়। তাই এছলে মনে প্রশ্ন জাগে, যে সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম বাঙ্গালাদেশে প্রাথম্য লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় ব্যাপ্ত ছিল সে সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্ম কি করিতেছিল? সেই সময়ে কি এই বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্ম বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই? এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

বিদেহ, অঙ্গ ও মগধ পূর্ব ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। সুতরাং মধ্যদেশের বৈদিক আর্য প্রভাব স্বভাবতঃ এই তিনটি জনপদের উপরেই সর্বাগ্রে পড়িয়াছিল। বাঙ্গালায় আর্য সভ্যতা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে আসার কথা। সুতরাং এই তিনটি জনপদে আর্য সভ্যতা কখন ও কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল সংক্ষেপে তাহা দেখা দরকার। শতপথব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় এক সময়ে সদানীরা (অর্থাৎ গণু) নদীর পূর্ববর্তী বিদেহ জনপদে আর্য বসতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু ব্রাহ্মণ এই জনপদে আর্য সভ্যতা ও ধর্মের প্রতীকস্থরূপ যজ্ঞগ্রন্থ প্রজুলিত করিয়াছিলেন। মিথিলার সন্দ্রাট জনকের রাজত্বকালে বিদেহ আর্য সভ্যতা ও ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত। সন্দ্রাট জনক ছিলেন বুদ্ধদেবের (খঃ পঃ ৫৬৩-৪৮৩) দুই পুরুষ পূর্ববর্তী। সুতরাং জনক খঃ পঃ সপ্তম শতকের শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এই সময়ে বাঙ্গালাদেশের অব্যবহিত পশ্চিম সীমায় আর্যদের সভ্যতা ও ধর্মের শিখা অতি উজ্জ্বলভাবে জুলিতে ছিল। কিন্তু তথাপি পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্রে দেখি বিদেহ একটি মিশ্রজাতির নাম। অর্থববেদ অঙ্গ ও মগধকে

আর্য সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অঙ্গ বৈরোচন নামে অঙ্গ রাজের অশ্বমেথ যজ্ঞ ও দানশীলতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐতরেয়ব্রাহ্মণের সময়ে (খঃ পঃ অষ্টম শতক) অঙ্গে অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রাপ্তেই আর্য বৈদিক ধর্ম রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অথচ ঐ ব্রাহ্মণ গ্রহেই পুনৰ্দিগকে দস্যু অর্থাৎ অন্যার্য বলা হইয়াছে এবং বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অঙ্গদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তারপর যজুর্বেদে দেখিতে পাই পুরুষমেথ যজ্ঞের সময় মগধের অধিবাসীদিগকে ধরিয়া বলি দেওয়া হইত। অর্থববেদে মগধকে আর্য গণ্ডীর বহির্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই বেদেই মগধকে ব্রাত্যদের অর্থাৎ বিধর্মীদের কেন্দ্র বলা হইয়াছে। আরও পরবর্তী সময়ে দেখি ব্রাত্য হোম। যজ্ঞের দ্বারা মগধবাসী ব্রাত্যদিগকে আর্যধর্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা ও হইয়াছে। কিন্তু তখনও মগধের ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অপ-ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরাণেও তেমনি বিষ্ণুর, অজাতশক্ত প্রভৃতি বিখ্যাত মগধের রাজাদিগকেও ক্ষব্রহ্মু অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা অপ-ক্ষত্রিয় বলিয়া তুচ্ছ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কৌষিতকী সংজ্ঞানক আরণ্যকে মধ্যম ও প্রাতীবোধী পুত্র নামক দুইজন মগধবাসী ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। উক্ত সংজ্ঞানক আরণ্যক গ্রহস্থানি খঃ পঃ ষষ্ঠ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। আবার বৌধায়নের ধর্মসূত্রে মগধবাসীদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্য হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা যাইতে পারে যে খঃ পঃ ষষ্ঠ শতকে আর্যরা বিদেহ, অঙ্গ ও মগধে অল্পবিষ্ট বসতি স্থাপন করিয়াছিল বটে এবং এই তিন জনপদের অধিবাসীরা এই সময়ে আর্যদের সভ্যতা ও ধর্মমাত্র আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ইহারা মধ্যদেশবাসী আর্যদের দ্বারা ‘ব্রহ্মবন্ধু’, ‘ক্ষত্রিয়’ বা ‘সংকীর্ণ যোনি’ প্রভৃতি মিশ্রত্বোধক বিশেষণে অভিহিত হইয়াছিল।

বিদেহ, অঙ্গ ও মগধে আর্যরা আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খঃ পঃ ষষ্ঠ শতকের বহুপূর্ব হইতেই এমন কি মাথৰ বিদেশের পূর্বেও বিদেহে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিত বলিয়া শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায়। তৎপরে মাথৰ বিদেশ ও তাঁহার পুরোহিত গৌতম রাজগণ, অঙ্গ বৈরোচন ও তাঁহার পুরোহিত উদময়, রাজবৰ্ষি জনক ও ব্ৰহ্মজল খায় যাজগ্রহণ মগধবাসী ব্রাহ্মণ মধ্যম ও প্রাতীবোধীপুত্র, ইহারা সকলেই খঃ পঃ অষ্টম হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিদেহ, অঙ্গ ও মগধ জনপদে সস্মানে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করা দরকার যে বৌধায়নের ন্যায় অত্যন্ত গৌড়া পশ্চিম ও ঐসব জনপদে আর্যদের

বাস নিষিদ্ধ বলেন নাই। অথচ খঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকেও এইসব জনপদের (এমন কি বিদেহেরও) আসল অধিবাসীরা মধ্যদেশের ধর্মনিষ্ঠ আর্যদের নিকট হইতে ব্রহ্মবন্ধু, ক্ষত্রিয়, সংকীর্ণ যোনি প্রভৃতি অবজ্ঞা সূচক বিশেষণই লাভ করিতেছিল।

সুতরাং যে সময়ে বিদেহ, মগধ ও অঙ্গের অধিবাসীরাই মাত্র আংশিকভাবে আর্য সভ্যতা ও আর্য ধর্ম প্রচল করিয়াছিল এবং যে সময়ে ইহারা ধর্ম ও সভ্যতাভিমানী আর্যদের নিকট শুধু অবজ্ঞাই লাভ করিতেছিল সেই সময়ে অর্থাৎ খঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকে বিদেহ-মগধ অঙ্গের পূর্ববর্তী বাঙ্গাদেশে যে আর্যদের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই একথা সহজেই অনুমান করা যায়। আর্যদের মধ্যে কেহ কেহ কিছী অনেকেই হয়তো এই সময়ে বৈচিত্র্য ও নৃতনত্বের আকর্ষণে অথবা 'ক্ষুণ্ডয়ের' তাড়নায় (যেমন হরিবংশ হইতে জানা যায়) বিদেহ ও অঙ্গের পূর্ব সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গাদেশে প্রবেশ করিতেছিল, কেহ কেহ হয়ত বাঙ্গালা জনপদগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল (যেমন বৌধায়ন হইতে মনে হয়), আবার কেহ কেহ বা ঐসব জনপদে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিতেছিল। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে খঃ পৃঃ অষ্টম হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত আর্যরা যদি বাঙ্গাদেশে প্রবেশ করিয়াও থাকে তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি এত নগণ্য ছিল যে ঐ সময়ে বাঙ্গাদেশে আর্য সভ্যতা ও ধর্ম যথেষ্ট পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না। বস্তুতঃ খঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকে বাঙ্গাদেশে বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এমন কথা মনে করিবার অনুকূল কোন প্রমাণ বৈদিক আর্য সাহিত্যে নাই।

অথচ মনে রাখিতে হইবে ঐ ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগেই হর্ষকরাজ বিস্মার, গোতম বুদ্ধ, বর্ধমান মহাবীর, গোসাল মজ্জালিপুত্র প্রভৃতির আবির্ভাব এবং শেষোন্ত তিন জনের প্রচারিত বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের অভ্যন্তর হইয়াছিল। বৈদিক ধর্মাভিমানী আর্যরা বিদেহ, অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে যে অবজ্ঞা করিতেন বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম তাহারই প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন কিনা ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য। এছলে আমাদের পক্ষে সে আলোচনায় প্রযুক্ত হওয়া নিঃপ্রয়োজন। যাহা হউক, আমরা যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিলাম তাহা হইতে একথা স্পষ্টই প্রতিপন্থ হইতেছে যে সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম বাঙ্গাদেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় সে সময়ে এ দেশের আর্যরা সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও বৈদিক আর্য ধর্ম কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। অর্থাৎ কার্যতঃ বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মই বাঙ্গাদেশে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে নাই। সুতরাং জৈন ও আজীবিক ধর্মেরই নাম করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথম দুই শতাব্দীকালে বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গাদেশে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে নাই। সুতরাং জৈন ও আজীবিক ধর্মকেই বাঙ্গালা আদিধর্ম বলিয়া স্থীকার করিতে হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি পরবর্তীকালে আজীবিক ধর্ম সংস্কৃতঃ জৈন ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউগ্রনসাঙ্গ বাঙ্গাদেশে আজীবিক সম্প্রদায় দেখিতে পান নাই, কিন্তু নির্গমিতদের যথেষ্ট

এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে আরও প্রমাণ আছে, সংক্ষেপে সেগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে অথচ ঐ দুই জনপদে আর্যদের প্রবেশ কিংবা বাস নিষিদ্ধ করেন নাই। আমরা অন্য প্রমাণ হইতেও দেখিয়াছি সে সময়ে অঙ্গ ও মগধে আর্যরা সমস্মানে বাস করিত। কিন্তু বৌধায়নের এই ধর্মসূত্রেই বঙ্গ জনপদকে শুধু যে আর্যবর্তের বহির্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নয়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনপদে আর্যদের প্রবেশই অবাঙ্গানীয় বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ এই দুই জনপদে প্রবেশ করে তাহা হইলে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রায়শিকভাবে করিয়া শুন্দ হইতে হইবে, এমন বিশেষ ব্যবস্থা এই গ্রহে আছে। এই গ্রহখানি খুব সন্তুষ্ট খঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকের (সুতরাং বুদ্ধ, মহাবীর এবং গোসালেরও) পরবর্তী সময়ে রচিত। সুতরাং ঐ সময়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। তবে একথা ঠিক যে বঙ্গ ও কলিঙ্গে গিয়া প্রত্যাবর্তনের পর প্রায়শিকভাবে ব্যবস্থা এই গ্রহে থাকিলেও অনেকেই ওই দুই জনপদে গিয়া কখনও প্রত্যাবর্তন করিত না, ওই দুই জনপদে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিত। কারণ খঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে সন্নাট অশোকের অনুশাসন হইতেই আমরা জানি তাঁহার রাজত্বকালে (খঃ পৃঃ ২৭১-২৩২) বৌধায়নের বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কলিঙ্গেও বহু ব্রাহ্মণের বসতি ছিল এবং তাঁহার সাম্রাজ্যভূক্ত কোন জনপদেই, সুতরাং বঙ্গেও, ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি বঙ্গ সন্নাট পুষ্যমিত্রের (খঃ পৃঃ ১৮৫-১৪৯) পুরোহিত মগধবাসী বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি তাঁহার সুবিখ্যাত মহাভাষ্য গ্রন্থে বাঙ্গালা জনপদগুলিকে আর্যবর্তের বহির্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। অবশেষে আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মনুসংহিতায় দেখিতে পাই বাঙ্গাদেশ আর্যবর্তের মধ্যবর্তী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সুতরাং এ বিষয়ে সদেহ করা চলে না যে বাঙ্গাদেশে বৈদিক আর্ধধর্ম বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের পরে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গাদেশে সর্বপ্রথমে ভারতীয় কোন ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মেরই নাম করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথম দুই শতাব্দীকালে বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গাদেশে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে নাই। সুতরাং জৈন ও আজীবিক ধর্মকেই বাঙ্গালা আদিধর্ম বলিয়া স্থীকার করিতে হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি পরবর্তীকালে আজীবিক ধর্ম সংস্কৃতঃ জৈন ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউগ্রনসাঙ্গ বাঙ্গাদেশে আজীবিক সম্প্রদায় দেখিতে পান নাই, কিন্তু নির্গমিতদের যথেষ্ট

প্রভাব দেখিয়াছিলেন, সুতরাং খঃ পৃঃ পঞ্চম শতকে বর্ধমান মহাবীরের সময় হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএনসাঙ্গ-এর সময় পর্যন্ত এইবার শত বৎসর জৈন ধর্ম বাংলাদেশে সফলতার সহিত নিজের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু হিউএনসাঙ্গ-এর পরে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে এবং শাস্তিরক্ষিত, দীপকর প্রভৃতি শক্তিশালী ও সুবিখ্যাত বৌদ্ধ প্রচারকদের প্রভাবকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মই প্রথান স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং জৈনধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইতে হইতে অবশেষে বাংলাদেশে হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।<sup>১</sup> বাংলা হইতে জৈন ধর্মের বিলোপের ইতিহাস খুবই ঔৎসুক্যকর। কোন কোন কারণে এবং কিভাবে এই প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ধর্মটি বাংলাদেশ হইতে একেবারেই অস্তর্হিত হইয়া গেল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

## বঙ্গদেশে জৈনধর্ম ক্ষিতিমোহন সেন

॥ ১ ॥

ব্রান্দগ্যাত্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারার্থ নিঃস্থার্থভাবে বিদেশ যাত্রা। বাংলাদেশ হইতে অতি প্রাচীনকালে বহু জৈন ও বৌদ্ধ গুরু নানা দেশে গিয়াছেন। বাংলাদেশ যে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা। পুরাতন কথা-সাহিত্য, গ্রহকার্য, মূর্তি, মন্দির প্রভৃতি সবই তাহার সাক্ষী। এখনও বাংলার এই বৌদ্ধ মূর্তির ও মন্দিরের নানা অবশেষ মেলে। চীন পর্যটিক সাধক প্রভৃতিরাও তাহার সাক্ষ্য দেন। সেই বৌদ্ধদেরও পূর্বে বাংলাদেশ ছিল জৈন ধর্মের ভূমি। বিশেষ করিয়া পুনৰ্বৰ্দ্ধন অর্থাৎ উন্নতবঙ্গে ছিল জৈনদেরই প্রাধান্য। পাহাড়পুরও একটি জৈনস্থান পূর্বেই ছিল।

পুনৰ্বৰ্দ্ধনে জৈন বা নির্গৃহদের বাস্থল্যের সাক্ষ পাওয়া যায় দিব্যাবিদান গ্রহে। তাহাতে আছে অশোক যখন চড়াশোক ছিলেন তখন পুনৰ্বৰ্দ্ধনে নির্গৃহ উপাসকেরা একটি পট আঁকিয়া বৌদ্ধধর্মের অবমাননা করায় ১৮,০০০ আজীবকদের হত্যা করা হয়। নির্গৃহ অর্থেই আজীবক বলা হইয়াছে তাহা বুঝাই যায়। তবে দেখা যায় তখন হত্যার উদ্দেশ্যে পুনৰ্বৰ্দ্ধনে ১৮,০০০ নির্গৃহ বা জৈন পাওয়া গিয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত অশোকাবিদানে গঞ্জিটির একটু ভিন্ন আকার। একজন নির্গৃহ আচার্য বুদ্ধকে নির্গৃহের পাদমূলে পতিত এইভাবে চিত্রিত করিয়া পুনৰ্বৰ্দ্ধনে চারিদিকে পুঁচার করিয়া দেন। অশোক শুনিয়া বলিলেন, “যে ঐ আচার্যের মুণ্ড আনিবে তাহাকে পুরুষার দিব।” একজন আভীর লোভবশতঃ বীতশোককেই সেই নির্গৃহ আচার্য মনে করিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া লইয়া আসিল। অনুতপ্ত অশোক গুরু উপগৃহের কাছে সাম্ভুনা চাহিলেন।<sup>১</sup>

ক্রমে জৈন ধর্ম বাংলাদেশে ক্ষীণ হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হইতে লাগিল। বৌদ্ধযুগেও জৈনধর্ম নিঃশেষিত হয় নাই। হয়েনসাঙ্গ বহু জৈন ও আজীবককে তখন বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন। আসলে বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে জৈন ও আজীবকদের মধ্যে পার্থক্য খুব কম। ভগবতীসূত্র মতে পুনৰ্বৰ্দ্ধন মহাপদ্ম

১. বাংলা দেশ হইতে জৈন ধর্ম যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই এবং সরাকদের মধ্যে এই ধর্ম ক্ষীণবল হইলেও জীবিত ছিল তাহা এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি। সরাকদের সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন।

১. Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, ১৮৮৩, পৃ. ১১।

ছিলেন আজীবকদের ভক্ত। আজীবক ও নির্গৃহ জৈনদের মধ্যে এত মিল ছিল যে এই দুই নামে প্রায়ই গোলমাল হয়। বাংলাদেশে আজীবক ও নির্গৃহ (জৈন) উভয় সম্প্রদায়েরই প্রাদুর্ভাব ছিল।

বাংলাদেশেরই পাশে হিমালয়ের পাদমূলে শাক্য রাজ্য বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি। তাহারও পূর্বে জৈন সাধনাও যে বাংলার আশে পাশেই গড়িয়া উঠিতেছিল, বহুদিন বিদেশী পণ্ডিতের দল তাহার সন্ধান রাখেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত ‘নির্গৃহ নাতপুত’ আর কেহ নহেন, তিনি জৈন মহাগুরু মহাবীর। তাঁহাদের মতে অতি পুরাতন নির্গৃহ সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সাধনাকে বিশুদ্ধ ও যুগোপযোগী করিয়া বর্দ্ধমান মহাবীর এই ধর্মের পত্তন করিলেন।

ইহাদের ধর্ম অতি প্রাচীন হইলেও ইহাদের শাস্ত্র বহুকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। অনেক কাল পরে তাহা লিপিবদ্ধ হয়। অনেকের মতে বৌদ্ধ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইবার পরে জৈনদের শাস্ত্রগুলি লিখিত হইতে আরম্ভ হয়।

এই জৈন ধর্মের ধারা অতি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন এই ধারা বেদ হইতেও প্রাচীন।<sup>১</sup>

ইহাদের আদি শাস্ত্র হইল চতুর্দশ ‘পূর্ব’ বা প্রাচীনতত্ত্ব। তীর্থংকর মহাবীর আপন শিষ্যগণকে এই শাস্ত্রে শিক্ষা দেন। কোনো কোনো মতে তাহারা ছয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে আচার্য ভদ্রবাহু হইলেন জৈন সঙ্গের গণনায়ক। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ার সূচনা দেখিয়া ভদ্রবাহু সঙ্গের এক ভাগ লইয়া কর্ণটকের দিকে গেলেন। সঙ্গের বাকি ভাগ দেশেই রহিল। তাহার নেতা হইলেন আচার্য শুলভদ্র।

ভদ্রবাহু সমগ্র শাস্ত্র অর্থাৎ চতুর্দশ পূর্ব যথাযথভাবে জানিতেন। তিনি বিদেশে গেলে শাস্ত্র ঠিকমত রক্ষা করা কঠিন হইল। তাই শুলভদ্রের নায়কত্বে পাটলিপুত্রে মহাসভা আহত হইল। চতুর্দশ পূর্ব হইতে এগারটি অঙ্গ সংগৃহীত হইল, আর নানা স্থানের নানা প্রকীর্ণ অংশ জুড়িয়া দ্বাদশ অঙ্গ পুরা করিয়া দেওয়া হইল। এই জোড়া-তাড়া দ্বাদশ অঙ্গ লইয়া প্রচণ্ড মতভেদ সুরু হইল।

দুর্ভিক্ষ হেতু দক্ষিণদেশে পরিবজনরত ভদ্রবাহু কর্ণটকে শ্রবণবেলগোল তীর্থে মারা গেলেন। ক্রমে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে ভদ্রবাহুর দল দেশে ফিরিল। মধ্যে এত বড় একটা যে দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ গেল,

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ.৮১।

সেইজন্য ও বহুদিন পরস্পর হইতে দূরে থাকা প্রভৃতি অন্যান্য নানা কারণে ভদ্রবাহু ও শুলভদ্রের দলে অনেক প্রভেদ দেখা গেল। ভদ্রবাহুর অনুচরেরা তখনও দিগন্বরত প্রভৃতি সম্মানশালীর প্রাচীন সব বিধি পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছিলেন; কিন্তু শুলভদ্রের অনুচরেরা তখন খেতবন্ধ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাই তাঁহারা শ্রেতাম্বরী আখ্যা পাইলেন। ভদ্রবাহুর দিগন্বর অনুচরেরা শুলভদ্র চালিত পাটলিপুত্র মহাসভায় শ্রেতাম্বরদের সংগৃহীত শাস্ত্রকে স্থীকার করিতে চাহিলেন না। এই যে দিগন্বর ও শ্রেতাম্বরদের মধ্যে বিরোধ, তাহা আজও মিটিল না। এখন তীর্থে তীর্থে ইহাদের বিরোধ জাগিয়াই আছে। সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পর্বতের জন্য উভয় দলের মামলা-মোকদ্দমায় যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহাতে রৌপ্যময় এক পার্শ্বনাথ পর্বত তৈয়ার করা যাইত। কিছুদিন পূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রাজস্থানের কেসরিয়াজী তীর্থে একটি পুরাতন ধ্বজা সংস্কার উপলক্ষে উভয়দলের দাঙ্গায় কত লোক প্রাণ হারাইল।

শ্রেতাম্বরদের যে দ্বাদশ শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল ক্রমে তাহাও নষ্ট ও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আদিভাগে রাজা ধ্রুব.....আচার্য ক্ষমাশ্রমণ নামেও তিনি অভিহিত।

তখন এগারটি অঙ্গ মাত্র প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ অঙ্গটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা তখনও লোকের স্মরণে ছিল তাহা পুনরায় সংগৃহীত ও লিখিত হইল এবং যথাযথভাবে রক্ষা করা হইল। ইহার পর হইতে শ্রেতাম্বর জৈনশাস্ত্র সেইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে জৈন মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। বাঁকুড়া, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার অর্থাৎ রাঢ়দেশে জৈন মূর্তি সর্বত্র পাওয়া যায়। পুরালিয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে ছুরুরা গ্রামে ১৯১৮ সালে চৰ্নীবাবু ও ডাক্তার এ. জি. ব্যানার্জী শাস্ত্রী অনেকগুলি মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। দামোদর নদীর ধারে বাঁকুড়ার শেষ সীমায় তেলকুপী গ্রামে খুব বিরাট বিরাট জৈনমূর্তি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হয়তো সেখানে কোনো জৈন বিহার বা তীর্থস্থান ছিল। মানভূম পাতকুমে নদীতীরে দেখা যায় চারিদিকে শুধু পাষাণ মূর্তি। তাহার মধ্যে অধিকাংশই হইল জৈন তীর্থংকরদের।

পঞ্চকোট রাজ্য অনেক জৈনমূর্তি হিন্দু দেবতারাপে পূজিত, তাহার পূজক সব ব্রাহ্মণ। অথচ কোনো কোনো মূর্তির নীচে জৈন লেখ সব বর্তমান। স্বর্গায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইজন্য দুই একটি মূর্তি যে সরাইয়া লইয়া

আসিয়াছিলেন সে গল্প তাঁহার কাছেই শুনিয়াছি। তবু তিনি জৈন মূর্তির অল্পতাই লক্ষ্য করিয়াছেন।<sup>৩</sup>

অনেক স্থানে এইসব মূর্তি ভৈরব নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও বা এইসব জৈনমূর্তির কাছে এখন পশু বলিও দেওয়া হয়। প্রবাসী-সম্পদাদক শ্রীরামানন্দ বাবুর কাছেও তাঁহাদের দেশের বহু জৈনমূর্তির কথা শুনিয়াছি।

৬২ অন্দে (কোন্ অন্দে?) রাঢ়ের জৈন সাধুর অনুরোধে মথুরাতে জৈন মূর্তি স্থাপিত হয়।<sup>৪</sup>

৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি জৈন লেখ ও কিছু প্রস্তর মূর্তি পাহাড়পুরে পাওয়া গিয়াছে।<sup>৫</sup>

বটগোহালী বিহারে অর্হতদের মন্দিরে ধৃপদীপার্থ এক ব্রাহ্মণ দম্পতি ভূমি দান করিতেছেন দেখা যায়। এই বিহারপতি ছিলেন নির্ণিত গুরু গুহনন্দী।<sup>৬</sup>

পাহাড়পুরকে জৈন ধর্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হয়।<sup>৭</sup>

বাংলাদেশে প্রাপ্ত জৈনমূর্তির অধিকাংশই দিগন্বর সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশে জৈনমূর্তি নির্মাণের প্রাণালীও একটু স্বতন্ত্র। হয় তো তাঁহাদের ধ্যান ও বিধির কিছু বিশেষত্ব ছিল। (প্রমোদলাল পাল, ইন্ডিয়ান কালচার, ভাগ ৩, পৃঃ ৫২৯-৫৩০।) এখানে জৈন মূর্তিগুলির মধ্যে পালযুগের শিল্প প্রভাবই লক্ষিত হয়।

‘বসন্ত বিলাস’ মতে দেখা যায় চালুক্য রাজা বীর খ্বলের মন্ত্রী বসন্ত পালের তীর্থ্যাত্মা সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে সব সংঘপতি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেউ গৌড়বঙ্গের সংঘী বা সংঘপতিও ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বাংলাতে রীতিমত জৈন সংঘ ছিল। পাহাড়পুর বিহার পূর্বে ছিল জৈন বিহার, পরে হয় বৌদ্ধদের।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মল্লিকার্জুন সূরি গণপতি বিষ্ণু প্রভৃতির নমস্কার করিলেও নামেই বুঝা যায় জৈন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি বাংলা দেশে জীবিত ছিলেন।<sup>৮</sup>

৩. Eastern Indian School of Medieval Sculptures, পৃ.১১।

৪. J.A.S.B., ভাগ ৫, পৃ.২৩৯।

৫. Modern Review, ১৯২৮, খন্দ ১, পৃ.৫০২; Annual Report of Archaeological Survey of India, ১৯২৫-২৬, পৃ.১১০। Indian Historical Quarterly (১৯৩১), পৃ.৪৩৯-এর উদ্ধৃতি অনুসারে।

৬. Epigraphia Indica, ভাগ ২০, পৃ.৩৯।

৭. B. Sarkar, Indian Historical Quarterly, ১৯৩১, পৃ.৮৮।

৮. এই, পৃ.৫২৮।

১০১ রাঢ়দেশ ছাড়াও বরেন্দ্রভূমিতে এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে বিস্তুর জৈনমূর্তি পাওয়া যায়। এমন কি সুন্দরবনের মধ্যেও কাঁটাবেড়ে গ্রামে এক পার্শ্বনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কুলপী থানার অন্তর্গত ঘটেশ্বরী গ্রামে আদিনাথের মূর্তি ও মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের ২৪নং লাটের মধ্যে ও জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় সুন্দরবনে প্রাপ্ত দশটি জৈনমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>৯</sup> সুন্দরবনে মথুরাপুর থানার ৩৯নং তোজির মধ্যে ২৪নং লাটে রায় দীঘির নদীতে দুই হাত উচ্চ দিগন্বর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এখানেই ই-প্লটে একবিংশ তীর্থ্যকর নেমিনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি খেতাবৰ সম্প্রদায়ের। ঘটেশ্বরী গ্রামে আদিনাথ মূর্তি দেখা গিয়াছে। এই খাড়িমগুলে পার্শ্বনাথ মূর্তি আছে। তাহা ছাড়া বহু বৌদ্ধ মূর্তিও এখানে পাওয়া যায়।<sup>১০</sup>

“এখন প্রশ্ন এই বাংলাদেশে জৈনমূর্তির এত বাহুল্য কেন? নিশ্চয়ই এক সময় এই দেশে জৈনমতের বিশেষ প্রভা ছিল। এইসব বিষয় আমি বহুকাল পূর্বে আমার লিখিত ‘জৈনধর্মের প্রাণশক্তি’ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইখানে নৃতন কিছু তথ্যসহ সেই প্রবন্ধের কিছু কিছু কথা পুনরায় উপস্থিত করিলাম।

পালরাজাদের সময়ে জৈনধর্ম ক্ষীণ হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। বাংলার অধিকাংশ জৈন মূর্তিতেই পালযুগের শিল্পরীতিই লক্ষিত হয়।

পরেশনাথ পর্বতের জৈন নাম সমেত গিরি। এখানে জৈনদের ২৪জন তীর্থ্যকরের মধ্যে ২০ জনই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। প্রথম তীর্থ্যকর খ্যাতবদ্দেবের নির্বাণস্থান কৈলাস, দ্বাদশ তীর্থ্যকর বাসুপুজ্যের নির্বাণস্থান ভাগলপুর চম্পাপুরী, দ্বাবিংশ তীর্থ্যকর নেমিনাথের নির্বাণস্থান গির্ণির অর্থাৎ রৈবতক পর্বত, চতুর্বিংশ তীর্থ্যকরের নির্বাণস্থান বিহার রাজগৃহের নিকট পাবাপুরী। আর ২০জন তীর্থ্যকর হইলেন অজিতনাথ, সন্তোষ বা শঙ্খনাথ, অভিনন্দন বা অভয়ানন্দ, সুমতিনাথ, পদ্মনাথ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধি বা পুত্পদন্ত, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশু বা অংশুনাথ, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধৰ্মনাথ, শাস্তিনাথ, কৃত্তুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ বা মল্লনাথ, সুরতনাথ, নিমিনাথ ও পার্শ্বনাথ। ইহাদের সকলেরই নির্বাণতীর্থ সমেত গিরি। শেষ তীর্থ্যকর পার্শ্বনাথের নামে এই তীর্থ এখন পার্শ্বনাথ পর্বত হইয়া গিয়েছে।

৯. Report of Varendra Research Society, ১৯২৮, ২৯, ৩০।

১০. কালিদাস দন্ত, ভারতবর্ষ, আধিন ১৩৩৬, পৃ.৫৬১-৫৭। মোমিনালুল তাঁ রাঢ়ের মতই জৈন মূর্তির ছাড়াচাড়ি।

সকল জৈনমত বিচার করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে মহাবীরের নির্বাণকালে ৪৬৭ খ্রীঃ পূর্ব হওয়া উচিত, যদিও পূর্ববর্তী অনেকের মতে ৫৪৫ খ্রীঃ পূর্ব হওয়াই সন্দত। কিন্তু এখন অনেকে তাহা স্থীকার করেন না।<sup>১১</sup>

পার্শ্বনাথের জন্ম তাহারও ২৫০ বৎসর পূর্বে। পূর্ববর্তী তীর্থংকরেরা আরও অনেক প্রাচীন। কাজেই বুঝা যায় সমেত শিখর কত প্রাচীন জৈনতার্থ। সেখান হইতে আরস্ত করিয়া রাঢ় মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা দিয়া এই জৈনধর্ম উড়িষ্যায় প্রবেশ করে। ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির নানা গুহা, মন্দির ও শিলালিপিতে বুঝা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই জৈন প্রভাব কলিঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।<sup>১২</sup>

আলোচনার অভাবে এবং পরম্পরা নষ্ট হওয়ায় বাঁকুড়া, মানভূম, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার বহুস্থানে এখনও অতি প্রাচীন সব জৈন মূর্তি লোক-লোচনের অগোচরে পড়িয়া আছে।

এখনও সেই সব মূর্তি সম্বন্ধে ভালুকপে অনুসন্ধান তো হয়-ই নাই, কয়টা মূর্তিরই বা সন্ধান পঞ্চিতজনেরা পাইয়াছেন? কৃচিৎ কোথাও দুই একটি মূর্তির মাত্র খোঁজ খবর হইয়াছে।

আচারান্তস্মত্রে দেখা যায় তীর্থংকর বর্দ্ধমান যে দ্বাদশ বছর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি রাঢ় দেশের জন্মের মধ্যে বহু কষ্ট (উবসগ্রাম) পাইয়াছিলেন। ‘লাঢ়ের বজ্জভূমি ও সুব্রতভূমি কণ্টক তৃণ মাছি মশায় পূর্ণ। সেখানে পথঘাট ছিল না, কু-শ্যায় ও কু-আসনে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছে।’<sup>১৩</sup>

“সেখানকার লোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং সেই কঠিন দেশের মধ্যে যেখানে লোকে ধর্ম মানে সেখানেও তাঁহাকে কুকুর আক্রমণ করিয়াছে।”<sup>১৪</sup>

“অনেকেই এই সব কুকুরকে বাধা না দিয়া বরং আরও ‘ছুকছুক’ করিয়া লেগাইয়া দিয়াছে।”<sup>১৫</sup>

“এইজন্য বজ্জভূমি ভিক্ষুরা কঠিন খাদ্যে অভ্যস্ত এবং তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি ও নালী ব্যবহার করেন।”<sup>১৬</sup>

১১. Chimanlal Shah, Jainism in Northern India, p. 33.

১২. ঐ, p. 151.

১৩. Sacred Books of the East, Acarangasutra, ১, ৮, ৩, ১-২।

১৪. ঐ, ১, ৮, ৩, ৩।

১৫. ঐ, ১, ৮, ৩, ৪।

১৬. ঐ, ১, ৮, ৩, ৫।

প্রাণীদের প্রতি দণ্ডবহার ত্যাগ করায় অনাগরিক ভগবান নানাভাবে গ্রাম কটক (কুব্যবহার, কুবাক্য প্রভৃতি) সহ্য করিয়াছেন।<sup>১৭</sup>

এই লাঢ় দেশে কোনো কোনো গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই তিনি প্রবেশই পান নাই। (অলক্ষ পুরো)।<sup>১৮</sup>

এই লাঢ় কেহ বলেন গুজরাতের দক্ষিণ ভাগ, কেহ বলেন রাঢ়। জ্যাকোবি বলেন বাংলা রাঢ় দেশ।<sup>১৯</sup> এই যে বর্ণনা তাহাতে লোভ করিয়া দাবী করার কিছুই নাই।

এখনও বঙ্গদেশীয় আচারের ব্যবহারের মিলে ও গরমিলে অনেক জৈন মত ও আচারের পরিচয় পাই। জন্মের পর জাতকের ষষ্ঠ দিনে যে ষষ্ঠী দেবীর পূজা হয় তাহাতে বাংলাদেশে মায়েরা সন্তানের কপালে দেবী আসিয়া ভবিষ্যৎ লিখিবেন মনে করিয়া প্রতীক্ষা করেন। জৈনদের মধ্যে এই আচারের বিলক্ষণ = চলন আছে।<sup>২০</sup>

শূর, চন্দ, গুপ্ত, মিত্র, দন্ত, দেব, বসু, সেন, নন্দী, ধর, ভদ্র প্রভৃতি উপাধিতে জৈন সম্বন্ধের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। ষ্ণেতাম্বর জৈনদের ৮৪ গচ্ছ বা শাখা আছে।<sup>২১</sup> দিগম্বরদেরও গচ্ছ আছে। তাহার মধ্যে নন্দী গচ্ছ আছে। দ্রঃ চালুক্য দ্বিতীয় অম্বরাজ লিপি।<sup>২২</sup>

শ্রবণবেলগোলা লিপিতেও নন্দী গচ্ছের উল্লেখ পাই।<sup>২৩</sup> গুপ্তিগুপ্তের শিষ্য মেঘনন্দী নন্দীসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা।<sup>২৪</sup> দিগম্বর পত্র জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্করের মতে এই সঙ্গে গুরুদের উপাধি প্রায় নন্দী, চন্দ, কীর্তি ও ভূষণ।

জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্করের মতে ভদ্রবাহুর শিষ্য জিনসেন সেনগণের প্রতিষ্ঠাতা। এই গণের মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

নন্দী ৪৩৫ খ্রীঃ পূর্ব

মেঘনন্দী ১৭ ”

দেবনন্দী ২৫ খ্রীঃ অব্দে

১৭. ঐ, ১, ৮, ৩, ৭।

১৮. ঐ, ১, ৮, ৩, ৮-৯।

১৯. ঐ, ভূমিকা, p. ১৫।

২০. J. Stevenson, Kalpasutra, p. ৭৮।

২১. Jainism in Northern India, p. ৭৮।

২২. Epigraphia Indica, ভাগ ৯, p. ৫৫।

২৩. ঐ, ভাগ ৫, p. ১৮, ২৫০।

২৪. Indian Antiquary, খণ্ড ২০, p. ৩৪১-৩৬১।

জয়নন্দী	২৯৬	"
গুণনন্দী	৩০৭	"
বজ্রনন্দী	৩২৯	"
কুমারনন্দী	৩৬০	"
ভানুনন্দী	৪৫১	"
নয়ননন্দী	৪৬৮	"
বসুনন্দী	৪৭৪	"
বীরনন্দী	৫০৪	"
রত্ননন্দী	৫২৮	"
মাণিক্যনন্দী	৫৪৪	"
বিষুণন্দী	৬৬৯	"
শ্রীনন্দী	৭০৮	"
ধৰ্মনন্দী	৭৫১	"
বিদ্যানন্দী	৭৮৩	"

ইহা ছাড়া আরও ১০জন নন্দী আছেন। সেন উপাধিকারী গুরুদের নামঃ

জয়সেন	২৯৮	খ্রীঃ পূৰ্ব
নাগসেন	২৮০	"
কৃষ্ণসেন	২৪৮	"
বিজয়সেন	২৩২	"
ধৰ্মসেন	১৮৪	"
প্রবসেন	১৩	"

ইহা ছাড়া সেনগণের মধ্যে জিনসেন, রবিসেন, রামসেন, কনকসেন, বন্দুসেন, বিষুসেন, মলিসেন, ভবসেন, অজিতসেন, গুণসেন (১ম), সিদ্ধসেন, বীরসেন (১ম), জিনসেন (২য়), নেমিসেন, ছত্রসেন, আর্যসেন, ব্ৰহ্মসেন, সূরসেন, দুর্লভসেন, ধৰ্মসেন (২য়), শ্রীসেন, লক্ষ্মীসেন, সোমসেন, ধৰসেন আছেন। এতদ্বয়ীত আরো ১৫ জন 'সেন' এই সেনগণে আছেন।

ইহা ছাড়া জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্করের লিখিত কাঠ সঙ্গের ২৩ জন সেন নামাংশধারী গুরুর পরিচয় পাই।

দিগন্বরদের মূল ও অন্যান্য গঠনে চন্দ্র ও ভদ্র উপাধিকারীও আছেন। চন্দ্র নামাংশধারী তো অসংখ্য গুরু। শুভচন্দ্রের একটি শাখাই আছে। জিনচন্দ্র (১ম) (৮০খ্রীঃ পূৰ্ব), প্রভাতচন্দ্র, নেমিচন্দ্র, মেঘচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, রামচন্দ্র, অভয়চন্দ্র,

নবচন্দ্র, নাগচন্দ্র, হরিচন্দ্র, মহীচন্দ্র, মাঘচন্দ্র, লক্ষ্মীচন্দ্র, গুণচন্দ্র, লোকচন্দ্র, ভবচন্দ্র, মহীচন্দ্র আরও ২৫ জনের নামাংশে চন্দ্র দেখা যায়।

ভদ্র নামাংশধারী যথা - যশোভদ্র, (৩৯ খ্রীঃ পূৰ্ব), সমস্তভদ্র, গুণভদ্র, সমস্তভদ্র (২য়) ইত্যাদি। এই সব তালিকা ভাল করিয়া দেখিতে চাহিলে পূরণচন্দ্র নাহার মহাশয় কৃত এন এপিটম অব জৈনিজম পুস্তকের শেষভাগে দেখিলেই পাইবেন।

বাঙালীর নামের মধ্যাংশে যে 'চন্দ্র', 'নাথ' প্রভৃতি দেখা যায় তাহাও হয় তো জৈন প্রভাবেরই ফল।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই লোকের নাম অর্থযুক্ত ও সুন্দর। অনেকে মনে করেন তাহা জৈন প্রভাবেরই ফল।

আদিনাথ পাৰ্শ্বনাথ নাম বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহারও মূল জৈনধর্মে।

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্মপুরাণের বেছলার কথা কেহ কেহ বলেন জৈনদেরই নিকট পাওয়া। জৈনদেরও পদ্মপুরাণ আছে। তাহার একাদশ সর্গে শ্রীপাৰ্শ্বনাথ চৱিতে দেখা যায় ফণীদের অধিপতি পদ্মাবতীর সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেনঃ

পদ্মাবত্যা সমঃ দেবম্ উপতঃ্তৌ ফণীশ্঵রঃ।

তাহার পর সামান্য কিছু কথা। জৈনদের কথাকোষেও এইরূপ নাগদেবতার কথা পাওয়া যায়।

অস্ত্রম জৈন তীর্থংকর মহাবীরের নির্বাণকাল কাহারও মতে ৪৬৭ খঃ পূৰ্বাব্দে, কেহ কেহ বলেন ৪৮০ হইতে ৪৬৭ খঃ ত্রৈয়া পূৰ্বাব্দ তাঁহার নির্বাণ কাল। (জৈনিজম্ব ইন নৰ্দৰ্গ ইত্তিহা, পঃ ৩১)। কেহ কেহ বলেন তাঁহার তিন শিষ্য। তাঁহাদিকে তীর্থংকর না বলিয়া 'কেবলী' অর্থাৎ পূৰ্ণজ্ঞানী বলা হয়। তাঁহাদের পরে ৫ জন 'শ্রুতকেবলী'। শ্রুতকেবলীদের শ্রেণিজন হইলেন ভদ্রবাহ। অর্থাৎ মহাবীর হইতে তিনি অষ্টম। কিন্তু এই কথা তাঁহার প্রতিচিত্ত বলাস্বত্ত মতেই চিকিৎস চায় না।<sup>১৫</sup>

ভদ্রবাহ হইলেন সম্বাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও তাঁহার শুরু। চন্দ্রগুপ্ত সহ ভদ্রবাহ দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন ও শ্রবণবেলগোলা আসিয়া নিজ অস্ত্রম সময় বুবিতে পারিয়া সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিয়া থান এবং শিষ্য

বিশাখাচার্যের অধীনে ভিক্ষু সঙ্গকে মহীশূর পুরাটথামে প্রেরণ করেন। এই কথা প্রায় সকলেই জানেন।<sup>২৬</sup>

### ক্ষুত কেবলী ভদ্রবাহু

স্থানকবাসী শ্বেতাম্বরীয়া বলেন চন্দ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ব হইতেই এই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু বলিলেন, “এখানে যদি থাকি তবে গৃহসংগ্ৰহের ক্ষেত্ৰ হইবে। আমরা পরিৱাজক, দেশান্তর গমনে বাধা নাই, অতএব দক্ষিণদেশে যাত্রা করা যাউক। দুর্ভিক্ষ গত হইলে এদেশে ফিরিয়া আসা যাইবে।” সঙ্গের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ১২ হাজার ভিক্ষু এই কথায় রাজী হইলেন, বাকি অর্দেক্ষ আচার্য স্থুলভদ্রের অধীনে দেশেই রহিয়া গেলেন। দুর্ভিক্ষকালে ভিক্ষা সংগ্ৰহের জন্য নানা দিকে বাহির হইতে বাধ্য হইয়া ভিক্ষুগণ বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন এবং আরও কিছু কিছু নিয়ম শিখিল করা হইল। দুর্ভিক্ষের পরেও এইসব নিয়ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা গেল না। ইহাতেই ভদ্রবাহুর দল দিগন্বর রহিয়া গেলেন ও স্থুলভদ্রের দল শ্বেতাম্বর হইলেন।<sup>২৭</sup> পূর্বেও এই দক্ষিণ যাত্রার কথা বলা হইয়াছে। দিগন্বরীয়া আরও বলেন, মহাবীরের অষ্টম পীটাতে ভদ্রবাহুর সময়ে নিয়মাদি শিখিল হইয়া যাওয়ায় অর্দ্ধফালক মতের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে শ্বেতাম্বর মত গড়িয়া ওঠে।

স্থানকবাসীদের মতেও ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতিকালে স্থুলভদ্রের দল একটি মহাসভা আহবান করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র সংগ্ৰহে প্ৰবৃত্ত হন। তাহাতে একাদশ অঙ্গ সংগ্ৰহীত হয়, দ্বাদশ অঙ্গের সন্ধান মিলে নাই। স্থুলভদ্র সেই দ্বাদশ অঙ্গকে মিলাইয়া দেন। ভদ্রবাহুর দল ফিরিয়া আসিয়া সেই দ্বাদশ অঙ্গকে প্রমাণ বলিয়া শীকার করেন নাই। তাহাতেই এই মতভেদ। পূর্বেও একথা বলা হইয়াছে।

জৈনদের সকল শাস্ত্র সকল দলের স্বীকৃত নহে। শ্বেতাম্বর ও দিগন্বর উভয় সম্প্রদায় কতক অংশ মানেন; কতকটা আবার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আদৃত। ১৪টি পূর্ব, ১২টি অঙ্গ, ১২টি উপাঙ্গ, ১০টি পেন্ন বা প্রকীর্ণ, ৬টি ছেদসূত্র, ৪টি মূলসূত্র এবং ২টি স্বতন্ত্র সূত্র নন্দী ও অনুযোগদ্বার শ্বেতাম্বরীয়া শীকার করেন, দিগন্বরীয়া করেন না।

আচার্য উইন্টারনিট্জ বলেন আয়ারান্সসুত্রের বিতীয় ভাগ অনেকটা পুরবৰ্তী। ইহার বিভিন্নাংশগুলি চূলা অর্থাৎ পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত, কাজেই বুুৰা যায় এইগুলি মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরে যুক্ত। তৃতীয় চূলায় মহাবীরের

২৬. প্র. ৬৫-৬৬।

২৭. Encyclopaedia of Religions and Ethics, প. ১২৩।

জীবনীর যে সব উপাদান রহিয়াছে ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রের সেইসব উপাদান কাজে লাগিয়েছে।<sup>২৮</sup>

অভিধানরাজেন্দ্রমতেও ‘চূলা’ অর্থে উত্তরতন্ত্র দেওয়া আছে।

উইন্টারনিট্জের মতে কল্পসূত্রের তিনটি অঙ্গ একই ব্যক্তির রচনা হইতে পারে না।

কল্পসূত্রের তৃতীয় অঙ্গ সমাচারী হইল যতিদের পঞ্জুসন কালের নিয়মাবলী। ইহাই বোধ হয় এই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। পঞ্জুসন অর্থাৎ বৰ্ষাকালে পৰ্যুষণের উৎসবে কল্পসূত্র পাঠ করা হয়, তাই ইহার নাম পঞ্জুসন কপ্প। পৰ্যুষণের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্গটিরই সঙ্গতি আছে। কথা আছে, পূর্বে কল্পসূত্র জৈনশাস্ত্রের অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ছিল না। দেবৰ্ধিগণি নাকি তাহা সিদ্ধান্তভূক্ত করিয়া লয়েন। কথাটা অসম্ভত নহে।

জৈনাচার্যদের মতে এক ভদ্রবাহুই বিস্মৃত সব ‘পূর্ব’ জানিতেন। নবম ‘পূর্ব’ হইতেই তৃতীয়-চতুর্থ ছেদসূত্র তিনি সংগ্ৰহ করিয়া লইয়াছিলেন। ‘দশাও’ তাঁহারই রচনা। নিজুত্তিগুলি হইল ছন্দোবন্ধ সংক্ষিপ্ত টীকা। তাহাও ভদ্রবাহুর রচিত বলিয়াই খ্যাত।

ভদ্রবাহু সংহিতা জৈনদের একখানি প্রখ্যাত স্মৃতি শাস্ত্ৰগুহ্য। ইহা দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাভ্যন্ত। একখানি সম্পূর্ণ গ্ৰহ ঝালৰ পাটন গ্ৰহ সংগ্ৰহে আছে। জে. এল. জৈনী মহাশয় দায়ভাগ সম্বন্ধে দুটি প্ৰকৰণ তাহা হইতে লইয়া পুস্তকাকারে বাহির করিয়াছেন। আৱা জৈনগৃহ প্ৰচারমালা হইতে তাহা বাহির হইয়াছে। দিগন্বর ও শ্বেতাম্বর মতের সম্বন্ধে পৰম্পৰের নানাবিধি এত প্ৰকারের ইতি কথা আছে যে তাহা বলিয়া শেষ কৰা যায় না।

স্থানকবাসীরা বলেন, ৮৩ শ্রীষ্টাদে বজ্জনেন রাজা ছিলেন দুর্বলচিন্ত। তাঁহার সময়ে এই বিচ্ছেদটি ঘটে। শ্বেতাম্বরীয়া বলেন শিবভূতি নামে এক ভিক্ষুকে রাজা একখানি রঞ্জ কস্তুৰ দেন। অন্য সাধুৱা বলিলেন, ‘ভিক্ষুর পক্ষে এইৱাপ মহার্ঘ কস্তুৰ গ্ৰহণ কৰা অন্যায়।’ তাই তাঁহারা কস্তুৰখানি ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ধূলা বাড়াৰ কাজেই ইহা ব্যবহাৰ কৰিলেন। শিবভূতি দৃঢ়িত হইয়া বলিলেন, যদি এই কস্তুৰই ব্যবহাৰ কৰা অন্যায় হয় তবে কিছুই ব্যবহাৰ কৰিয়া কাজ নাই।’ এই বলিয়া তিনি বসন পৰিগ্ৰহ ত্যাগ কৰিয়া দিগন্বর হইলেন। ইহাই দিগন্বরদের আদিকথা।

২৬. Indian Literature, প. ৪৩৭-৩৮।

২৭. Journal of Bihar Orissa Research Society, চতুর্থ খণ্ড, প. ৩৮৯।

এই বিষয়ে সাম্প্রদায়িক এত মতভেদ ও তর্ক আছে যে আমাদের পক্ষে আগাগোড়া সব কথা আলোচনা করা অসম্ভব। জৈনদের মধ্যেও কোনো কোনো প্রাচীন সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সেইসব সম্প্রদায় দেখা যায় না। জায়সওয়াল বলেন কর্ণট লিপিতে দেখা যায় যাপনীয় সংঘ এইরূপ একটি দল।<sup>১৭</sup>

রত্ননন্দী তাঁহার ভদ্রবাহু চরিত্রেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>১৮</sup>

ভদ্রবাহুর চরিত্রই এখন আমাদের আসল লক্ষ্য। পুরো বলা হইয়াছে মহাবীরের পর যাঁহারা মহাপুরুষ হন তাঁহারা হয় কেবলী নয় তো শ্রুত-কেবলী। শ্রুতকেবলীদের মধ্যে অস্তিম মহাপুরুষ এই ভদ্রবাহু। তাঁহার রচিত কল্পসূত্র জৈনদের বিখ্যাত গ্রন্থ। পুরো বলা হইয়াছে যে চাতুর্মাস্যের পর্যুষণ উৎসবে তাহা অতি শুদ্ধার সহিত পঠিত ও শ্রুত হয়।

ইহাতে পঞ্চ অধ্যায়ে মহাবীরের চরিত্র লিখিত। তাহার পরে পার্শ্ব ও অরিষ্টনেমির চরিত্র। ইহার পর মধ্যবর্তী তীর্থংকরদের যুগ-বর্ণনা। তাহার পর ঋষভ চরিত্র বর্ণিত। তাহার পর স্থবিরাবলীর একটি সুদীর্ঘ তালিকা। সর্বশেষে সমাচারী অর্থাৎ যতি ধৰ্ম বর্ণনা। ইহা অনেকটা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিনয় শাস্ত্রের মত।

সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের চতুর্থভাগ হইল ছেদসূত্র। ছেদসূত্রেরই অঙ্গ হইল এই কল্পসূত্র। ছেদ সূত্রেই আসলে যতিদের সব নিয়মাদি লিখিত। ছেদসূত্রের মধ্যে কল্প ও ব্যবহার সূত্র ভদ্রবাহুর। আচার্য উইন্টারনিট্জ প্রভৃতির মতে ছেদ সূত্রের অনেক অংশ অতিশয় প্রাচীন। ‘আয়ারদশাও’-র রচয়িতা ভদ্রবাহু।<sup>১৯</sup>

স্টিভেনসন বলেন দশাশ্রূতক্ষণ, অষ্টমাধ্যায়ন এবং প্রত্যাখ্যানের নয় শাখা অবলম্বনে ভদ্রবাহু এই কল্পসূত্র রচনা করেন।<sup>২০</sup>

মতবিশেষে ভদ্রবাহু যদিও মহাবীর হইতে অষ্টম পীটাতে তবু তাঁহার স্বরচিত থেরাবলী বা স্থবিরাবলী অনুসারে তিনি নিজে মহাবীর হইতে ষষ্ঠ পীটার।

তাঁহার মতে —

কাশ্যপ গোত্রীয় তীর্থংকর	মহাবীর	তাঁহার শিষ্য
অগ্নিবেশায়ন গোত্রীয় আর্য	সুধর্মা	তাঁহার শিষ্য
কাশ্যপ গোত্রীয় আর্য	জসু	তাঁহার শিষ্য

১৮. ভদ্রবাহু চরিত, ৪, পোক ১৫৪।

১৯. Jainism in Northern India, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

২০. Kalpasutra, Introduction, পৃ. ১৩।

কাত্যায়ন গোত্রীয় আর্য	প্রভু	তাঁহার শিষ্য
বাংসগোত্রীয় আর্য	সম্যক্ষেত্র	তাঁহার শিষ্য
তুন্দিকায়ন গোত্রীয় আর্য	যশোভদ্র	তাঁহার শিষ্য
প্রাচীন গোত্রীয় আর্য	ভদ্রবাহু	এবং
মাঠের গোত্রীয় আর্য	সম্মত	বিজয়

এইখানে সংশয় হয় থেরাবলী কি তাঁহার রচনা, তবে তিনি নিজেকে আর্যদের মধ্যে কি ধরিতে পারিতেন? আর তাঁহার পরে বহুর পর্যন্ত পরবর্তী বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহা কি তাঁহার দেওয়া সম্ভব? তাঁহার থেরাবলীতেই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত যে দুই রকম ধারা আছে যদি ইহা তাঁহার নিজের রচিত হইত তবে সঙ্গতও হইত না, সম্ভবও হইত না।

ভদ্রবাহু সম্বন্ধে আমাদের এই কৌতুহলের হেতু কি?

দিগন্বরী জৈন রত্ননন্দীর যে ভদ্রবাহুরিত পাই তাঁহার মতে দেখি ভদ্রবাহুর জন্ম পৌত্রবন্ধনে অর্থাৎ উত্তরবদ্ধে। রত্ননন্দীর ভদ্রবাহু চরিতই বেশী প্রচলিত। বিশেষতঃ যখন অনেকের মতে, ভদ্রবাহুর দলের সঙ্গে মতভেদই শ্বেতাম্বর মতের উন্নত।

আমার পরম বন্ধু শ্বেতাম্বর মতাবলম্বী সম্মানী মুনিশ্রী জিনবিজয়জী খরতরগচ্ছের যে পট্টাবলী সংগ্রহ এই শাস্তিনিকেতন হইতে বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখি গুরু ভদ্রবাহু, সকল সূত্র সম্মতের নিযুক্তি রচনা করিয়াছেন এবং তিনি সঙ্গের কল্যাণার্থে উপসর্গহর স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।<sup>২১</sup>

পট্টাবলী (১) তালিকায় দেখি-ভদ্রবাহু স্বামী উবসগ্গহরং কর্তা বীরাং ১৭০' (পৃ. ৯)। অর্থাৎ তিনি উপসর্গহর স্তোত্র রচয়িতা, মহাবীর হইতে ১৭০ বৎসর পরে তাঁহার স্বর্গরোগণ কাল।

পট্টাবলী (২) তালিকায় লেখা ভদ্রবাহু স্বামী প্রাচীন গোত্রীয়, প্রতিষ্ঠান পুরবাসী, উপসর্গহরস্তোত্র রচনার দ্বারা মহোপকারী, চতুর্দশ ‘পূর্ব’ বিং কল্পসূত্র আবশ্যক- নিযুক্তি আদি বহু গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি ৪৫ বৎসর গৃহী ছিলেন, ২৭ বৎসর সামান্য ব্রত ছিলেন, ১৪বৎসর যুগ প্রধান ছিলেন। ৭৬ বৎসর বয়সে মহাবীর হইতে ১৭০ বৎসর পরে স্বর্গে গমন করেন (পৃঃ ১৬-১৭)। মনে রাখা উচিত এইসব পট্টাবলী বহু পরবর্তীকালের গ্রন্থ।

দিগন্বর পট্টাবলী মতে কুন্দকুন্দাচার্য প্রথম শতাব্দীর মানুষ। তাঁহার গুরু নাকি ভদ্রবাহু। অথচ পট্টাবলী মতে তিনি ভদ্রবাহু হইতে পঞ্চম পীটার।

৩১. সুরি পরম্পরা প্রশংসন, ১১।

ভদ্রবাহী সংহিতা নামে জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা একজন ভদ্রবাহ আছেন, তিনিও বস্তুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রবাহ কি তবে একাধিক ছিলেন? কারণ স্টিভেনসন বলেন ৪১১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতপতি শ্রবসেনের সময় এক ভদ্রবাহ জীবিত ছিলেন।<sup>৩২</sup>

আসলে, আদি ভদ্রবাহ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে জীবিত ছিলেন ইহাই ঠিক। জৈনশাস্ত্র মতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে ৩৫৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, জ্যাকোবি ও শারণেন্টার বলেন ২৯৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। শ্রবসেনের সময় (ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) বলেন ২৯৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। তাহাতে ভদ্রবাহুর গ্রন্থ ও কাল প্রভৃতি দেবৰ্ধিগণীর শাস্ত্র সংগ্রহ ঘটিয়াছিল।

<sup>৩৩</sup> প্রাচীনকালে ভদ্র শুল্ক পঞ্চমীতে কল্পসূত্র পাঠ আরম্ভ হইত। ভিক্ষুরা নিয়মভঙ্গ অপরাধ স্বীকার করিলে পর ইহা পঠিত হইত। অন্যসব সাধুরা বসিয়া শ্রবণ করিতেন। শ্রবসেনের সময় এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় রাজা শোকার্ত হন, তাই কিছু নিয়মের অদল বদল হইয়া নয়তি পাঠে এই পাঠে সমাপ্ত হইত।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা রচিত হয়। যশোবিজয় সংস্কৃত টীকা রচনা করেন, আর তিনজনের টীকাকার দেবীচন্দ্র, জ্ঞানবিমল ও সাময় সরল ভাষাতে টীকা লেখেন।

জৈন সাধুদের মধ্যে যে নিয়ম ভঙ্গ অপরাধ স্বীকৃত হইত তাহা হইতেই বোধহয় খৃষ্টীয় কনফেসনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।<sup>৩৪</sup>

বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যেও এই অপরাধ স্বীকার করার প্রথা বিলক্ষণ রূপে প্রচলিত ছিল। প্রতিমোক্ষ গ্রহণশুলি তাহার প্রমাণ।

আচার্য জ্যাকোবি বলেন ভদ্রবাহুর পরে জৈন মত আর বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই।<sup>৩৫</sup>

জৈন শাস্ত্র গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে ‘নিযুক্তি’র (নিজুত্তি) রচনাও চলিতেছিল। দেবৰ্ধির সময়ে যেসব শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হয় তাহার পূর্বেই জৈন ভিক্ষুগণ কতকটা টীকার মত নিযুক্তি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ কল্পসূত্রের ‘গিণু’ এবং ‘ওঘনিনিজুত্তি’ শাস্ত্রবৎ মান্য যদিও ‘ওঘনিনিজুত্তি’ কোন

কোন ‘পূর্ব’ হইতে গৃহীত। ইহাতে ধর্ম জীবনের কথা ও সাধনার জন্য নিয়মাদি আলোচিত হইয়াছে।

এই সব টীকাকারদের মধ্যে ভদ্রবাহ প্রাচীনতম। তিনি শাস্ত্রীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দশটি ‘নিজুত্তি’ রচনা করেন। আচারাদ, সূক্রবৃত্তাদ সূর্যপ্রক্ষেপণ, দশশুত্রকষ্ট, কলা, ব্যবহার, আবশ্যক, দর্শকৈকালিক, উন্নরাধ্যয়ন, ঋষিভাষ্যত, দশটি বিষয়। বানারসী জৈনের মতে তাঁহার আবশ্যক নিযুক্তিই পূর্ব ভবের অর্থাৎ ঋষিভদেবের পূর্বজন্মের প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে বেণীচন্দ্র ‘ওঘনিনিযুক্তি’র একটি পুঁথি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তাহার মুখ্যপত্রে লিখিত আছে:

শ্রুতকেবলী শ্রীমদ্ভদ্রবাহ বিরচিত নিযুক্তি শ্রীমদ্ভূবার্য বিরচিত ভাষ্যযুতানবাঙ্গী বৃত্তিশোধক নিযুক্তি কুলভূবণ শ্রীমদ্ব্রোগাচার্য সৃত্রিত বৃত্তিভূবিতা শ্রীমতী ওঘনিনিযুক্তি।

শ্রেষ্ঠী দেবচন্দ্র লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার প্রহর্মালার ৪১২ গ্রন্থ হইল-‘শ্রীগিণুনিযুক্তি’, তাহা শ্রীভদ্রবাহ স্বামী প্রণীতা, সভায় শ্রীমন্মলয়গির্জাচার্য বিবৃত।

‘উৎসগ্রহর স্টোর’ যদি ভদ্রবাহুর রচিত হয় তবে তাহা প্রাচীনতম স্টোরের রচনা। ইহা পার্শ্বের উদ্দেশ্যে রচিত স্টোর।

॥১॥

পূর্বে উল্লিখিত জ্যোতিষগ্রন্থ ভদ্রবাহী সংহিতা বোধ হয় আর কোনো ভদ্রবাহুর বরাহমিহির জৈন জ্যোতিষাচার্য সিদ্ধসেনের নাম করিলেও ভদ্রবাহী সংহিতার নাম করেন নাই, কাজেই মনে হয় ইহা পরবর্তী কোনো ভদ্রবাহুর রচিত।

তাঁহার জীবনচরিত ‘ভদ্রবাহ চরিত্’ জৈনদের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ। কিন্তু চরিতকার দিগন্থর মতের রত্ননলী বহু পরবর্তীকালে জন্মিয়াছেন। তিনি চরিতকার দিগন্থের মতের রত্ননলী বহু পরবর্তীকালে জন্মিয়াছেন। তিনি চরিতকার দিগন্থের মতের রত্ননলী বহু পরবর্তীকালে জন্মিয়াছেন। তিনি ত্রুটীয় সম্প্রদায়ের সময় ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। হয়তো রত্ননলী সেই করিয়াছেন। ত্রুটীয় সম্প্রদায়ের সময় ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। হয়তো রত্ননলী সেই সময়কারই মানুষ। কাজেই তাঁহার লেখা, ত্রুটীয় মতের প্রতি আগ্রহের ঝাঁঝাটা অত্যন্ত বেশী। রত্ননলী বহু পরবর্তী লোক। বোধ হয়, পশ্চিম ভারতে তাঁহার বাঢ়ী। পূর্ব ভারতের ভূগোলগত সংস্থানও তাঁহার জানা নাই; বহু পূর্বাতন কথা বলিয়া অনেকে কিছু গোলমালও তাঁহার হইয়াছে। তবু তিনি তাঁহার ভদ্রবাহ চরিতে প্রথম পরিচেদে লিখিয়াছেন, ‘ভারতের লঙ্ঘাটে তমালপত্রের মত হইল

৩২. ভদ্রবাহী সংহিতা, ভূমিকা, পৃ.৯।

৩৩. Jainism in Northern India, পৃ.৩০।

৩৪. Stevenson, Kalpa sutra, Introduction, পৃ.২৪।

৩৫. Z.D.M.G. XXXVIII, পৃ.১৭।

পৌড়বর্দ্ধন দেশ।<sup>১</sup> এক কথায় সুজলা শ্যামলা বাংলাদেশের একটি অপূর্ব চিত্র এই গ্রহে পাই।

তমালপত্রবৎ তস্য দেশোদ্ভূত পৌড়বর্দ্ধনঃ ॥ ২২

কাজেই এতকাল পরে এত দূরের কথা নিখিতে গিয়া রত্ননদীর অনেক ভুলভাস্তি হইবার কথা। তবু তাঁর বর্ণিত গ্রহে দেখি, দেশের গ্রামগুলিও ধনধান্য জনাকীর্ণ এবং গোমণ্ডল বিমণিত।

ধনধান্যসমাকীর্ণ গোমণ্ডলসমান্বিতাঃ ॥ ২৩

যে দেশের ক্ষেত্রকল নদী ও বৃষ্টির জলে সমৃদ্ধ সেখানকার ভূমি অভীষ্ঠ শস্যদানে চিন্তামণিসদৃশ।

নদীমাতৃক-সদ্দেবমাতৃক—ক্ষেত্রমণ্ডিতা।

চিন্তামণীয়তে যত্র ষ্টেষ্টশ্যপ্রদা মহী ॥ ২৫

যেখানে ভূমরসহ কমলে শোভিত সব সরসী বিরাজিত

সরস্যো যত্র রাজস্তে মালি-বারিজলোচনেঃ ॥ ২৬

মোট কথা, ভদ্রবাহ চারিত্র গ্রহের প্রথম পরিচেছে ২২-২৯ শ্লেকে রত্ননদী পুড়বর্দ্ধনের এমন একটি চিত্র দিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় তাহা একটি কল্পনোক।

এই পুড়বর্দ্ধন দেশে কেটুপুর নামে নগর ছিল। সেই নগরটি একটি স্বর্ণখন্দের মত ছিল শোভমান। বৃহৎ উত্তুঙ্গ অট্টালিকা পরিখা প্রাকার ও গোপুরের নগরদ্বার দ্বারা ও উত্তুঙ্গ প্রাসাদ পঞ্জিতে সেই স্থান বিরাজিত ছিল।

তত্র কেটুপুরং রম্যং দ্যোততে নাকথগুবৎ ।

অগাধোত্তুঙ্গ-সাটালেঃ খাতিকা-শাল-গোপুরেঃ ।

প্রোত্তুঙ্গ-শিখরা যাত্রাংবভুঃ প্রাসাদ-পংক্তয়ঃ । ৩০-৩১

পুড়বর্দ্ধন তো বুঝিলাম মালদহ, দিনাজপুর, বরেন্দ্র প্রভৃতি গৌড়ভূমি। কিন্তু এই কেটুপুর নগরটি ছিল কোথায়? রত্ননদী বলেন, সেখানে নির্মল শুভ পুণ্যপিণ্ডের মত সমুজ্জ্বল ভব্যজনের সেব্য সব জিনালয় বিরাজিত ছিল।

বিশদাঃ পুণ্যপিণ্ডাভা ভব্যসেব্যা জিনালয়ঃ ॥ ৩৩

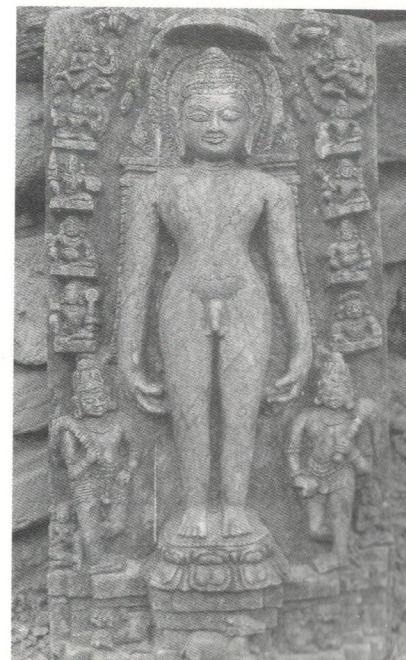
সেখানকার সমস্ত লোক ধর্মাচরণে দীপ্ত জীবন ছিলেন।

তত্ত্বাস্তেৰ্থিলা লোকা রেজিরে ধর্মবর্ণনাঃ ॥ ৩৬

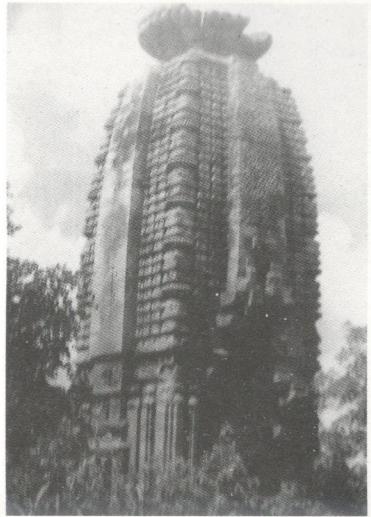
প্রথম পরিচেছে ৩০-৩৬ পর্যন্ত ৭টি শ্লেকে কেটুপুরের লোকোক্তর ঐশ্বর্য ও মহত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।



ঝঘনাথ, পাকবিরা ৭ম শতাব্দী



শাস্তিনাথ, পাকবিরা ১০শ শতাব্দী



চেলিয়ামা জৈন মন্দির



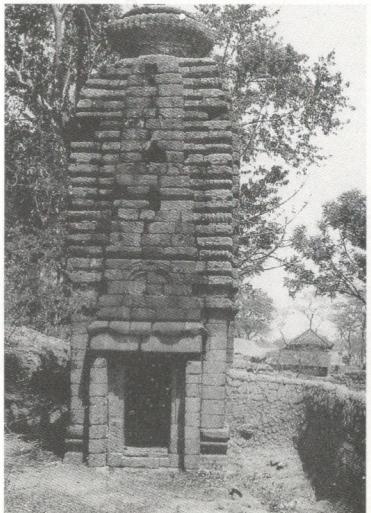
খণ্ডনাথ, তৈরবসিংহপুর,

উড়িষ্যা

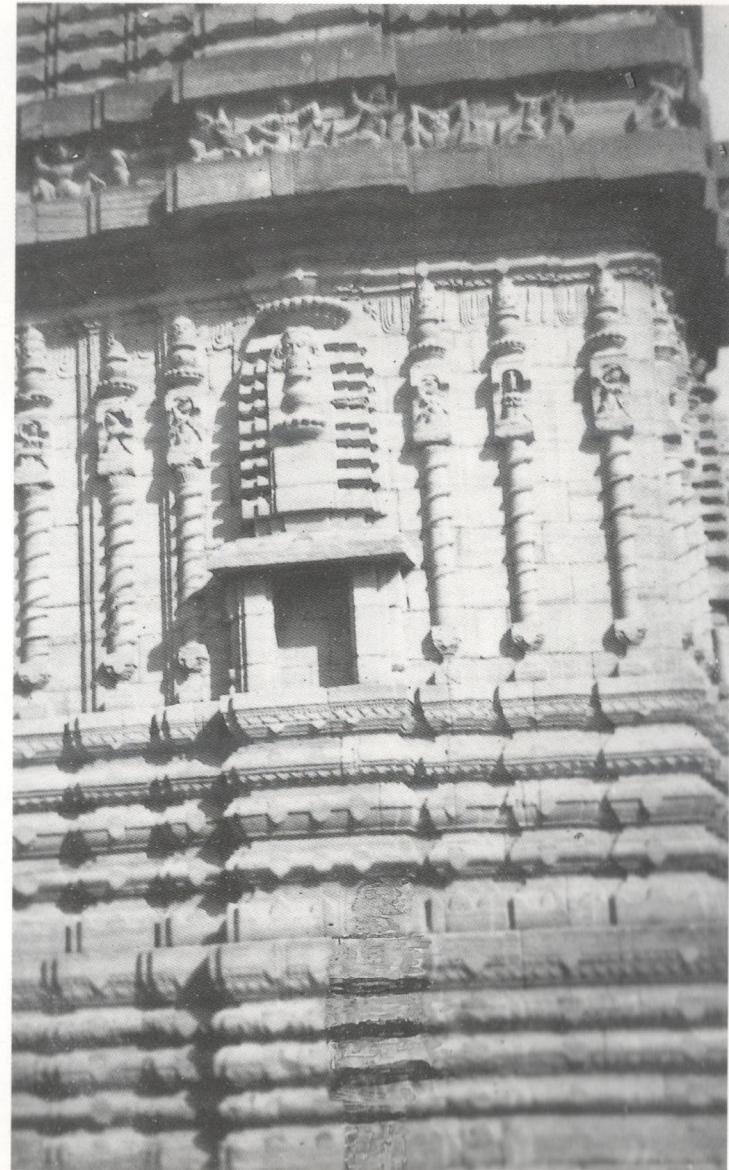


খণ্ডনাথ, তৈরবসিংহপুর, ।

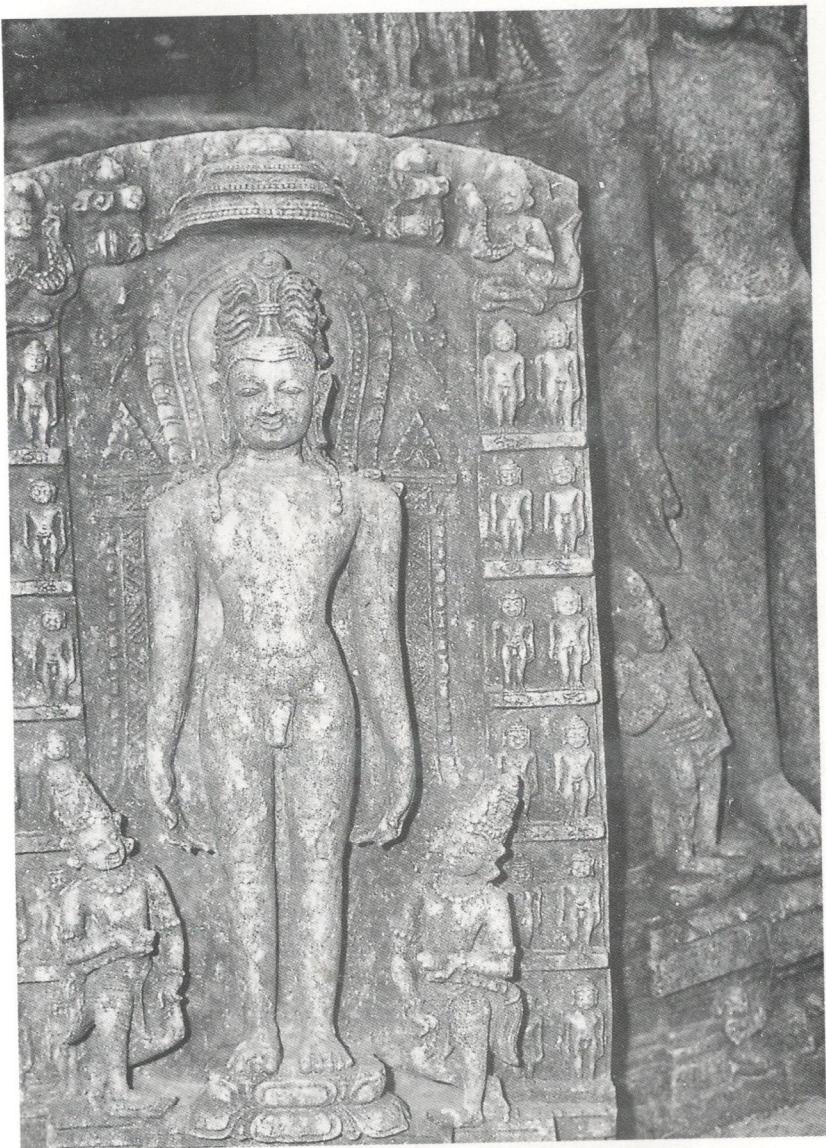
উড়িষ্যা



সরাক জৈন মন্দির



বরাকরের সরাক জৈন মন্দির



ঞ্চভনাথ, পাকবিরা ১০শ শতাব্দী

পুদ্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন পদ্মধর। তিনি নিজ তেজে অন্য সকল ভূপালকে করদ করিয়া লইয়াছিলেন।

তত্ত্বাত্মক বাজায়তে ভূপঃ পদ্মধরাভিধঃ।  
করণীকৃত-নিঃশেষ-ভূপালো নিজতেজসা ॥ ৩৭

তাহার পুরোহিত ছিলেন সোমশর্মা। (৩৯) তিনি ছিলেন বিবেকী শুদ্ধান্তঃ-করণ বেদবিদ্যাবিশারদ।

বিবেকী বিশাদস্বাত্ত্বে বেদবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৪০

তাহার পুত্রের নাম সকলে রাখিলেন ভদ্রবাহু। (৪৮)

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীগোবর্দ্ধনাচার্য পৌদ্রবর্দ্ধনে কোট্টপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৫৫-৫৭)

প্রতিভাশালী ভদ্রবাহুকে দেখিয়া গোবর্দ্ধনাচার্য এত প্রসন্ন হইলেন যে তাহাকে শিষ্য করিতে চাহিলেন। (৭৪) পিতামাতাও তাহাতে আনন্দে সম্মতি দিলেন। (৭৭) গোবর্দ্ধনাচার্য ছিলেন জৈনাচার্য। ভদ্রবাহুও জৈনমত গ্রহণ করিলেন।

ভদ্রবাহু নিজ গৃহে ফিরিয়া স্থীয় জ্ঞানের দ্বারা সকলকে পরাজিত করিয়া জৈনমত স্থাপন করিলেন। (৯৫-৯৬)

রাজাও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন। (৯৭) ভদ্রবাহু কিছুদিন পর গোবর্দ্ধনাচার্যের নিকট গিয়া একেবারে সন্ধানসুন্দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। (১১৩-১৪)

ক্রমে সঙ্ঘপতি গোবর্দ্ধন ভদ্রবাহুকে সকল গুণ-সাগর বুঝিয়া তাহার নিজের পদে অর্থাৎ সঙ্ঘপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

গোবর্দ্ধনো গণী জ্ঞাতা সমগ্র-গুণসাগরম্।

স্বপদে যোজয়ামাস ভদ্রবাহুং গণাগ্রিমে ॥ ১২৬

৩৫ক চতুর্থ পরি, ১৫৯

বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, কিছুকাল পরে গোবর্দ্ধনাচার্য তপস্যায় তনুত্যাগ করিলেন। (২) এমন সময় উজ্জয়নীরাজ (রত্ননদীর এইসামাজিক ভূল মাঝে মাঝে আছে) চন্দ্রগুপ্ত এক দুঃস্মিন্দেখিলেন। (১০-১৭) ইহার র্ম আর কেউ বুঝাইতে পারিলেন না। ভদ্রবাহু তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত পুত্রকে স্থীয় রাজ্য দিয়া ভদ্রবাহুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। (৫৩-৫৫)

শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু নানা নিমিত্তের দ্বারা বুঝিলেন সেই মানবদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে। ১২বৎসর সেই দুঃকাল থাকিবে। তাই সাধুদের আর এখানে থাকা উচিত নহে। (৭০-৭১)

তাহাতে কুবেরমিতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠিরা বলিলেন, ‘প্রভু ভয় নাই। আমাদের বহু অর্থ সঞ্চিত আছে।’ (৭৫-৭৬) কিন্তু ভদ্রবাহু বুঝিলেন, তাহাতে কুলাইবে না, তাই তিনি কর্ণটি দেশে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। (৮৬)

রামল্যস্থ স্থূলাচার্যলভদ্রাদি সাধুগণ কিন্তু ঐ সঙ্গে গেলেন না। তাঁহারা শ্রেষ্ঠগণের কথায় দেশেই রহিয়া গেলেন। (৮৮)

ভদ্রবাহু দক্ষিণদেশে চলিলেন, (৯০) তাঁহার সঙ্গে বারো হাজার তপস্বীও যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশশর্ষিসহস্রেণ পরীতো গণনায়কঃ। (৯১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ বর্ণনায় দেখিতে পাই পথে যাইতে যাইতে ভদ্রবাহু বুঝিলেন তাঁহার অস্তিমকাল উপস্থিত। তাই তিনি বিশাখাচার্যের উপর সঙ্ঘকে লইয়া যাইবার ভার দিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘপতি পদে বৃত্ত করিলেন।

বিশাখাচার্য তাঁহাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সেই সঙ্ঘে ছিলেন গৃহীত ভিক্ষু-বৃত্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ভদ্রবাহুর সেবার ভার অঙ্গীকার করিলেন ও সঙ্ঘকে অগ্রসর হইয়া যাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিশাখাচার্য সঙ্ঘসহ চোলদেশে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রবাহু গুহায় রহিয়া তপস্যায় দেহত্যাগে উদ্যত হইলেন। সঙ্ঘে রহিলেন শুধু চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার নাম তখন প্রভাতদ্রু।

এই স্থানটি উত্তর কর্ণাটের কটবঢ়ি পর্বতের নিকটে। এই স্থানই হইল লোকপ্রসিদ্ধ শ্রবণবেলগোলা তীর্থ। কলবপ্পু পর্বতের উপর ভদ্রবাহুর সমাধি এখনও বর্তমান। এখন পর্বতের নাম চন্দ্রগিরি। এখানে তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ও অনুচর ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বা প্রভাতদ্রু।

শ্রবণবেলগোলা তীর্থটি জৈন মাত্রেই মহাপূজিত। জৈনরা মনে করেন চাণক্যও জৈন ছিলেন। চাণক্য বৃক্ষ বয়সে জৈনদের মতই সংলেখনা ব্রতের দ্বারা প্রাণত্যাগের চেষ্টা করেন।<sup>৩৬</sup> জ্যাকোবি এবং টমাস এডোয়ার্ড এই কথাই সমর্থন করেন।<sup>৩৭</sup>

<sup>৩৬.</sup> Jolly, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পৃ. ১০-১১।

<sup>৩৭.</sup> Jainism in Northern India, পৃ. ১৩৭।

চাণক্য নাকি জীবনশেষে নর্মদাতীরে শুক্রতীর্থে গিয়া বাস করেন। বেলগোলা অর্থও শুক্র সরোবর।

চন্দ্রগুপ্তের জৈন ধর্ম গ্রহণের কথা জায়সওয়ালও বিশ্বাস করেন।<sup>৩৮</sup>

হেমচন্দ্র রচিত ত্রিষ্ঠিশলাকাপুরুষ চরিত্র পরিশিষ্টে স্থবিরাবলী চরিত্রে অষ্টম সর্গে চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত কথার এক সুন্দর উপাখ্যান আছে। তাহা অন্যরূপ। এখানে বাহ্যিক ভয়ে তাহা দেওয়া গেল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভদ্রবাহু স্বীয় ভক্ত শিষ্য চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া শ্রবণবেলগোলা রাহিলেন এবং বিশাখাচার্যের সঙ্গে সঙ্ঘকে মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পুনাট ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন।

বারো বৎসর অতীত হইলে দেশে সুভিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিশাখাচার্য দেশে ফিরিবার জন্য উত্তর ভারতের দিকে প্রত্যাবর্তনার্থ যাত্রা করিয়া যেখানে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন সেখানে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন পরলোকগত ভদ্রবাহুর সমাধির পাশে সেবারত চন্দ্রগুপ্তকে দেখিলেন ও গুরুর সমাধিস্থানকে বন্দনা করিলেন।

চন্দ্রগুপ্তও বিশাখাচার্যকে বন্দনা করিয়া সংকার করিলেন। কিন্তু এই নির্জন প্রদেশে জৈন গৃহস্থ বিরহিত স্থানে চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে ভিক্ষুক ধর্ম পালন করিতে পারিয়াছেন এই সব মনে সন্দেহ করিয়া বিশাখাচার্য আর তাঁহাকে প্রতিবন্দনা করিলেন না।

পরে যখন তিনি চন্দ্রগুপ্তের শুন্দ চরিত্র ও আচারের বিষয় বুঝিতে পারিলেন তখন বিশাখাচার্য তাঁহার প্রতি বন্দনা করিলেন। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তভাগে ভদ্রবাহুর প্রতি একটি চমৎকার নমস্কার শ্লোক দেওয়া হইয়াছেঃ

সূর্যের ন্যায় নিরস্তর অনস্তগতাত্ত্ববৃত্তি এবং দুর্বোধান্ধকারসমূহ দূরকারী বিশুদ্ধ চরিত্র ভদ্রবাহুকে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ সিদ্ধির জন্য নমস্কার করি।

নিরস্তরামন্ত-গতাস্তবৃত্তিং নিরস্ত-দুর্বোধিতমো বিতানম্।

শ্রীভদ্রবাহুঞ্চকরং বিশুদ্ধং বিম্বনমী মীহিত-শাত-সিদ্ধয়ে॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ বিশাখাচার্যের সঙ্ঘের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও স্থূলাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে মতভেদ বর্ণিত। তাহাতে আমাদের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তভাগে রত্ননন্দী বলিতেছেন ‘মহারাজ শ্রেণিকের প্রশংস বীর জিনেন্দ্র যেইরূপ ভদ্রবাহু চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিনশাস্ত্রানুযায়ী আমিও ভদ্রবাহু চরিত্র বর্ণনা করিলাম’।

<sup>৩৮.</sup> Journal of Bihar Orissa Research Society, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫২।

শ্রেণিক-পশ্চতোদুবোচ্দ যথা বীরজিনেশ্বরঃ।

তথোদিষ্টঃ ময়াৎগ্রোপি জ্ঞাতা শ্রীজিনসৃত্রতঃ।। ১৭১

ইহাতে বুঝা যায় রত্নন্দীর পূর্বেও বীরজিনেন্দ্র মুনি প্রভৃতির রচিত আরও ভদ্রবাহুর চরিত প্রচলিত ছিল।

আচার্য হেমচন্দ্রের ত্রিবিষ্ণুশাকাপুরুষ চরিত্রে ৬৩ জন মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণিত। তাহার পরিশিষ্টভাগে স্থবিরাবলী চরিত্রেও ভদ্রবাহুর চরিত্র বর্ণিত। (ষষ্ঠ পর্ব, নবম সর্গ)। তবে সেখানে ভিন্নরূপ কথা। সেখানে দেখি নেপালে ভদ্রবাহু ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে স্থুলভদ্র ‘দৃষ্টিবাদ’ অর্থাৎ দ্বাদশ অঙ্গ শিক্ষা করিয়া আসেন।

### মনোরম শ্রীকোটপুর

তৃতীয় ৪৬ পরিচ্ছেদের শেষভাগে আবার তিনি ভদ্রবাহুর প্রতি নিজের ভক্তি জানাইতেছেন।

অমরপুর হইতে মনোরম শ্রীকোটপুরে সোমশৰ্মা ব্রাহ্মণের ঘরে সুন্দরী সোমশ্রীর গর্ভে অনেকগুণাকরণ পুত্ররূপে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া, যোগ্য গুরুকে আশ্রয় করিয়া, নির্মল জ্ঞান-দুর্ঘ-জলধিকেউন্নীগ হইয়াছেন সেই গণনেতা ভদ্র ও মহাগুরু ভদ্রবাহু আমার চিত্তে দীপ্যমান হউন।

যঃ শ্রীকোটপুরে জিতামরপুরে সোমাদিশমন্দিজা

দাসীদেকগুণকরোঃসজবরঃ সোমশ্রিয়াৎ সুশ্রিয়াম্।

প্রোত্তীর্ণেংমলবোধ-দুর্ঘ-জলধিঃ শ্রিহা গরীয়ো গুরুঃ

ভদ্রোৎসৌ সম ভদ্রবাহুগবেঃ প্রদ্যোততাম মানসে।। ১৭২

পরিশেষে রত্নন্দী আপন পরিচয় আর কিছুমাত্র না দিয়া শুধু নিজ গুরুর নামটি জানাইয়া বিদ্য লইলেন। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীলিতকীর্তি মুনিন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমি শ্রীরত্নন্দী মুনি এই অন্য চরিত্র বর্ণনা করিলাম।

স্মৃত্বা শ্রীলিতাদিকীর্তিমনুযাঃ শিক্ষাগুরুঃ সদ্গুরঃ।

চক্রে চারংচরিত্রেমেতদনঘঃ রত্নাদিনন্দী মুনিঃ।। ১৭৫

লিতকীর্তি হইলেন অনন্তকীর্তির শিষ্য।

এখানে বলা উচিত আমরা এই ভদ্রবাহু চরিত দিগন্বর সম্প্রদায়ী রত্নন্দীর গ্রহানুসারেই বিবৃত করিলাম।

শ্রেণিক রাজার জন্য বীর জিনেশ্বরকৃত যে ভদ্রবাহু চরিত তাহাতেও ভদ্রবাহুর জন্মস্থান পৌত্রবর্ধন।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভদ্রবাহুর চরিত যাহা আমরা পাই তাহা হইল হরিষেণকৃত বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থে।

বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থখানি সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থরূপে শ্রীযুক্ত আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এখন বাহির হইয়াছে। ইহার ৩১৭ পৃষ্ঠায় ১৩১-তম অধ্যায়ে ‘ভদ্রবাহু কথানকম্’ অর্থাৎ ভদ্রবাহুর কথা আছে। তাহাতে দেখা যায়।

অথাস্তি বিষয়ে কান্তে পৌত্রবর্ধননামিনি।

কেটামতঃ পুরং পূরং দেবকোটঃ চ সাম্প্রতম্।। ১

তত্ত্ব পদ্মরথো রাজা নতাশে-নরেশ্বরঃ।

বভুব তন্মতা দেবী পদ্মশ্রী রতিবল্লভা।। ২

অস্যেব ভূপতেরাসীৎ সোমশৰ্মাভিধো বিজঃ।

রূপযৌবনসম্পন্না সোমশ্রীতৎপ্রিয়া প্রিয়া।। ৩

কুর্বাণঃ সর্ববন্ধনান্তঃ ভদ্রঃ ভদ্রশরো যতঃ।

ভদ্রবাহুস্ততঃ খ্যাতো বভুব তনযোঽনযোঃ।। ৪

ভদ্রবাহুঃ সমুঞ্গঃ সন্ত বহুভির্ব্রহ্মচারিভিঃ।

দেবকোটপুরান্তেহ্সৌ রমমাণো বিতিষ্ঠতো।। ৫

অর্থাৎ পৌত্রবর্ধনে পূর্বে কেটামত নামে এক নগর ছিল। এখন সেই নগরের নাম দেবকোট। সেখানে চতুর্বর্তী রাজা ছিলেন পদ্মরথ (রত্নন্দীর মতে পদ্মধর) এবং তাঁহার রাণী ছিলেন পদ্মশ্রী। এই রাজার আশ্রিত সোমশৰ্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সোমশ্রী। ইহাদের পুত্র ভদ্রবাহু সকলের কল্যাণ সাধনে রত ছিলেন। ভদ্রবাহু উপনযনের পর বহু ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নগরপ্রান্তে খেলিতেছিলেন।

এমন সময় বর্ধমান হইতে চতুর্থ আচার্য শুতকেবলী গোবর্ধন তীর্থ্যাত্মা প্রসঙ্গে কোটিনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উর্জয়স্তঃ গিরিঃ নেমিং স্তোতুকামো মহাতপাঃ।

বিহরন্ত কাপি সংপ্রাপ কেটামতগরমুখজম্।। ১০

দিনাজপুরের অনতিদূরে পূর্ণত্বা নদীর বামতীরে দেবীকোটের কথা তবাক-ই-নাসিরির মধ্যে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার একটি পরগণা দেবীকোট।

গোবর্ধন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং আপন শিষ্য করিয়া লইলেন। কালক্রমে ভদ্রবাহু গোবর্ধনের নিকট সম্মান প্রাপ্ত করিলেন।

কাজেই ভদ্রবাহু এই মতে ইলেন পঞ্চম শুতকেবলী। ইহার পরবর্তী কথা প্রসঙ্গে রত্নন্দীর আখ্যানের সঙ্গে হরিমেন লিখিত আখ্যানের এক-আধটুকু পার্থক্য আছে। তবু পৌড়ুবর্দ্ধনে তাহার জন্ম সেই কথা ঠিকই আছে।

এই দেবকোট যে বাংলাদেশের বরেন্দ্র ভূভাগে ছিল তাহাও এই বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থে দেখিতে পাই।

পূর্বদেশে বরেন্দ্রস্য বিষয়ে ধনভূষিতে।

দেবকোটপুরং রম্যং বভুব ভুবি বিশুতম্ ॥ ১

১৬ কথানক, পঃ ৩০

অর্থাৎ ধনভূষিত পূর্বদেশে বরেন্দ্র বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত রমণীয় দেবকোট নগর ছিল। সেই নগরে সোমশর্মা নামে চতুর্বেদজ্ঞ ষড়ঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

সোমশর্মাভবদ্বি প্রশ্চতুর্বেদয়ড়ঙ্গধীঃ ॥ ২

তিনি বিষ্ণুদ্বের কাছে ধন লইয়া যিদেশে বাণিজ্য গেলেন। (৫ম খ্লোক)। দস্যুরা ধন লুটিয়া লইয়া গেলে দরিদ্র সোমশর্মার বৈরাগ্যেদয় হইল। ভদ্রবাহুর কাছে তিনি সন্ন্যাস লইলেন। কিন্তু বিষ্ণুদ্বে তাহাকে টাকার জন্য চাপিয়া ধরিলে দৈব কৃপায় তিনি ঝগমুক্ত হন।

এই গ্রন্থে তাপ্রলিপিতে ধনী শ্রেষ্ঠী ধনদ্বের কথা আছে। (৫৬ং কথানক) ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দেবচন্দ্র কর্ণট ভাষায় রাজাবলীকথা রচনা করেন। তাহাতে ভদ্রবাহু চরিত কথা আছে। তাহা অনেকটা রত্নন্দীর বর্ণনার অনুরূপ। তাহাতে আরও কিছু কিছু তথ্যও জানা যায়। ইহাতে দেখা যায় ভদ্রবাহুর জন্মস্থান কোটিকষ্টুরের অর্থাৎ পৌড়ুবর্দ্ধনের রাজধানীতে ছিল। জৈন মহাগুরু জমুহামীর সমাধিস্থানে তীর্থ্যাত্মা প্রসঙ্গেই গোবর্দ্ধনাচার্য সেইখানে শুতকেবলী বিষ্ণু, নন্দীমিত্র, অপরাজিত এবং পঞ্চশত শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হন।

কবি চিদানন্দ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণট ভাষাতে মুনিবংশাভ্যুদয় কাব্য রচনা করেন। তাহাতেও ভদ্রবাহুর চরিত্র বর্ণিত। বাহ্য্যভয়ে এখানে তাহার বিষ্টারিত বর্ণনা দিলাম না।

শ্রবণ বেলগোলা প্রভৃতি দক্ষিণ জৈন তীর্থ্যামের বহুলেখের মধ্যে ভদ্রবাহুর নাম ও চরিত্র উৎকীর্ণ পাই। ভদ্রবাহু গুহায়ও সব লেখ আছে। সেই সমস্ত লেখগুলি দেখিলে ইতিহাস রসিকেরা বহু তথ্যের সঞ্চান পাইবেন। কাজেই নানাভাবেই দেখিতেছি ভদ্রবাহু ছিলেন পুড়ুবর্দ্ধন অর্থাৎ উক্ত বাংলাদেশের অধিবাসী।

এই ভদ্রবাহু যে বাঙালী ছিলেন তাহা তাঁহার কল্পসূত্র দেখিলেও বোঝা যায়। তিনি তাঁহার কল্পসূত্রের অন্তভাগে যতিধর্মনির্দেশক সমাচারী শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ‘যে সব সাধু ও সাধী (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সুস্থ ও সবল শরীর, তাঁহারা পর্যুষণকালে এই নয়টি জিনিস যেন গ্রহণ না করেনঃ দুঃখ, দৰ্শ, নবনীত, ঘৃত, তেল, শৰ্করা, মধু, মদ ও মাংস।’

মাংস তো জৈনদের বিশেষতঃ যতিদের এমনিতেই নিষিদ্ধ। তখনকার দিনে কি তাহা চলিত ছিল? অথবা মাংসাহারে অভ্যস্ত পুড়ুবর্দ্ধনের লোক হওয়ায় তিনি অন্ততঃ পর্যুষণকালে এই নিষেধটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র নদীর কথায় তিনি এই প্রকরণেই কুণালের পার্ষ্ববর্তী ইরাবতী নদীর কথায় মজা করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘যাহাতে এক পা ডুবাইয়া আর এক পা শূন্য পথেই অন্য পারে নেওয়া যায়।’ (১৩)

পশ্চিম ভারতের ছেট ছেট তথাকথিত নদী দেখিলে বাংলাদেশের লোকের এই কথাই মনে হয়।

স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ভদ্রবাহু বড় সাবধান। তিনি বলেন, পর্যুষণকালে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ যে সব স্থানে মলমূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন তাহা যেন বার বার ভালো করিয়া দেখেন, অর্থাৎ সে সব স্থান যেন ঘলিন না হয়। (৫৫)

ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র যে জাতকের জন্মের বষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠীদেবী আসিয়া কপালে শিশুর ভবিষ্যৎ ভাগ্য লিখিয়া দেন ইহা বাংলার একটি বিশেষ বিশ্বাস। এই সংস্কারটি কি পুড়ুবর্দ্ধন ইহিতে ভদ্রবাহু মহারাষ্ট্র কর্ণট পর্যন্ত সমগ্র জৈনদেশে প্রচলিত করিলেন? এই সংস্কারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।<sup>১০</sup>

॥ ৩ ॥

জৈন প্রাকৃতের ও জৈন অপভ্রংশের সঙ্গে বাংলার প্রাকৃতের ও অপভ্রংশের মিল আছে। এমন কি বাংলার সংস্কৃত রচনাতেও তাহা অনেক সময় দেখা যায়।

বাংলায় ন্যায়শাস্ত্র ও জৈন সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার আলোচনা আরও ভালৱাপে হওয়া প্রয়োজন।

জৈন কল্পসূত্রের স্থবরাবলীতে দেখা যায় ভদ্রবাহু ছিলেন প্রাচীন গোত্রীয়। তাঁহার কাশ্যপ গোত্রীয় চারিজন শিষ্য। শুত কেবলী আদি ভদ্রবাহুর সেই শিষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে এক শিষ্যের নাম গোদাসগণি (৬, ৯), গোদাসগণীর শিষ্য সন্ততির চারটি শাখার উল্লেখ সেখানেই পাই। তাহার প্রথম শাখা ‘তাপ্রলিঙ্গিয়া’

(তাত্ত্বিকলিপ্তীয়া), দ্বিতীয় শাখা ‘কোটিবরিসিয়া’ (কোটিবর্ষীয়া), তৃতীয় শাখার নাম ‘পোংডুবৰ্দ্ধনিয়া’ (পৌডুবৰ্দ্ধনিয়া), চতুর্থ শাখার নাম ‘দাসীখবৰডিয়া’।

এখানে সেই যুগের ভূগোলগত তথ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম কাহারও কাহারও তাহাতে একটু মতভেদও আছে। তাই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নেপালরাজার গুরু শ্রীহেমচন্দ্র শর্মা তাহার সুলিখিত কাশ্যপ সংহিতার ভূমিকায় (১৩৭ পঃ) লিখিয়াছেন যে কোটিবর্ষ হইল বর্তমান কাটোরা (কাটোয়া)। শব্দ সাম্যে তাহা যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও আমরা শাসনলিপিতে একটু অন্যরকম দেখিতেছি।

পার্জিতার সাহেবের মতে পুঁড় ও পৌঁড় ভিন্ন। স্থান পুঁড় হইল গঙ্গার উত্তরে, পৌঁড়দেশ গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান বীরভূম জেলায়।

তাত্ত্বিকলিপ্তের নাম সুবিখ্যাত। মহাভারতে ভূমের দিঘিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকলিপ্তের সঙ্গে কর্বট দেশের নাম আছে।

তাত্ত্বিকলিপ্তঃ চ রাজানং কর্বটাধিপতিৎ তথা।

— সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়, ২২৪

কাজেই তাত্ত্বিকলিপ্তের সঙ্গেই কর্বটের নাম।

বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় দেখি—

ব্যাঘ্রমুখ সূক্ষ্ম কর্বট চন্দ্রষ্টপুরাঃ। (১৪৫)

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও কর্বটশাসন নামে মানবাচলের পরই চন্দ্রেশ্বরের নাম (৫৮, ১১)। ইহাতে মনে হয় কর্বট সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিকলিপ্তের কাছাকাছি। যেদিনী পুরের কাছাকাছিই কর্বট দেশ ছিল।

কোটিবর্ষ বিষয়ে আমরা পুরাতন তাত্ত্বিকশাসনে অনেক উল্লেখ পাই।

বাংলাদেশের অনেকগুলি তাত্ত্বিকশাসনেই কোটিবর্ষের নাম দেখিতে পাই। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আমগাছি গ্রামে তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবের একখানি তাত্ত্বিকশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় পুঁড়বৰ্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোটিবর্ষ বিষয় (২৪ পংক্তি)। দিনাজপুরের অন্তর্গত বাগড়ের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে প্রথম মহীপাল দেবের একখানি তাত্ত্বিকশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় পরম সৌগত রাজা মহীপালদেব তাহার নবম রাজ্যক্ষে পুঁড়বৰ্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে (৩০, ৩১ পংক্তি) চৃটপল্লিকাবর্জিত কুরট পল্লিকা গ্রাম বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি দিনে কৃষ্ণদিত্য দেবশর্মাকে দান করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে পুঁক্ষরিণী খনন কালে

মদনপাল দেবের একখানি তাত্ত্বিকশাসন পাওয়া যায়। পরম সৌগত রাজা মদনপাল দেব তাহার অষ্টম রাজ্যক্ষে মহারাণী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভারত শুনাইবার দক্ষিণারূপে চম্পাহিটি গ্রামবাসী বটেশ্বরস্বামী শর্মাকে পুঁড়বৰ্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে কোটিবর্ষ বিষয়ে (৩২ পংক্তি) ইলাবর্ত মণ্ডলে কোষ্টগিরি গ্রামে ভূমিদান করিয়াছেন।

১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিউটিউশন কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে বগুড়ার মহাস্থানগড়েই পুরাতন পুঁড়বৰ্দ্ধনের স্থান। এখানে বহু জৈন মূর্তিও পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের কথাও কেহ কেহ মনে করেন।

দেখা যাইতেছে পুঁড়বৰ্দ্ধন ভুক্তির বা প্রদেশ ভাগের অন্তর্গত কোটিবর্ষ একটি বিষয় বা জেলা। এখন পুঁড়বৰ্দ্ধনের একটি জৈন সম্প্রদায় শাখা থাকা সত্ত্বেও যখন তাহার অন্তর্গত কোটিবর্ষে আর একটি স্বতন্ত্র শাখা থাকার প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল তখন বুঝাই যায় উত্তরবঙ্গে জৈনমতের কতদূর প্রবলতা তখন ছিল।

তাত্ত্বিকশি, পুঁড়বৰ্দ্ধন, কোটিবর্ষ, কর্বট প্রভৃতি নামে দেখা যায় তখনকার দেশের বিখ্যাত সব স্থান।

আমার শ্রদ্ধাভাজন পরম বন্ধু মুনি জিনবিজয়জী ১৯৩৮ সালের ২ৱা এপ্রিল তারিখে আমাকে এক পত্রে লিখিতেছেন যে বঙ্গদেশে ভদ্রবাহুর বহু শিষ্য ও বহু কেন্দ্রস্থান ছিল। এখনও সিংভূম, মানভূম, ময়ুরভূম প্রভৃতি প্রদেশে জৈন ধর্মের বহু অবশেষ দেখা যায়।

বাংলায় অনেক শব্দের সঙ্গে জৈন শব্দের বিলক্ষণ মিল দেখা যায়। জৈন সাহিত্যে ‘পল্লীগ্রাম’ শব্দের রীতিমত ব্যবহার দেখা যায়।<sup>৪০</sup>

জৈন সাধুদের উত্তরীয়ের নাম ‘পছেটী’, রাঠে উত্তরীয়কে প্রাচীনেরা বলিতেন ‘পাছাড়ী’। এই শব্দটি এখনো গ্রামে লুপ্ত হয় নাই। ধূলা ঝাড়িবার জন্য (রঞ্জেহরণার্থ) জৈন সাধুরা যে ঝাঁটা ব্যবহার করেন তাহাকে তাহারা ‘পীছা’ বলেন। পূর্ববঙ্গে ঝাঁটাকে বলে ‘পিছা’। এইরূপ কত আর নাম করিব? ঢাকা জেলার লোহজংঘ নামটিও জৈনতীর্থকল্পে পাওয়া যায়।<sup>৪১</sup>

নামের ও উপাধির দ্বারা জৈন সাধনা ও বঙ্গদেশের মধ্যে যে যোগ দেখা যায় তাহার কথা পুরৈই বলা হইয়াছে।

৪০. Indian Historical Quarterly, ১৯৩৩, পৃ. ৭২২; প্রবক্ত চিত্রামপি, মুসলাদি প্রবক্ত, ২০২, পৃ. ১০৭।

৪১. সিংহী জৈন গ্রন্থমালা, অপাপাবৃহৎকল, পৃ. ৪১।

পুরাতন বাংলা লিপির সঙ্গে জৈন লিপির যতটা মিল দেখা যায় এতটা মিল নাগরী লিপির সঙ্গে দেখা যায় না। এই সাম্যতি বিশেষ করিয়া বুঝা যায় যুক্তাক্ষরণে দেখিলে। গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড় ও রাজস্থানের বহু জৈন পণ্ডিত এই সাম্যের হেতু কি তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

১৩৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীজিন প্রভসূরি রচিত বিবিধ তীর্থকল্পে জৈনতীর্থ পুন্ডুবর্দ্ধনের নাম পাই। পুন্ডুপর্বতের কথা ও আছে।<sup>৪১(ক)</sup>

পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহে জয়চন্দ্র প্রবন্ধে ‘বঙ্গালদেশে লক্ষণাবতী পুরী তত্ত্ব লক্ষণ সেনো রাজা। তস্য দুর্যো দুর্গাহ্যঃ’ ইত্যাদি কথা আছে।<sup>৪১(খ)</sup> ৩৮ নং শ্রীমাতা প্রবন্ধে দেখা যায় লক্ষণাবতী পুরীর রাজা লক্ষণ সেন এক নারীর প্রাণ হরণ করিতে চান, কারণ সেই নারীর পুত্র রাজা হইবে এইরূপ কথা ছিল। পরে সেই নারী প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন ও তাঁর পৌত্রী পরম তপস্বিনী হন। তিনিই শ্রীমাতা।<sup>৪২</sup>

লক্ষণাবতী নগরে রাজা লক্ষণ সেন ও তাঁহার মন্ত্রী উমাপতি ধরের কথা মেরতুস্মাচার্য তাঁহার প্রবন্ধচিত্তামণি গ্রহে চমৎকার চিত্রিত করিয়াছেন। রাজা চঙ্গল কল্যান প্রেমে আসক্ত হইলে উমাপতি ধর তাঁহাকে যে শ্লোক দ্বারা সাবধান করেন তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।<sup>৪৩</sup>

প্রবন্ধকোষে রাজশেখর সুরিও এই গল্পটি করিয়াছেন। সেখানে মাতঙ্গী প্রেমাসন্ত চিন্ত আম রাজাকে বন্ধুভূতি শ্লোক লিখিয়া সাবধান করিতেছেন। উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় নীতি শ্লোকগুলি একই।<sup>৪৪</sup>

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রাজশেখর সুরিকৃত প্রবন্ধকোষে লক্ষণাবতীর কথা আছে। সেখানকার রাজা লক্ষণ সেন এবং সেখানকার দুর্গ দুর্গঃ।<sup>৪৫</sup>

জৈনাচার্য রাজশেখর সুরীর প্রবন্ধকোষে বিংশ প্রবন্ধের নামই লক্ষণ সেন কুমারদেব প্রবন্ধ। মেরতুস্মাচার্যের প্রবন্ধচিত্তামণির পঞ্চম প্রকাশে পাই লক্ষণ সেন উমাপতি ধর প্রবন্ধ।

জৈনাচার্য ছাড়াও রাজপুতনায় ডিংগল সাহিত্যে লক্ষণ সেনের নাম পোঁছিয়া ছিল। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে কবি দামো লক্ষণ সেন পদ্মাবতী চ উপর্হদ নামে

৪১ক. চতুর সুরি, মহাতীর্থনামসংগ্রহকল্প, পৃ.৮৬।

৪১খ. শিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, পৃ.৮৮।

৪১ঁ. পুরাতন প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ.৮৮।

৪১৩. শিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, পৃ.১১২-১৩।

৪১৪. শর্মাট্যাসূরি প্রবন্ধ, পৃ.৩৮।

৪১৫. শিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, পৃ.৮৮।

কাব্য রচনা করেন। তাহাতে লক্ষণ সেন ও পদ্মাবতীর প্রেম কাহিনী বর্ণিত।

প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে গোড়দেশে লক্ষণাবতী নগরে ধর্ম নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় কবিরাজ বাক্পতি ছিলেন সভাসদ। জৈনাচার্য বন্ধুভূতির বিদ্যায় ও গুণে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষণাবতী রাজ তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করেন।<sup>৪৬</sup>

বন্ধুভূতি রাজা ধর্মের সৎকারে লক্ষণাবতী নগরেই রহিয়া গেলে গোপগিরির রাজ আম নৃপতি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে লক্ষণাবতী যান। আম রাজা লক্ষণ সেনের বার-স্ত্রীর গ্রহে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।<sup>৪৭</sup>

তখন গোড় লক্ষণাবতীতে বন্ধুন্কুঞ্জের নামে একজন অসাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বন্ধুভূতি তাঁহাকে বিদ্যা বলে অজেয় জানিয়া কৌশলে পরাভূত করেন।<sup>৪৮</sup>

রাজা যশোধর্ম লক্ষণাবতী জয় করিয়া রাজা ধর্মকে হত্যা করেন এবং বাকপতি কবিরাজকে বন্দী করেন। বন্দীশালায় বাকপতি গোড়বধ কাব্য রচনা করেন। তাহাতে তিনি মুক্ত হইয়া বন্ধুভূতির কাছে যান ও সেখানকার রাজা আমকে মহামোহ বিজয় নামে প্রাকৃত কাব্য শুনাইয়া সন্তুষ্ট করেন ও বহু পুরস্কৃত হন।<sup>৪৯</sup>

বাকপতি প্রথমে নাকি মহাভারত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বৈপায়ন আসিয়া তাঁহাকে ভারত রচনা ও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে নিষেধ করেন।

তাই তিনি গোড়বধ নামে প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন।<sup>৫০</sup>

পূর্বদেশে লক্ষণাবতী নগরে লক্ষণসেন নামে ‘প্রতাপী’ ও ‘ন্যায়ী’ রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন প্রজ্ঞাবিদ্রমভক্তিসার কুমারদেব। বারাণসীরাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জয়স্তচন্দ্র লক্ষণাবতী আক্রমণ করিলে কুমারদেবের বুদ্ধিবলে লক্ষণসেনের সঙ্গে জয়স্তচন্দ্রের শক্রতা গিয়া মিত্রতা স্থাপিত হয়।<sup>৫১</sup>

৪৬. প্রবন্ধকোষ, বন্ধুভূতি সুরি প্রবন্ধ, পৃ. ৩০।

৪৭. ঐ, পৃ. ৩৩।

৪৮. ঐ, পৃ. ৩৫।

৪৯. ঐ, পৃ. ৩৭।

৫০. পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃ. ১২২।

৫১. ঐ, লক্ষণসেন কুমারদেব প্রবন্ধ, পৃ. ৮৮।

## বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব

রামপ্রসাদ মজুমদার

ভারতবর্ষের তথ্য বঙ্গদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে স্থুলতঃ তিনি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন। ব্রাহ্মণ-সভ্যতা বা গোঁড়া হিন্দুয়ানী যে অনেকদিন ধরে বাঙালী সমাজে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে প্রভৃতি করেছিল ও এখনও প্রবল তা সহজে বোঝা যায়। ঐতিহাসিক, আনুষ্ঠানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়েই একথা বলছি। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। রাজা শশাক্তের কালে (৭ম শতক) মুর্শিদাবাদে ‘রক্তমূর্তিকা’ বিহারে বা কর্ণসুবর্ণে ও মেদিনীপুরের ‘তাম্রলিপ্তে’ বৌদ্ধ সভ্যতা ছিল, পরবর্তী পাল রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন, আবার পালযুগের শেষে বা সেন যুগে ঢাকার বজ্রযোগিনী অঞ্চল ও নানা স্থলে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। চর্যাপদে এমন কি খনার বচন বা ডাকের বচন প্রভৃতিতেও বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতা সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে জৈন সভ্যতা নিয়ে এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় তেমন হয়নি। এর কারণ বোধ হয় জৈন সভ্যতার দান তুলনায় অল্প মনে করা হয়; আরও একটি কারণ জৈন সাহিত্য-প্রধানতঃ পুঁথির মধ্যেই দীর্ঘকাল থাকায় লোকচক্ষে তেমন প্রকাশিত হয়নি।

ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন মতগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখান কিন্তু খুব সহজ মনে হয় না। ঋগ্বেদাদির মধ্যে এমন কি মহেঝেদাড়ো সভ্যতার মধ্যেও এই তিনের কয়েকটি মৌলিক আদর্শ অল্পবিস্তর নিহিত রয়েছে একথা কেউ-কেউ (বর্তমান লেখকও তর্মধ্যে) বলেছেন। ঋগ্বেদের মধ্যেই সর্প-ঝৰি, বয়ঃপেক্ষী বলা হয়। ঝৰি (তার্ক্য) অরিষ্ট-নেমি প্রভৃতি ঝৰি ও নানাপ্রকারে জাত ও নানা বিরঞ্জন মতের ঝৰি ও রয়েছেন; ব্রাহ্মণি গ্রন্থেও একেবারে ব্যতিক্রম নয়। পুরাণাদিতে ত স্বায়ভব মঘস্তুরাদি ও জন্মুদ্বীপাদি বর্ণনে ঝৰভদ্বে (আদি জৈন) তৎপুত্র ভরত (১ম) প্রভৃতির ও অবতার বর্ণনাদিতে (বুদ্ধের বা গৌতমের) বিষ্ণুর অবতাররূপ নানা বর্ণনা রয়েছে। আর্য অবদান ও অনার্য অবদান নিয়ে কথাতেও এই ধরণের নানা বিতর্ক উঠে পড়ে। মহেঝেদাড়োর ধ্যানী ঘোগী মূর্তিকে পশুপতিমূর্তি বলা হয়, এর সঙ্গে ঋগ্বেদের ‘রুদ্র’ বা ‘মহোদেবো’-র তুলনাও কেউ কেউ করেছেন, মহেঝের নামে চতুর্দশ মাহেশ্বর সুত্রের উপর বিখ্যাত পাণিনির ব্যাকরণ-বেদাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। পাণিনির শিক্ষা বেদাঙ্গও।

‘ত্রিষষ্ঠিশতুঃষষ্ঠীর্বা বর্ণঃ শস্ত্রমতে মতাঃ’... “৯” শস্ত্রের নাম। শিবকে নিয়ে অনার্য-দেবতা সাজান বা ‘কচুনীপাড়া’ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করা সাহিত্যিকদের ও সমালোচকদের পক্ষে সহজ হয়েছে। এই শিবেরই সংসারভূক্ত রূপে অংশিকা উমা বা দুর্গা, গণেশ-কার্তিকের প্রভৃতিকে— এমন কি পরবর্তী সাহিত্যে চষ্ণি, মনসা প্রভৃতিকে বিশেষভাবে পাই। ‘হৈমবতী উমা’ উপনিষদে ইন্দ্রাদির দর্পচৰ্ষকারী। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে রুদ্র ও অংশিকাকে ভাই-ভাগিনী রূপে দেখা যায়। নারী বা দেবীরূপে ঋগ্বেদে ‘অম্বা’ ও ‘নগা’ শব্দের প্রয়োগ আছে, আবার সিংহবাহিনী দেবীরূপে ‘ননা’র মূর্তি— কমরেশী দু’হাজার বছর পূর্বের তৈরী বা খোদাই করা, এসিয়া মাইনর প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, আর ঐরূপ মূর্তি মৌন ও খনের (Mon-Khmer) সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-শ্যাম অঞ্চলে পাওয়া যায়।

এইবারে জৈন প্রসঙ্গে বলি। উক্ত ‘অংশিকা’ দেবী যক্ষিণীরূপে জৈন সম্প্রদায়ে পুজিতা তা বলা যায়, কমরেশী দেড় হাজার বছর পূর্বের মূর্তি পশ্চিম ভারতে/৪৩৭/ পাওয়া যায়, প্রাচীনতম সরস্বতী মূর্তি জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপুতানা-সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায়। সরস্বতীতে পুরাণাদিতে দুর্গার কাম্যরূপ ধরা হয়, ঋগ্বেদের ‘বাক্’ আঙ্গুণি’র সুস্তুটি দেবীসূত্ররূপে দুর্গাপূজা বা চষ্ণিপাঠে পঢ়িত হয়, উক্ত ‘বাক্’ দুর্গার প্রতীক না বাধেবী সরস্বতীর প্রতীক তা সহজেই বলা যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক শুরু পরম্পরা বর্ণনে ৩০/৪০টি নামের মধ্যে প্রথম দিকেই ‘অস্তগের কন্যা বাক্’কে পাওয়া যায়। অতএব স্থুল হিসাবে উপনিষদকে ৬০০ খঃ পূঃ ধরলে উক্ত ‘বাক্’ পূর্বের। ঋগ্বেদের ‘সরস্বতী’-প্রসঙ্গে নদীরূপে বা দেবীরূপে ব্যাখ্যাত হয় ত অংশিকা ও সরস্বতীর প্রাচীন মূর্তির দিকে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে হয় ত তারাই এই দুই দেবীকে মূর্তিরূপে তথ্য বস্তে পূর্বে প্রচার করেছে। উল্লেখ হিসাবে মহাভারতে (খঃ পৃঃ- খঃ অব্দ) দুর্গা প্রভৃতির কথা আছে।

আচারাঙ্গ-সূত্র বনাম ভগবতী-সূত্রঃ দু’হাজার বছর পূর্বের জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে দেখা যায় যে ‘সুব্রত’ বা সুবন্নের অধিবাসীরা রুক্ষভাবে জৈন তীর্থঙ্কর ও জৈনদের পিছনে ছুক-ছুক শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ জৈন মতকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে জৈনেরা এদের ‘অনার্য’ বলেনি। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ ‘পঞ্চাপণা’ বা প্রজ্ঞাপনা সূত্রে তথ্য প্রায় ২৪০০ হাজার বছর পূর্বে লিখিত বা সংকলিত জৈন ‘ভগবতীসূত্রে’ লার বা ‘রাত’ প্রভৃতির লোককে ‘আর্য’ বলা হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আর্য জনপদগুলির তালিকায় বস্তের (কোনও পাঠে) ত্রিলিঙ্গ রাজধানী রূপে তাম্রলিপ্ত ও ‘লাড়ে’র বা লাঢ়ের রাজধানী রূপে ত্রিলিঙ্গ রাজধানী রূপে কোড়িবরিষৎ লাভায়” প্রজ্ঞাপনা মতেও)

ধরে এদের ‘আর্য’দেশ বলা হয়েছে। হিন্দুসমন্বয়ে বৌদ্ধমত বাধা পেলেও বুদ্ধদেব যখন বঙ্গদেশের স্থানবিশেষ ঘুরে গেছেন ও বঙ্গীয়রা (বঙ্গাধিপতি) তার শিষ্যবন্ধুপে মিলিন্দপত্রহো (মিলিন্দ বা মিলান্দারের প্রশ্ন) ইত্যাদিতে বিশেষরূপে সম্মানিত হয়েছেন তেমনি তৈর্থকর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি বঙ্গদেশের অংশবিশেষ ঘুরে গেছেন একথা জৈন সাহিত্যে দেখা যায়। বাংলার পাশে পরেশনাথ-পর্বত প্রভৃতিতে জৈন আধিপত্য ছিল বলা যায়।

দেৰাচনা : এ প্ৰসঙ্গে পুৰোহীতি কিছু বলেছি, এখন বিখ্যাত ও জৈন নিপিত্তে  
প্ৰাণ্প (পঞ্জাব অঞ্চল) ও প্ৰকাশিত জৈনগ্রন্থ ‘কথাকোষ’ হতে কয়েকটি  
অনুষ্ঠানের উল্লেখ কৰছি— যেগুলি বাঙালীৰ মধ্যে সুপ্ৰতিষ্ঠিত এবং অন্যমতে  
দণ্ডিভ-প্ৰায়।

(১) বীতাগ-পূজাপ্রসঙ্গে “লক্ষ্মীঃ চঞ্চলাং বিমৃশ্য”, অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ।

(২) বিশেষ বিশেষ তীর্থকরের “বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা” বা “পাঠভেদ-প্রতিকৃতিৎঃ” বিস্মিত প্রতীকরাপে খোদাই করা হত বা আঁকা হত। ‘চাতুর্সিক পর্বণি পুষ্পচতুস-সরিকঃ’ অর্থাৎ ফুলের ব্যবহার। বৈদিক সাহিত্যে ফুল দিয়ে উপাসনা বা ‘পূজা’ শব্দের প্রয়োগ নেই, অতএব তা ছিল না; একথা কেউ কেউ বলেন। ও এত সত্য হটক, বা না হটক জৈনদের মধ্যে এইসব রীতি ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। প্রতিমা সম্বন্ধেও একথা কিছুটা বলা যায়, যেমন ‘শৈলময়ীং জিনপ্রতিমাং দৃষ্টবান्’। ‘ব্রত’ শব্দ বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, জৈনদের মধ্যেও; ‘ব্রত, জুতগৃহঃ’ শ্রাবক আরাম প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও আদরের বস্তু। যোগিনী বৌদ্ধতত্ত্বে খ্যাতিযুক্ত। উক্ত কোষে যোগিনীর প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু এদের স্থান কি জানি না। এক প্রসঙ্গে শাকিনীর নিন্দা; ‘কিং তৎ শাকিনীভিঃ গৃহীতা...।’

(৩) আসন-পুজনাদি/ধ্যানে আসনের প্রাচীনতম উল্লেখ সম্ভবতঃ (দু'হাজার বছর পূর্বের) পাতঙ্গল যোগসূত্রে। কিন্তু আসনের বিবিধ নাম ও সংজ্ঞা আরও পরবর্তী—এই সাধারণ মত দু'হাজার বছরের বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি হতে কিন্তু আসনাদির রূপ বোঝা যায়। জৈনকোষে দেখি “তাবশ্মুনিবাক্যে বদ্ধ-পদ্মাসনো দৃষ্টঃ।” পূজ্য ও পূজাকাল প্রসঙ্গে আরও দেখি, “তৎ স্নায়ত্বা চন্দন-পুষ্পাক্ষত্তেঃ পরিপূজ্য.....,”/৪৩৮/নাগদত্তের জিনপ্রাসাদ-গমন প্রসঙ্গে “ত্রিবেলাং যাতি”। তন্ত্রাদি মতে ফুল-চন্দন, অক্ষত বা আতপ চাল প্রভৃতির দ্বারা যেমন পূজাবিধান, এখানেও তাই; ঐরূপ ত্রিসংযোগ মত ত্রি-বেলার কথা। দ্বিপালী উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতির প্রসঙ্গে এই কোষে তথা অন্যত্র জৈন-

গ্রহণ আছে। এই কোষে ‘গোড়দেশে’ ‘চম্পা’ শ্রীপুর হতে ‘রঞ্জনীপে’  
বণিকদের গমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ নানাভাবে আছে। উক্ত শ্রীপুর ঢাকার নিকটেও  
ঠান্ডা রায় প্রভৃতির রাজধানীরপে বিখ্যাত শ্রীপুর বলে মনে হয়। আসানসোল,  
রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে যে সব প্রস্তরমূর্তি দেখেছি তার কয়েকটি জৈন বলেই  
শুনেছি ও তাই মনে হয়েছে। হনুমান ও মহাবীরের পুজা উক্ত কোষেও আছে।  
আর ঐরূপ অর্বাচীন মূর্তি বাংলার নানাস্থানে তো দেখাই যাব।

(8) রাম-কাহিনী। এক অব্যাচন রামতাপনীয় উপনিষদে রামসীতার কাহিনী আছে, সম্ভবতঃ রাবণ-কাহিনী নাই। বৌদ্ধ ‘দশরথ জাতকে’ রাম ও সীতাকে ভাই-বোনরূপে ধরা হয়েছে, উক্ত কোষে কিন্তু শ্লোকে সীতার পবিত্রতা ও অগ্নিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

পূর্বেক্ষ কতকগুলি রীতি পূরাণ-তন্ত্রাদি হতে (শেষ সংকলন কাল প্রায়ই খৃষ্টের বহুপরবর্তী বলে ধরা হয়) জৈনরা তথা আমরা নিয়েতি অথবা জৈনদের নিকট হতে অন্যেরা ও আমরা নিয়েছি, তা বিচারের বিষয়।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক : পালিভাষার ও বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থের শব্দের সঙ্গে  
বাংলাভাষার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার চেয়েও অনেক বেশী সাদৃশ্য প্রাকৃত  
বিশেষতঃ জৈন প্রাকৃত ও জৈন সংস্কৃত গ্রন্থের শব্দের সঙ্গে রয়েছে, এই কথাই  
আমার মনে হয়, বোধ হয় অনেকেই তা বলবেন। ধারাপাতে আমরা যেসব  
হিসাব ও গণনা শিখি তার কিছু কিছু কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র,  
পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থে, ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ইত্যাদি গ্রন্থে দেখা যায় বটে, কিন্তু  
ব্যাপকতর হিসাব-নিকাশ, যেমন বরাটক-গণক-কার্যাপণ প্রভৃতির ব্যাপক  
বিচার ইত্যাদি, তা জৈনসাহিত্যেই দেখা যায় যেমন সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষার  
'অংগবিজ্ঞা' (অংগবিদ্যা) 'ত্রিশতী' প্রভৃতি প্রাক-গুণ্ড্যুগের ও পরবর্তী গ্রন্থ  
হতে। পালিকে প্রাকৃতের শাখা ধরলেও পালি ও প্রাকৃত-অপভ্রংশে সাধারণভাবে  
হতে। পালিকে প্রাকৃতের শাখা ধরলেও পালি ও প্রাকৃত-অপভ্রংশে  
বহুভেদ। কতকগুলি বাংলা লোকিক শব্দ যার প্রয়োগ পালি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতে  
দেখা যায় না বা সহজে পাওয়া যায় না তা জৈন সংস্কৃত বা প্রাকৃতে মেলে।  
জৈন ও পশ্চিমী হেমচন্দ্র (১২শ শতক) রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ ও কোষ, পূর্ব  
জৈন ও পশ্চিমী হেমচন্দ্র (১২শ শতক) রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ ও কোষ, পূর্ব  
ভারতীয় ও হয় ত বাঙালী পুরুষোত্তমের (১২শ শতক) প্রাকৃতানুশাসন  
ব্যাকরণে ও অন্যান্য প্রাকৃতগ্রন্থে এরূপ বহু শব্দ পাওয়া যায়। উক্ত কথাকেয়ে  
হতে করেকটি মাত্র শব্দের নমুনা দিচ্ছি, এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রাকৃত গ্রন্থেও বোধ  
করি অনুপস্থিত বা বিরল। অছ (অস্-থাকা) থক (হৃ-থাকা) প্রভৃতি বহুভূলে  
আছে, এবারে দেখুন :

- (১) খাটায় (চালায়) অর্থে “হালিক.....হলং খেটয়তি”।
- (২) চড়া (আরোহণে), “পর্বতে চটিতা কালং কুর্বন্ কামাশ্রবণীং কুরতে’৪।  
“কোপে চটিতঃ”।
- (৩) ছড়ান অক্ষতেঃ দৃঢ়ঠয়েথা। দুঃঠিতঃ সজীবো বভুব।”
- (৪) সন্তবতঃ ছোটা (ধাবন) অর্থে, সম্পূর্ণ “আয়ুষি চূহা.....বণিক বভুব।”
- (৫) হাঁকা, “কুমারেণ হাকিতঃ পুরুষঃ— রে রে দুরাচার।”
- (৬) মাগা (চাওয়া), “মাগয়স মনোবাঞ্ছিতম।” ‘একুপ’ ছড়ান, ঢালা, ঢোলান  
প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগও আছে।

এইরূপে নানাভাবে ভেবে দেখলে জৈন প্রভাব বাঙালীর সভ্যতা, আচারে  
ও ভাষায় রয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে হোক, একথা কতকটা  
জোরের সঙ্গে বলা যায়।\*

## বাংলাদেশের গুপ্তকালীন জৈন তাত্ত্বিকানন্দ

### ছোটেলাল জৈন

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাদলগাছী থানার অস্তর্গত ও কলকাতা  
থেকে ১৮৯ মাইল উত্তরে ও জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে  
পাহাড়পুর গ্রামটি অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ৮১ বীঘা  
জমিতে ছড়িয়ে আছে যার চারদিকে ইঁটের প্রাচীর দেওয়া। এর মধ্যের ঢীলা  
বেশ উঁচু হওয়ায় গ্রামের লোক একে পাহাড় বলে অভিহিত করে। ফলে গ্রামের  
নামই পাহাড়পুর হয়ে গেছে। এর নিকটেই নদীখাতের চিহ্ন দেখা যায় তাতে  
মনে হয় এখানে কখনো নদী প্রবাহিত হত। এই স্থানটির ধ্বংসের এক কারণ  
বন্যা বলে মনে হয়, কারণ এর শূন্য বেদী ও অন্য ব্যবহৃত সামগ্রীর অনুপস্থিতি  
এই সিদ্ধ করে যে এই স্থানটি সহসা পরিত্যক্ত হয় নি। দ্বিতীয় কারণ ১৩  
শতকের প্রারম্ভে মুসলমানেরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তখন অনেক হিন্দু  
মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়পুরের মন্দিরকেও ধ্বংস করে থাকবে।

এই ঢীলার সবচেয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ গুপ্তাব্দ ১৫৯-এর এক তাত্ত্বিক।  
এখানে পাওয়া বিভিন্ন সামগ্রীর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে এক সময়  
পাহাড়পুরে জৈন, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ এই তিনি সংস্কৃতির উন্নতিবৰ্দ্ধক কেন্দ্র ছিল।  
এজন্য অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক যাত্রীর দল এখানে এসে যেমন পাহাড়পুরের  
প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শিত করত, তেমনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক  
ছাত্র ও বিদ্যার্থ্যনের জন্য এখানে এসে বসবাস করত। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর  
পূর্বাব্দ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এর খ্যাতি অতিশয়রূপে বর্তমান ছিল।

এখানে পাওয়া লেখ (তাত্ত্বিকানন্দ ও মুম্বয় মুদ্রিকাসমূহ (sealings) থেকে  
ভিন্ন ভিন্ন দুই সময়ের দুই বিহারের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়।

গুপ্তাব্দ ১৫৯ (খঃ ৪৭৮-৭৯)-এর এই তাত্ত্বিক শাসনে বটগোহালী গ্রামস্থ শ্রী  
গুহনন্দার এক জৈন বিহারের উল্লেখ আছে। এতে পৌড়বৰ্দ্ধনের বিভিন্ন গ্রামে  
ভূমি ক্রয় করে এক ব্রাহ্মণ দম্পত্তি বটগোহালীর জৈন বিহারের জন্য যে  
অনুদান দেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাহাড়পুর সংলগ্ন পশ্চিমের দিকে  
অবস্থিত বটগোহালী (বর্তমান গোয়ালভাটা) নামক যে গ্রাম আছে সেই গ্রাম  
পর্যন্ত মন্দিরের সীমা বিস্তৃত ছিল।

\* প্রবাসী, মাঘ ১৩৭৭ থেকে সংকলিত, শ্রী অরুণচাঁদ দন্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৮০৭ সালে ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন যখন এখানে আসেন তখন তাঁকে এই টীলা (যার ভেতরে এই মন্দির অবস্থিত ছিল) দেখিয়ে একে গোয়ালভীটার পাহাড় বলে অভিহিত করা হয়। এই নিবন্ধে উল্লিখিত বটগোহালীর জৈন বিহার নিশ্চয়ই পাহাড়পুরের এই মন্দিরের মূল স্থানে অবস্থিত ছিল ও সেকালের বটগোহালীই বর্তমান গোয়ালভীটায় রূপান্তরিত হয়েছে তা বলা যায়।

খঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ মৌর্যদের শাসনাধিকারে ছিল ও পুনৰ্বৰ্দ্ধন নগরে তাঁদের প্রাসীয় শাসক অবস্থান করতেন। গুপ্তকালেও বাংলার এই প্রাস্তের রাজধানী ছিল পুনৰ্বৰ্দ্ধন। আজকাল যে জায়গাটি মহাস্থান নামে প্রসিদ্ধ তাকেই প্রাচীনকালে পুনৰ্বৰ্দ্ধন বলত। পাহাড়পুর মহাস্থানের উত্তর-পশ্চিমে ২৯ মাইল ও বাগগড়ের (প্রাচীন কোটিবর্ষ) দক্ষিণ-পূর্বে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুই প্রধান নগরের নিকট এই মন্দির স্থাপিত করার কারণ মনে হয় এই ছিল যে শ্রমণেরা নগরের বাইরে একান্তে অবস্থান করে ধর্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাতে শাস্তিতে বিদ্যুভ্যাস করতে পারেন ও নগরবাসীরাও যাতে তাঁদের ধর্মোপদেশ থেকে বঞ্চিত না হন। দ্বিতীয়তঃ পুনৰ্বৰ্দ্ধন ও কোটিবর্ষ সেই সময় সেখানে জৈনদেরই প্রাধান্য ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভুত্বকালে যদিও জৈনদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছিল; কিন্তু বৌদ্ধদের প্রভাব তখন সেখানে খুব কমই ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনায় সেইরূপই অনুমতি হয়। তবুও সেইযুগে এখানকার আবহাওয়া পূর্ণতঃ সহিষ্ণু ছিল, কারণ জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু—এই তিনি সম্প্রদায়ের প্রাচীন সামগ্রী এখান থেকে পাওয়া গেছে।

ষষ্ঠ শতকের কোনো সময়ে এই মন্দিরের বৃদ্ধিকরণের কার্য শুরু করা হয় ও অট্টালিকার উচ্চতায় আরও বৃদ্ধি করা হয় যার ফলে সম্ভবতঃ মধ্যস্থিত প্রাচীন অট্টালিকা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

ষষ্ঠ শতক থেকে গুপ্তদের প্রভাব কম হতে থাকে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় মহারাজা শশাঙ্কের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাঙ্ক শৈব-ধর্মবলম্বী ছিলেন। তিনি জৈন ও বৌদ্ধদের ওপর খুব অত্যাচার করেন। তবুও জৈনরা এখানে একেবারে উৎখাত হয়ে যান নি। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে যখন এখানে আরাজকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন এখান থেকে জৈনধর্ম ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বটগোহালীর শ্রীগুহনন্দী জৈন বিহারও পুনৰ্বৰ্দ্ধন ও কোটিবর্ষের জৈন সংস্থানের মত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে যখন

এখানে শাস্তি স্থাপিত হয় তখন পাল সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও এই স্থানটি 'সোমপুর' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

পাল রাজাদের শাসন ৩৫০ বছর স্থায়ী হয়। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী ছিলেন। তাই এখানে জৈন প্রাধান্য ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় ও বৌদ্ধদের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই জৈন বিহারের ওপর তাঁদের পূর্ণ অধিকার হয়ে যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাল বংশের দ্বিতীয় সন্তান মহারাজ ধর্মপাল এই বিহারের ওপর এক মহাবিহার নির্মাণ করান। সেই সময় থেকে স্থানটি ধর্মপাল দেবের 'সোমপুর মহাবৌদ্ধ বিহার' এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই বিহারের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও এখানে দীপৎকর নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ভববিবেকের মধ্যমক রত্নপ্রদীপের অনুবাদ করেন। দশম ও একাদশ শতকের অট্টালিকা এখনো এখানে আছে।

পাহাড়পুরের এই পরবর্তী বৌদ্ধ মন্দিরে সামান্যই জৈন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের প্রবর্তী গুপ্তকালের অনেক শিলায় যে অল্প উভ্রেলিত ভাস্কর্য (basreliefs) ও পোড়ানো মাটির ফলক (plaques, terra-cotas) পাওয়া গেছে তাতে পঞ্চতন্ত্রাদি কথা সাহিত্যের প্রাচীন উপাখ্যান চিত্রিত হয়েছে। জনসাধারণের পূজা এরূপ স্থানে যেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয় সেখানে এরূপ চিত্র চিত্রিত অত্যাবশ্যকই নয় বরং অনিবার্য ছিল। এতে প্রমাণিত করে যে এগুলিতে যে দেবমূর্তি আছে তা পূজোর জন্য লাগানো হয়নি।<sup>১</sup> কোন সময় বিদ্বেষবশতঃ জৈন সামগ্রী এখান থেকে অবশ্যই অপসারিত করা হয়েছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ যিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে সোমপুরে এসেছিলেন সেখানকার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন— এখানে একশ দেব মন্দির আছে। কিন্তু এখানে নগ্ন নির্গুহ সবচেয়ে বেশি। এতে এককথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে পর্যন্ত এই বিহার নিশ্চয়ই জৈন ভিক্ষুদের আকৃষ্ট করত। ওই সময় এখানে বৌদ্ধ মঠাদি ছিল না।<sup>২</sup> হতে পারে অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি কিছুকাল ব্রাহ্মণদেরও এই মন্দিরের ওপর আধিপত্য হয়েছিল। তারপর বৌদ্ধরা এর ওপর নৃতন বিহার ও মঠ নির্মাণ করে একে আপন করে নেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকার এখানে বলবৎ থাকে— এককথা পাল বংশের বর্ণনাকালে করা হয়েছে।

১. পাহাড়পুরের দক্ষিণে ১ মাইল দূরে সোমপুর গ্রাম আছে। সেটাই সোমপুর ছিল।

২. Memoirs of A.S.I. No. 56, P.58.

৩. Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II, P.196 (Memoirs of A.S.I No.55, P.3)

চৈনিক পরিভাজকের আগমনের ১৫০ বছর পূর্বের এই তাত্ত্বিক জৈন প্রভাবের কেবল সমর্থনই করে না, একথাও প্রমাণিত করে যে এই বিহার অতি প্রাচীন ও এখানে ধারাবাহিকভাবে গুরু শিষ্যের পরম্পরা চলে এসেছে। আচার্য ভদ্রবাহু ও তাঁর শিষ্য গুপ্তিগুপ্ত (বিশাখাচার্য অর্হদবলি) আদি প্রসিদ্ধ জৈনাচার্যদের পটস্থান পুন্ডর্বর্দ্ধন ও কেটিবর্ষ ছিল। পুন্ডর্বর্দ্ধনের পটাচার্য মুনিসংঘের নিগ্রহ-অনুগ্রহ পূর্বক শাসন করতেন ও পাঁচবছর এক একশো জন ক্ষেত্রে নিবাসকারী মুনিদের একত্র করে যুগপ্রতিক্রিয়ণ করতেন।<sup>৪</sup> গুহনন্দীও সন্তবতঃ ভদ্রবাহু পরম্পরার আচার্য ছিলেন। আচার্যদের নন্দ্যান্তনাম প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। অর্হদবলি আচার্য নন্দী ও পঞ্চস্তপাশ্রয় স্থাপিত করেন। নন্দী বৃক্ষের মূলে বর্ষাযোগ ধারণ করায় নন্দীসংঘ এই নাম হয়। এর প্রথম আচার্য মাঘনন্দী। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের নন্দ্যান্ত নামে যশোনন্দী, জয়নন্দী, কুমারনন্দী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

### বিহার :

সোমপুরের (পাহাড়পুর) এই বিহারকে বৃহদাকার ও উন্নতরূপ দেবার কৃতীত্ব বৌদ্ধধর্ম-পরায়ণ প্রারম্ভের পাঁচ সপ্তাব্দীর। এর চারদিকে থায় দুশোটি কক্ষ আছে। এর আটালিকা পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ  $92.2 \times 91.9$  ফুট। ভারতবর্ষে এতবড় মঠ আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এর দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ৩৬১ ফুট ও প্রস্থ ৩১৯ ফুট। মন্দিরের তিনি খণ্ড (terraces) আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে চৈত্যগুণ (প্রদক্ষিণ মার্গ) আছে।

যে ধরণের নক্কার ওপর ভিত্তি করে এই মূল মন্দির নির্মিত হয়েছে সে ধরণের অন্য উদাহরণ আজ পর্যন্ত ভারতীয় পুরাতত্ত্বে পাওয়া যায়নি। প্রাচীন বৌদ্ধ স্তুপ থেকে এর বিকাশ হয়েছে সেকথাও বলা যায় না। তাই মনে হয় এই জায়গায় বা এর অতি নিকটে জৈনদের এক চতুর্মুখ মন্দির ছিল যার পুষ্টি এখানে পাওয়া তাত্ত্বিক হয়<sup>৫</sup> যার অনুকরণে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত পদ্মিত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত লিখছেন<sup>৬</sup> কুশানকালীন মথুরার জৈন স্তুপের (ককালী টীলা) অতিরিক্ত উত্তর ভারতে মধ্যকালের পূর্বের একটাও জৈন আটালিকা আজ পর্যন্ত

৪. ক্ষতাবতার কথা, প্লোক ৮০-৮১।

৫. Memoirs of A.S.I. No. 55, P.7.

৬. Archaeological Survey of India Report, 1937-28, P.28.

পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাহাড়পুরের পরবর্তী গুপ্তকালীন মন্দির ও প্রারম্ভিক পালকালীন বিহারকে মূল জৈন মন্দিরের প্রসারণ ও বৃদ্ধিকরণ স্থীকার করে নিলে বলা যাবে যে চার প্রবেশদ্বার-যুক্ত চতুরঙ্গ মন্দিরের বেদী চতুর্মুখ ছিল যেখানে অর্হতের চার প্রতিমা ছিল ও সন্তবতঃ মন্দিরের কিছু দূরে শ্রমণ বা জৈন মুনিদের জন্য এক মঠ ছিল। চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দির নির্মাণ করা জৈনদের মধ্যেই দেখা যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফারণসন চতুর্মুখ মন্দিরকে মূলতঃ জৈন বলেই অভিহিত করেছেন।<sup>৭</sup> চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দিরের উত্তর সমবসরণ থেকে হয়। এই ধরণের পরবর্তী কালীন জৈন মন্দির অনেক স্থানেই পাওয়া গেছে।

পাহাড়পুরের এই বিহার থেকে জৈন তাত্ত্বিক সম্পর্কে একটি ছোট জিনমূর্তি (ধাতুর) পাওয়া গেয়ে যার দুইদিকে দুই অস্পষ্ট মূর্তি যক্ষ বা শ্রাবকের। অর্হৎ কমলাসনে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই প্রতিমাটি গুপ্তকালীন মন্দির মনে হয়। এখন মহত্ত্বপূর্ণ সেই তাত্ত্বিক সম্পর্কের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।<sup>৮</sup>

পাহাড়পুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির খোদাই করাবার সময় ১৯২৭ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পণ্ডিত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত গুপ্ত স্বয়ং ১৫৭ (সন् ৪৭১)-র এই তাত্ত্বিক প্রাপ্ত হন। প্রধান মন্দিরের দ্বিতীয় খণ্ডের (terrace) প্রদক্ষিণার উত্তর-পুর্বদিকের পথের মাটি ও ভগ্ন ইষ্টক রাশির মধ্য থেকে এই তাত্ত্বিক পাওয়া যায়। তাই বলা যায় যে এই বিহারের অস্তিমাবস্থা পর্যন্ত সেই তাত্ত্বিক সম্পর্ক স্থানে রাজ্য দণ্ডে (archives) সুরক্ষিত ছিল।

এর কয়েকটি পংক্তি ও অক্ষর ঘনে গেছে ও মজুরদের অসাবধানতায় ওপরের দক্ষিণকোণে এক ছিদ্রও হয়ে গেছে। তবুও এই তাত্ত্বিক সম্পর্কের অবস্থা ভালো বলা যাবে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ  $31/4 \times 81/2$  ইঞ্চি ও ওজন ২৯ তোলা।

এর লিপি উত্তর ভারতের পঞ্চম শতাব্দী। ভাষা সংস্কৃত। শেষের পাঁচ অমঙ্গল প্রার্থী পদ্মের অতিরিক্ত সমস্ত লেখচি গদ্যে লিখিত।

### পাহাড়পুরের তাত্ত্বিক গুপ্তাব্দ ১৫৯ (খ্রীয় ৪৭১)

#### অগ্রভাগ

১. স্বষ্টি (II) পুন্ড (বর্দ্ধ) নাদ = আয়ুক্তকঃ<sup>৯</sup> আর্য-নগরশ্রেষ্ঠি-পুরোগাধি = আধিষ্ঠান-আধিকরণম্ দক্ষিণাংশক-বীথেয়-নাগিরট-

৭. History of India, Vol. II, Eastern Architecture P.25.

৮. Epigraphia Indica. Vol. XX, PP.59-64.

৯. তাপ পত্রে 'মৃক' অর্থ দৃঢ়য়ের অধিক আয়ুক্ত আছিল।

২. মাণিক-পলাশাট-পার্শ্বিক-বট-গোহালী-জমুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোতক-গোষা-ট্যুঞ্জক-মূল নাগিরট-প্রাবেশ্য-

৩. নিত্র-গোহালীয় ব্রাহ্মণ-ওন্দরান-মহত্তর-আদি কুড়িনিঃ কুশলম্-অনুবরাণ্য = আনুবোধয়তি (I) বিজ্ঞাপ্যত্য = অস্মান् ব্রাহ্মণ-নাথ

৪. শৰ্মা এতদ্ভার্যা রামী চ (I) যুগ্মাক্ষম ইহ = আধিষ্ঠান-আধিকরণে বিদীনারিক্ষয়-কুল্যবাপেন শশ্বৎ-কাল-ওপভোগ্য-আক্ষয়-নীবী-সমুদয়-বাহ্য-আ

৫. প্রতিকর-থিল-ক্ষেত্র-বাস্ত্র-বিক্রয়ো = নুবৃত্স = তদ্ব = অর্থ-আনেন এ.... বক্রমেণ-আবয়োস্-সকাশাদ্-দীনার-ত্রয়ম্-উপসংগৃহ্য-আবয়ো (স)-স্ব-পুণ্য-আপ্যা-

৬. যনায বট-গোহাল্যাম-অব<sup>১০</sup>-আস্যাং-কাশিক-পঞ্চতুপ-নিকায়িক<sup>১১</sup>-নিগ্রহ-শ্রমণ-আচার্য-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্য-আধিষ্ঠিত-বিহারে

৭. ভগবতাম-অর্হতাম-গঞ্জ-ধূপ-সুমনো-দীপ্তি-আদ্য-অর্থন-তল-বাটক-নিমিত্তঝঁ-চ অ (ত) এব বট-গোহালীতো বাস্ত্র-দ্রোগবাপম্-অধ্যুদ্ধান-জ-

৮. স্বুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোতকে<sup>১২</sup> ক্ষেত্র দ্রোগ-বাপ-চতুর্ষ্টয়ম গোষা-ট্পুঞ্জাদ্-দ্রোগবাপ-চতুর্ষ্টয়ম মূল নাগিরট-

৯. প্রাবেশ্যা-নিত্র-গোহালীতঃ অর্দ্ধ-ত্রিক-দ্রোগবাপান-ইত্য-এবম-অধ্যুদ্ধম ক্ষেত্র-কুল্যবাপম-আক্ষয়-নীব্যা দাতুম-ই (ত্য-অত্র) যতঃ প্রথম-

১০. পুষ্টপাল-দিবাকরনন্দি-পুষ্টপাল-ধৃতিবিশ্ব-বিরোচন-রামদাস-হরি-দাস-শশিনন্দি-যু প্রথমনু<sup>১৩</sup> (না) ম্ অবধারণ<sup>১৪</sup>-

১১. য-আবধৃতম অস্ত্র-অস্মদ্ অধিষ্ঠান-আধিকরণে দ্বি-দীনারিক্ষয়-কুল্যবাপেন শশ্বৎকাল-ওপভোগ্য-আক্ষয়-নীবী-সমু (দয়-বা) হয় আপ্তিকর-

১২. (থিল)-ক্ষেত্র-বাস্ত্র-বিক্রয়ো-নুবৃত্স-তদ-যদ-যুগ্মাম<sup>১৫</sup>-ব্রাহ্মণ-নাথ-শৰ্মা এতদ্ভার্যা রামী চ পলাশাট-পার্শ্বিক-বট-গোহালীস্ত্র (?)<sup>১৬</sup>-য

১০. এব পাঠ পড়ুন। H. Shastri connects the name with নব্যাবকশিকাঃ।

১১. ১৩ পঞ্জিতে পঞ্চস্তুপ-কুল-নিকায়িক আছে। এখানেও সেই অর্থেরই দ্যোতক। এর অর্থ পাঁচ নিকায়ের নয় এখানে নিকায় অর্থ (জ্ঞেনাচার্যদের) শাখা। পঞ্চস্তুপ কোনো স্থান নাম হওয়া উচিত। শ্রতাবতার কথায় সেন সংবের উৎপত্তি এভাবে হয়েছিল বলা হয়। যে মুনি পঞ্চস্তুপ থেকে এসেছেন তিনি সেন সংবের নামধারী হবেন।

১২. এখানে ৬ অধিক আছে।

১৩. এর পরের কিছু অক্ষর নষ্ট হয়ে গেছে।

১৪. দামোদরপুরের শাসনে মনে হয় অবধারণার আগে পুষ্টপালদের নাম ছিল।

১৫. যুগ্মান পড়ুন।

১৬. ওপরের ষষ্ঠ পঞ্জিতে সঙ্গে মিল করুন।

## পৃষ্ঠভাগ

১৩. (কাশি)...ক পঞ্চ-স্তুপ-কুল-নিকায়িক-আচার্য-নিগ্রহ-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্য-আধিষ্ঠিত-সদ্বিহারে অরহতাম<sup>১৭</sup> গঞ্জ-(ধূপ)-আদ্য উপরোগায়

১৪. (তল-ব) আটক-নিমিত্তঝঁ-চ তত্র-এব বটগোহাল্যাং বাস্ত্র-দ্রোগ-বাপম-অধ্যুদ্ধ ক্ষেত্রাঝঁ-জমুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোতকে দ্রোগবাপ-চতুর্ষ্টয়ঁ

১৫. গোষাটপুঞ্জাদ-দ্রোগবাপ-চতুর্ষ্টয়ঁমূল-নাগিরট-প্রাবেশ্য-নিত্র-গোহালীতো দ্রোগবাপ-ব্রহ্ম-আচাৰা (প-ব) যু-আধিক্ষম-ইত্য-এবম-অ-

১৬. ধ্যুর্দ্ধ ক্ষেত্র-কুল্যবাপম্ পার্থদত্তে-ঝঁ ন কচিদ-বিরোধঃ গুণস্ত-তুয়-পরম-ভট্টারক-পাদানাম-অর্থ-ওপচয়ো ধৰ্ম-বড়-ভাগ-আপ্যায়-

১৭. নঝঁ-চ ভবতি তদ্ব-এবন-গ্রিয়তাম-ইত্য-অনেন্দ্র-আব ধারনা-বক্রমেণ-আস্মাদ-ব্রাহ্মণ-নাথ-শৰ্মাত এতদ্ভার্যা-রামিয়াশ-চ দীনার-ত্র

১৮. যম-আয়ীকৃত্য-এতাভ্যাং বিজ্ঞাপিতক-ক্রম-ওপযোগায়-ওপরি-নির্দিষ্ট-গ্রাম-গোহালি-কেষুঃ তল-বাটব-বাস্ত্রনা সহ ক্ষেত্রঁ

১৯. কুল্যবাপ অধ্যুদ্ধৌ-ক্ষয়-নীবী-ধর্মেণ দন্তঃ কু ১ দ্রো ৪ (I) তদ্ব-যুগ্মাভিঃ স্ব-কর্ম্মণ<sup>১৮</sup>-আবিরোধিস্থানে ষটক-নন্দৈর-অপ-

২০. বিএগছয় দাতব্যো-ক্ষয়-নীবী-ধর্মেণ চ শশ্বৎ-আচন্দ্র-আক্র-তারক-কালম-অনু-পালয়িতব্য ইতি (I) সম ১০০ ৫০ ৯

২১. মাঘ দি ৭ (I) উজ্জঝঁ-চ ভগবতা ব্যাসেন (I) স্ব-দস্তাং পর-দস্তাং বা যো হরতে বসুদ্বরাম্।

২২. ন বিষ্ঠায়াঁ ক্রিমির<sup>১৯</sup>-ভূত্বা পিতৃভিস্ত-সহ পচ্যতে (I) ষষ্ঠি-বৰ্ষ-সহস্রাণি স্বল্পো বসতি ভূমিদঃ (I)

২৩. আক্ষেপ্তা চ-আনুমন্তা চ তান্য-এব নরকে বসেৎ (II) রাজভির-সহ-ভির-দত্ত দীয়তে চ পুনঃ পুনঃ (I) যস্য যস্য

২৪. যদা ভূমি<sup>২০</sup> তস্য তদা ফলম্ (II) পুৰু দত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ-রক্ষ যুধিষ্ঠির (I) মহীম-মহিমতাম শ্রেষ্ঠ

২৫. দানাচ-ছেয়ো নুপালনং (II) বিদ্য-আটবিষ্ট-অনস্ময় শুক্র কোটৰ-বাসিনঃ (I) কৃষ্ণ-আহিন্যে হি জায়ন্তে দেব-দায়ঁ হরতি যে (II)

২৭. অর্হতাম পড়ুন।

২৮. স্ব-কর্মণ বিরোধী স্থানে।

২৯. রুমির পড়ুন।

৩০. ভূমিস পড়ুন।

### তাত্ত্বিক সারাংশ

নাথ শর্মা নামক ব্রাহ্মণ ও তাঁর ধর্মপত্নী রামী পুন্ড্রবর্দ্ধনের আয়ুক্তক (district officer)-জিলা অফিসার ও নগর শ্রেষ্ঠী (mayor) র নিকটে দিয়ে নিবেদন করলেন যে স্থানীয় পচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে দক্ষিণাংশক বীথি ও নাগিরটু মণ্ডলে অবস্থিত চারটি বিভিন্ন গ্রামের ১১/২ কুল্যবাপ ভূমির মূল্য স্বরূপ তিন দীনার অধিষ্ঠান অধিকরণে (city council) জমা দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ বট গোহালীস্থিত বিহারের অর্হৎদের পূজার জন্য আবশ্যিক চন্দন, ধূপ, পুষ্প, দীপ প্রভৃতির নির্বাহার্থ ও নির্গৃহাচার্য গুহনন্দির বিহারে এক বিশ্রাম নির্মাণের জন্য এই ভূমি সর্বদার জন্য দান দেওয়া হবে। বারাণসীর পঞ্চস্তুপ নিকায়সংঘের আচার্য গুহনন্দির শিষ্য প্রশিষ্যরা এই বিহারে অধিষ্ঠাতা।

### ভূমি পরিমাণ

পৃষ্ঠিম পোতক, গোবাটপুঞ্জক ও নিহংগোহালী গ্রামে ক্রমানুসারে ৪, ৪ ও ২২/১ দ্রোগমাপ পরিমাণ ক্ষেত্র ও বট গোহালীর ১১/২ দ্রোগমাপ পরিমাণ আবাস ভূমি।

(অধিষ্ঠান অধিকরণ) সভা প্রথমে পুস্তপাল (record-keeper) দিবাকর নন্দির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পুস্তপাল জানলেন যে এই কাজে কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয়তঃ এই কাজে রাজকোষ কিছু আয় প্রাপ্তির অতিরিক্ত এই দানে যে পুণ্য অর্জিত হবে তার ষষ্ঠাংশ মহারাজ প্রাপ্ত হবেন। সভা ব্রাহ্মণ দম্পত্তির প্রস্তাব স্থীকার করে ভূমি হস্তান্তর লিপিবদ্ধ করলেন।

সভা বিভিন্ন গ্রামের (যেখানে এ ক্ষেত্র ছিল) প্রধানদের ক্ষেত্রে চৌহদ্দী নির্দেশ করবার আদেশ দিলেন।

এই তাত্ত্বিক শাসনে বাঙ্গলার ওই প্রাপ্তে প্রাচীনকালে ভূমি ক্রয় বিক্রয় ও দান করার জন্য কি ধরণের কার্য প্রণালীর বিধি ছিল তার এক সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইচ্ছুক দান কর্তা আয়ুক্তক (district officer) ও অধিষ্ঠান অধিকরণ (city council) এর প্রমুখ নগরশ্রেষ্ঠীর (mayor) নিকট গেলেন ও নির্ধারিত মূল্যে দানের জন্য ভূমি বিক্রী করার আবেদন করলেন। এর জন্য আয়ুক্ত ও অধিষ্ঠান অধিকরণ জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার্থ সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্য সেই আবেদন পত্র পুস্তপালের<sup>১১</sup> (record keeper) হাতে দিলেন। পুস্তপাল আবশ্যিক অনুসন্ধান করে (transaction) হস্তান্তরের অনুমতি

২১. এক পুস্তপাল প্রমুখ হতেন ও বাকী তাঁর অধীনে থাকতেন।

দিয়ে স্বীয় বিবৃতি (report) দিলেন। তারপর শাসন কর্তৃবর্গ প্রার্থীর নিকট আবশ্যিক শুল্ক আদায় করে সেই গ্রামের প্রমুখ ও অন্যান্য গৃহস্থদের সুচনা দিলেন যে ভূমির মাপ করে প্রার্থীদের দিয়ে দেওয়া হোক।

এই দানপত্রে ভূমি মাপের পরিমাণ ধান্য (বীজ) অনুসারে অর্থাৎ কুল্য বাগানুসারে। ১ কুল্যবাপ = ৮ দ্রোণ = ৩২ আটক = ১২৮ প্রস্ত। কুল্যবাপের আশয় তত্ত্বান্ত ভূমি যেখানে এক কুল্য ধান্য (বীজ) বপন করা যায়। এই দান পত্রে দ্রোণবাপ ও আটকবাপ ভূমি মাপও আছে।

দানপত্রের সময় সং ১৫৯ মাঘ কৃষ্ণ ৭। এই সম্বৰ্ধ সম্ভবতঃ গুপ্তাব্দ। যে সময়ের এই দানপত্র সেই সময়ে বাঙ্গলায় গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল। সেই অনুসারে গণনা করলে এই তাত্ত্বিক সময় খং ৪৭৯ জানুয়ারী মাসের।

দানপত্রের ঘোল-পংক্তিতে পরম ভট্টারক শব্দ সেই নৃপতির সঙ্গে সম্বন্ধিত যাঁর শাসনকালে এই দানপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে সেই নৃপতির নাম নেই। দামোদরপুরের<sup>১২</sup> দানপত্রে বিদিত হওয়া যায় যে এই সময়ে পুন্ড্রবর্দ্ধনভূক্তি বুদ্ধগুপ্তের রাজ্যান্তর্গত ছিল। খুব সম্ভব এই দানপত্রের অনুলিখিত নৃপতি বুদ্ধগুপ্তই। তাঁর রাজ্যকাল ৪৭৬-৪৯৫ গুপ্তাব্দ।

### পঞ্চস্তুপাদ্ধয়

এই তাত্ত্বিক শাসনের ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ পংক্তিতে কাশিক পঞ্চস্তুপাদ্ধয়'র উল্লেখ হয়েছে। জৈন সংঘের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করার প্রয়ত্ন এখনো সেরূপ হয় নি। জৈন গ্রন্থ থেকে যা জানা যায় এই পঞ্চস্তুপাদ্ধয়ের সংস্থাপক পৌন্ড্রবর্দ্ধনের শ্রীঅর্হদ্বল্যাচার্য ছিলেন। তিনি স্বীয় সময়ের এক প্রভাবশালী সংঘনায়ক ছিলেন।

একবার যুগপ্রতিক্রিয়ণের সময় তিনি জানতে পারলেন যে এখন পক্ষপাতের যুগ এসে গেছে। তিনি তখন এরূপ বিচার করলেন যে মুনিদের মধ্যে একজ্বের ভাবনা বাঢ়ানোতেই লাভ। তাই আচার্যশ্রী নন্দি, বীর, দেব, অপরাজিত, সেন, ভদ্র, পঞ্চস্তুপ, গুপ্ত, গুণধর, সিংহ, চন্দ্র, আদি নামে ভিন্ন ভিন্ন সংঘ স্থাপিত করলেন।<sup>১৩</sup> অর্হদ্বলির সময় বীর নির্বাণ স. ৭১৩র কাছাকাছি এরূপ প. জুগল কিশোরজী লিখেছেন।<sup>১৪</sup> কিন্তু নন্দি সংঘের পট্টাবলী অনুসারে তাঁর সময় বীর নির্বাণ সং ৫৯৩ হয়।<sup>১৫</sup>

২২. Epigraphia Indica, Vol. XV. PP.113-45.

২৩. শ্রতাবতার (মা. প্র. নং ১৩)

২৪. স্বামী সমস্তভদ্র, পং.১৬।

২৫. ভাস্তুর, ভাগ ১, কিরণ ৪।

## উত্তরাধিয়ন (জৈনধর্ম) ও মহাবীর কলিঙ্গের প্রভাব

উত্তরাধিয়ন সঙ্গে জৈন ধর্মের সম্পর্ক কতদিনের এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে বলতে হয় তা ২৩ সংখ্যক তীর্থকর ভগবান পার্শ্বনাথের সময় থেকে। কিন্তু যদি প্রাচীন কিঞ্চিত্বাণী আদিতে বিশ্বাস রাখা যায় তবে এই সম্পর্ক অষ্টাদশ তীর্থকর অরনাথের সময় পর্যন্ত এগিয়ে নেওয়া যায়। কারণ ব্রিষটিশলাকা-পুরুষ-চারিত্রে বলা হয়েছে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি রাজগুরে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন। রাজপুরকে মহাভারতে কলিঙ্গের রাজধানী বলা হয়েছে। সে যা হোক, পার্শ্বনাথের সঙ্গে যে কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা বহু জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ক্ষেত্র সমাস অনুসারে ভগবান পার্শ্বনাথ ধর্ম প্রচারার্থ বাংলাদেশের তাম্রলিঙ্গ হতে উত্তরাধিয়ন কোপ কটকে যান। কোপ কটকে ধন্য নামক এক গৃহস্থের ঘরে অবস্থান করেন। প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ঘ নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন এই কোপ কটক বালেশ্বর জিলার আধুনিক কুপারী গ্রাম। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর এক তাম্রফলকে জানা যায় সেই সময়েও কুপারী কোপারক নামে পরিচিত ছিল। ভাবদেব সুরির পার্শ্বনাথচরিতে বলা হয়েছে যে কলিঙ্গ যবনের হাত হতে মুক্ত করার পর কুশস্থলের রাজকন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে পার্শ্বনাথের বিবাহ হয়। রাণী গুম্ফার এক অপহরণ দৃশ্যকে অনেকে এই কাহিনীর চিত্রণ বলে মনে করেন। জৈন কথাসাহিত্যেও কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে। চিত্রসেন পদ্মাবতী চরিত্রে বলা হয়েছে রাজপুত্র চিত্রসেন কলিঙ্গের বসন্তপুর পন্তনের রাজা বীরসেনের পুত্র ছিলেন। করকগুচরিউ করকগুর আশচর্যজনক জীবনের বিবরণ দেয়। তিনি পার্শ্বনাথের পরে ও মহাবীরের পূর্বে কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে পার্শ্বনাথ পরম্পরার বলে অভিহিত করেন। উত্তরাধিয়নসূত্রের অষ্টাদশ অধ্যয়নে এঁর বিবরণ আছে। সেই বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইনি যখন কলিঙ্গে রাজ্য করছিলেন তখন পাঠ্বালে দ্বিমুখ, বিদেহে নমি ও গান্ধারে নগ্নই রাজ্য করতেন। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে এই নরবৃত্বভেড়া স্থীয় পুত্রদের রাজ্যভার দিয়ে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ কুস্তকারজাতকে করকগুরে প্রত্যেক বুদ্ধরূপে স্থীকার করা হয়েছে ও বলা হয়েছে তাঁর রাজধানী ছিল দণ্ডপুর। এই সমস্ত কারণে এই কথাই বলতে হয় যে ভগবান পার্শ্বনাথই কলিঙ্গে জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেন। সেই প্রাচীনকালে কলিঙ্গে যে জৈন ধর্ম প্রচলিত ছিল তা এর দ্বারা সমর্থিত হয় যে মহাভারতে বলা হয়েছে অনার্য কলিঙ্গবাসী হতে দূরে থাকবে, কারণ তারা বেদ মানে না, যজ্ঞ মানে না, এমন কি

দেবতারাও তাদের হাত হতে বলি গ্রহণ করেন না। বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও কলিঙ্গকে অনার্য দেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

খঃ পৃষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর জৈন ধর্মকে এক নৃতন রূপদান করেন। তাঁর সঙ্গেও উত্তরাধিয়ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবশ্যকসূত্রের হরিভদ্রীয়বৃত্তিতে বলা হয়েছে কলিঙ্গের রাজা মহাবীরের পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি মহাবীরকে কলিঙ্গে এসে ধর্ম প্রচারের জন্য আহ্বান করেছিলেন। মহাবীর যে কলিঙ্গে জৈন ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা আবশ্যকসূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে তিনি তোষলি ও মোসলিতে ধর্ম প্রচার করেন। এখানে যে কথা বলবার তা এই যে তোষলিতে বহু ধর্ম প্রচারক এসেছিলেন ও সেখানকার জিন মূর্তি তোষলিরাজ কর্তৃক রক্ষিত হত। স্বর্গীয় ডা. জায়সবালও বলেন যে সন্দ্রাট খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালৈখের চতুর্দশ পঞ্চিং ভগবান মহাবীর কলিঙ্গে এসে কুমারী পর্বতে অবস্থান ও সেখান থেকে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন গুহার স্তুতশীর্ষে অক্ষিত সিংহ মূর্তিতে তিনি আরো মনে করেন যে এ দুটি পর্বত তাঁর পাদম্পর্শে ধন্য হয়েছিল।

উত্তরাধিয়ন সূত্রে বলা হয়েছে যে চম্পানগরীতে পালিত নামে এক বণিক বাস করতেন। তিনি ভগবান মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকরাপে নির্গুহ ধর্মের জ্ঞাতা ছিলেন। একবার তিনি বাণিজ্যার্থে জাহাজে করে পিথুণ্ড নগরীতে যান। পিথুণ্ড কলিঙ্গের এক প্রমুখ বন্দর ও জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই পিথুণ্ডের উল্লেখ খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালৈখেও জৈনতীর্থ রূপে করা হয়েছে। নন্দরাজাদের সময় কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হাতীগুম্ফা-লেখের ৬ ও ১২ পঞ্চিংতে দুবার নন্দরাজার উল্লেখ করা হয়েছে। এই নন্দরাজা কে ছিলেন তা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও সন্তুতঃ তিনি পুরাণোল্লিখিত কলিঙ্গ বিজেতা সর্বক্ষণাত্মক মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন। কলিঙ্গকে পরাজিত করে তিনি বিজয়ের স্মারকরাপে কলিঙ্গ জিনকে মগধে নিয়ে যান। এই কলিঙ্গজিন কে ছিলেন তা আজ বলা শক্ত। কে. পি. জয়েসবাল ও আর. ডী. ব্যানার্জী তাঁকে তীর্থকর শীতলনাথ বলেছেন, এ. সি. মিতল মহাবীর, কিন্তু ডা. এন. কে. সাহ তাঁকে ঋষভদেব বলে অভিহিত করেন। সে যা হোক, এতে মনে হয় যে পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ও মহাবীর কর্তৃক পরিপূর্ণ জৈন ধর্ম সেই সময় উত্তরাধিয়ন রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নন্দ রাজ্যের কলিঙ্গ জিনকে মগধে নিয়ে যাওয়া ও খারবেলের সময় পর্যন্ত তাঁকে নষ্ট না করে উপাসনা করায় আরো এই কথা মনে হয় যে নন্দরাজারাও জৈন ধর্মবলশী ছিলেন।

চন্দণপুষ্প মৌর্য জৈন ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত হলেও কলিঙ্গ তাঁর অন্তর্গত ছিল না। নন্দ বৎশ দুর্বল হয়ে পড়লে মনে হয় কলিঙ্গবাসীরা পুনরায়

স্বাধীন হয়ে যায় ও চন্দ্রগুপ্ত কলিঙ্গবাসীরা স্বধর্মী হওয়ায় কলিঙ্গ আক্রমণ করা হতে বিরত থাকেন। তাঁর পৌত্র অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। সেই যুদ্ধ কি ভয়াবহ হয়েছিল তা তাঁর ১৩ সংখ্যক শিলালেখে বিবৃত হয়েছে। এই শিলালেখ হতে আরো জানা যায় যে সেখানে তখন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করত। এই শ্রমণেরা জৈন ছিলেন। মনে হয় অশোকও সেই সময় জৈন ছিলেন কারণ কলিঙ্গবাসী স্বধর্মীদের দুর্দশা তাঁর হস্তাক্ষে দ্রবীভূত করলেও মগধে পূজিত কলিঙ্গ জিনকে তিনি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। অশোকের পৌত্র সম্প্রতি জৈন ধর্মের জন্য তাই করেছিলেন যা বৌদ্ধ ধর্মের জন্য অশোক করেন বলা হয়। জমুদ্বীপপ্রস্তুতিতে সম্প্রতিকালীন কলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ সেই ২৫২ দেশের অস্তর্গত ছিল যেখানে জৈন সাধুরা নির্বাধায় বিচরণ করতে পারতেন।

মহামেঘ বাহন খারবেলের সময়কে কলিঙ্গের স্বর্ণযুগ বলা হয়। স্টার্লিং কর্তৃক আবিস্কৃত ও বহু পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচিত হাতীগুম্ফার শিলালেখ খারবেলের সিংহাসনারোহণের ১৩ বছর পর্যন্ত তাঁর জীবন ও কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তাঁর সময় সম্পর্কেও পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ তাঁকে খঃঃ পৃ. চতুর্থ, কেউ তৃতীয়, কেউ দ্বিতীয়, কেউ প্রথম শতকের বলে মনে করেন। কিন্তু শিলালেখের ভাষা, তৎকালীন শিল্প কলা আদির দৃষ্টিতে যদি তাঁকে অমরা খঃঃ পৃ. ১ম শতকের বলে মনে করি তবে খুব বেশী ভুল হবে না। তিবস সতকে ৩০০ বছর ধরে মহাপদ্ম নন্দর সময় হতে কালগণনা করলেও আমরা সেই সময়ই পাই।

এই শিলালেখ হতে আমরা জানতে পারি যে জৈন ধর্ম খারবেলের ব্যক্তিগত ধর্ম ছিল ও তাঁর সময়ে জৈন ধর্ম কলিঙ্গে যথেষ্ট প্রগতিলাভ করেছিল। এই শিলালেখের প্রারম্ভই হচ্ছে অর্হৎ, ও সিদ্ধদের নমস্কার হতে। অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু নিয়ে জৈন পঞ্চপরমেষ্ঠী বা নমস্কার মন্ত্র। খারবেল জৈন হলেও যুদ্ধ হতে কখনো পরামুখ হন নি। তাই দেখি তাঁর রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে তিনি মথুরা হতে যবনদের বিতাড়িত করে জৈন ধর্মের মহত্তী সেবা করেছেন। উন্নত ভারতে মথুরা তখন জৈনদের একটি প্রমুখ কেন্দ্র ছিল। বিজয়ী হয়ে তিনি কল্পবৃক্ষের এক চারাও কলিঙ্গে নিয়ে আসেন। রাজ্যাভিষেকের এগারো বর্ষে তিনি গর্দভ চালিত হলের দ্বারা (ব্ৰহ্ম আদি তীর্থক রুষভদ্রের লাঙ্ঘন হওয়ায় বোধ হয় তিনি তার ব্যবহার করেন নি) পিথুণ্ডের উদ্ধার করেন। রাজ্যাভিষেকের বারো বর্ষে তিনি নন্দরাজ কর্তৃক অপহৃত কলিঙ্গ জিনকে ৩০০ বছর পর সেখান থেকে নিয়ে এসে কলিঙ্গের তথা

কলিঙ্গের জৈন ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন। মঞ্চপুরী গুহায় তীর্থকরের উপাসনা নিরত রাজারাণীর যে ভাস্কর্য ‘উৎকীর্ণ’ আছে সন্তুষ্টভৎ তা খারবেল ও তাঁর পত্নীর। খারবেল গোড়ায় জৈন শ্রাবকের অগুরত পালন করতেন। তাই যুদ্ধযাত্রা, পরাজিতদের নিকট শুল্কগ্রহণ, জাঁক-জমক ও নৃত্য গীত আদিতে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু যতই দিন ব্যতীত হতে লাগল ততই তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। রাজ্যাভিষেকের তেরো বর্ষে খারবেলের যে রূপ আমরা দেখি তা শিলালেখে উৎকীর্ণ ভিক্ষুরাজ বা ধর্মরাজের রূপ। এই পরিবর্তন সন্তুষ্টভৎ মথুরা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়ে থাকবে। এবং মনে হয় শেষ জীবনে তিনি মহাবৃত্ত পালন করে জৈন সাধুদের মত জীবন যাপন করে থাকবেন। তাঁর স্বর্ধম ভক্তি ও বদান্যতা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে জৈন আচার্য ও পণ্ডিতদের কলিঙ্গে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসে। কলিঙ্গে তিনি এক ধর্ম সঙ্গীতেরও আয়োজন করেন যেখানে গ্রহ্ষ সংকলন আদি কাজও করা হয়। শ্রমণেরা শ্বেতাষ্঵র সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ তাঁরা শ্বেতবস্ত্র ধারণ করতেন। তিনি তাঁদের বস্ত্রও (বাস সিতানি, চিনবাতানি) দান করেছিলেন। অর্হৎ ভক্তির জন্য তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে শ্রমণদের নিবাসের জন্য ১১৭ টি গুহা নির্মাণ করান। রাণী সিংহপথার অনুরোধে তিনি এক প্রাসাদও (মন্দির) নির্মাণ করেন।

স্বর্ধমের প্রতি উগ্র প্রীতি থাকা সত্ত্বেও খারবেল অন্য ধর্মকে সম্মানিত করে নিজের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হিন্দুদেবদৈবীদের জন্যও মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন ও যতি, ঋষি ও তাপসদের নিবাসেরও ব্যবস্থা করেছেন। এইজন্য তাঁকে সব পাষণ পূজক, সকল ধর্মোপাসক, সব দেবায়তন সংস্কারারাধিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হাতীগুম্ফার লেখ ও খণ্ডগিরির গোড়ার দিকের ভাস্কর্য হতে তৎকালীন জৈন ধর্মের একটি সুন্দর আলেখ্যও পাওয়া যায়। বদ্বমঙ্গল, স্বষ্টিক, নন্দীপদ ও বৃক্ষচৈত্য পূজা জৈনধর্মে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। উভয়দিকে গজ সহ লক্ষ্মীও মঙ্গলের মধ্যে গৃহীত হয়েছে। বদ্বমঙ্গলের অনুরূপ চির জুনাগড়ের জৈন গুহার দ্বারদেশেও খোদিত দেখা যায়। খারবেলের পরবর্তী মহারাজা কুদেপসিরি ও কুমার বড়ুখ-এর সময় জৈন ধর্ম আরো উন্নতি করে। তাঁরা মঞ্চপুরী গুহার নীচের গ্যালারী ও পার্শ্ববর্তী কক্ষ নির্মাণ করান।

খারবেলের পর কয়েক শতকের জন্য উড়িষ্যার ইতিহাস অনুকারাচ্ছন্ন। সেই সময় সেখানে জৈন ধর্মের অবস্থা কি ছিল তা বলা কঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মহারাজাধিরাজ ধর্মদাস ধরের এক স্বর্গমুদ্রা শিশুপাল গড় খননের

সময় পাওয়া যায়। ডা. আলতেকরের মতে তিনি মুরগু বংশীয় কোনো জৈন রাজা ছিলেন। মুরগুরা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল।

বৌদ্ধ দাঠাবৎ হতে আমরা জানতে পারি কলিঙ্গরাজ গুহশিব (খঃ চতুর্থ শতক) জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ও নির্গত জৈনদের কলিঙ্গ হতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হয়ে তাঁরা পাটলিপুত্রের রাজা পাতুর শরণে আসেন। এই কাহিনী হতে আমরা জানতে পারি যে উভয় ধর্মের বিবাদে জৈনরা কীভাবে হীনবল হয় ও পরবর্তীকালে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয় হওয়ায় জৈন ধর্মের আরো অবনতি ঘটে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জৈন ধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে তা জীবিত থাকে। কারণ সপ্তম শতকে চৈনিক পরিবারক হিট এন সাঙ্গ খন্ধন ভারত প্রমাণে আসেন তখনো কলিঙ্গে তিনি বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নির্গতদের সংখ্যাই অধিক দেখতে পান। শৈলোন্ত্রব রাজা ধর্মরাজের বানপুর তাম্রফলকে (খঃ ষষ্ঠি-সপ্তম শতক) বলা হয়েছে যে তাঁর পঁচী রাণী কল্যাণদেবী ধর্ম কার্যের জন্য জৈন মুনি এক সাটক প্রবুদ্ধচন্দ্রকে কিছু ভূমি দান করেন। প্রবুদ্ধচন্দ্র নসীচন্দ্র অর্হতাচার্যের শিষ্য ছিলেন। এক সাটক অর্থাৎ এক বন্ধুধারী। এই অনুদান কেবল শৈলোন্ত্রব রাজাদের উদারতার কথাই বলে না, এ হতে এও জানা যায় যে তখনকার দিনে জৈনাচার্যরা রাজ্যাধিকারীদের দ্বারাও সম্মানিত হতেন।

তাই দেখি রাজ ধর্মের পরিবর্তন হলেও খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি জৈন ধর্মের কেন্দ্রস্থলে জনপ্রিয় থাকে। নবমুনিগুম্ফায় উদ্যোত কেশরীর এক শিলালিখ (খঃ ১১ শতক) কুলচন্দ্রের শিষ্য খুল্লক শুভচন্দ্রের উল্লেখ করে যিনি দেশী গণের আর্য সংঘের গৃহ কুলের আচার্য ছিলেন। জৈন গুরুস্থলে শুভচন্দ্র ও কুলচন্দ্রের উল্লেখ কল্যাণী চালুক্য ও দেবগিরির যাদবদের লেখেও পাওয়া যায় যদিও ওঁরা নবমুনি গুম্ফার কুলচন্দ্র ও শুভচন্দ্র নন। ললাটেন্দু কেশরী গুম্ফার উদ্যোত কেশরীর আর একটি লেখে বলা হয়েছে যে উদ্যোত কেশরীর রাজ্যের পঞ্চম বর্ষে কুমারী পর্বতে জীৱ সরোবর ও জীৱ মন্দিরের পুনরুদ্ধার করা হয়। সোমস্বামী করা হয় ও সেখানে চবিশ তীর্থংকর মূর্তি স্থাপিত করা হয়। সোমস্বামী শাসকদের রাজ্যকালে যে মুক্তেশ্বর মন্দির নির্মিত হয় তার বহিঃপ্রাকারের ওপর খোদিত তীর্থংকর মূর্তি দ্বারাই তাঁদের ধার্মিক বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বালাসোর থেকে প্রাপ্ত এক লেখে কুমারসেন নামক এক জৈন সাধুর নাম জানা যায় যিনি খঃ ১০-১১ শতকে বর্তমান ছিলেন। শ্রীনন্দ শিষ্য উগ্রাদিত্যের ত্রিকলিঙ্গ দেশের রঞ্জগিরি পর্বতে রচিত কল্যাণ কারক স্তোত্র বীরসেন, সিঙ্গসেন দশরথ গুরু ও পত্রস্বামী সহ এক কুমার সেনের উল্লেখ করে। খঃ ৮ম

থেকে ১১ শতকের মধ্যে উড়িষ্যায় যে জৈন ধর্মের পুনরুদ্ধার হয় তা উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রাপ্ত তীর্থংকর মূর্তি দ্বন্দ্বে বলা যায়। এই পুনরুদ্ধার রাষ্ট্রকূট প্রভাবের জন্য হয়। কারণ তাঁরা জৈন ধর্মের প্রবল সমর্থক ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ ও ভদ্রক জয় করেছিলেন বলে দাবী করেন। কিন্তু জৈনধর্মের এই পুনরুদ্ধার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, কারণ পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম ও জগন্নাথ উপাসনার প্রাদুর্ভাবে জৈনধর্ম আরো হীনবল হয়ে পড়ে। ধৌলী পাহাড়, বাণী বক্রেশ্বর আদি স্থানে খঃ তীয় ১২ শতকের শেষভাগে গঙ্গা রাজা মদন মহাদেব জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণদের হত্যা করেন এরপ উল্লেখ জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস মাদলা পাঁজিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশে জৈন সংস্কৃতি যেমন সরাক সম্প্রদায়ে দেখা যায় সেরপ উড়িষ্যাতেও জৈন সংস্কৃতি সরাকদের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে। বালেশ্বর জেলায় যে সব তন্ত্রবায় শ্রেণীর লোক বাস করেন, যাঁদের অশ্বিনী তাঁতী বলা হয় এঁরা ধর্মের দিক দিয়ে সরাক। তাই এঁদের সরাকী তাঁতীও বলা হয়। বালেশ্বর জেলায় প্রায় ৫৪ হাজার সরাক বাস করেন। এই সংখ্যা পশ্চিম বাঙ্গালার সরাকদের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী।

উড়িষ্যার কিছু কিছু অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে জৈন প্রভাব দেখা যায়। এই নাথপঞ্চাশীর পরবর্তীকালে অরক্ষিত দাসপঞ্চী ও মহিমাপঞ্চী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। বালেশ্বর জেলার অঘোরীরাও নাকি আগে সরাক ছিলেন। খলভূমের মহল্যা গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে এক অঞ্চলে আগে অনেক সরাক বাস করত। এঁরা বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

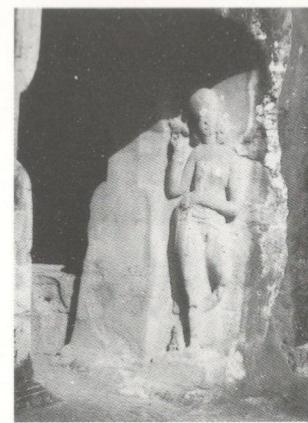
উড়িষ্যার সরাকদের বিভিন্ন ধরণের পদবী দেখা যায়। যথা- মহাপাত্র, পাত্র, দন্ত, সাঁতরা, বর্ধন, মাহাৰ, দেবতা, প্রামাণিক, আচার্য, বেহারা, দাস, সঙ্গ, মণ্ডল, নায়েক, সেনাপতি প্রভৃতি। এই সব পদবীর মধ্যে পাত্র, নায়েক, মণ্ডল প্রভৃতি পদবী পশ্চিমবঙ্গের সরাকদের মধ্যেও দেখা যায়। পশ্চিম বাঙ্গালার সরাক সম্প্রদায়ের মত উড়িষ্যার সরাকদেরও কোনোরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। রঙিনী সরাকী তাঁতীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চাহিতে উঁচু জাতি বলে মনে করেন। এজন্য তাঁরা ব্রাহ্মণদের হাতের জল পর্যন্ত খান না। পশ্চিম বাঙ্গালার সরাকদের মত উড়িষ্যার সরাকেরাও ডুমুরে পোকা থাকে বলে ডুমুর খান না। উড়িষ্যার সরাকদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই বলে তাঁরা সময়ে সময়ে নিজেরাই পৈতো ধারণ করে পূজা বা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন। অনেকে আবার বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য খণ্ডগিরি অঞ্চলে যান।

উড়িষ্যার সরাকদের মূল পেশা পশ্চিমবঙ্গের সরাকদের মত ঠাঁত। এঁরা যে প্রাচীনকাল থেকে ঠাঁত বোনার কাজে লিপ্ত আছেন এমন নয়। সম্ভবতঃ বেঁচে থাকার তাগিদেই ঠাঁরা এই শিল্পকে গ্রহণ করেছিলেন।

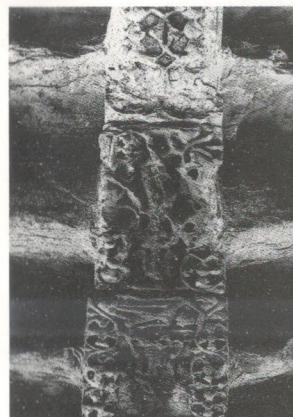
সরাকী ঠাঁতীরা উড়িষ্যার বালেশ্বর, কোরাপুট আদি অঞ্চল ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছেন। কটক জেলার আসিয়া পাহাড়, ছাতিয়া পাহাড়, চান্দোড়, জাজপুর, রত্নগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। এছাড়া তিগিরিয়া, বড়স্বা, বাঁকী ও পুরী জেলার পিগলি প্রভৃতি অঞ্চলেও এঁরা বাস করেন।

জৈন প্রত্নতত্ত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির কথা বলতে হয়। উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে ছড়ান জৈন প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে খণ্ডগিরির গুহা ভাস্কর্য মনে হয় সবচেয়ে বেশী প্রাচীন। হাতীগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, জয় বিজয় গুম্ফা প্রভৃতি ভাস্কর্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গুম্ফার দ্বারে কোথাও প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতী রয়েছে ও কোথাও নিরাবরণ সুন্দরী নারী। আবার কোথাও বা কাহিনী চিত্র ক্ষেত্রিত। এই সব ভাস্কর্য শিল্পকলা খণ্ডগিরির প্রাচীন গুহাগুলোর শিল্প উৎকর্ষতা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়।

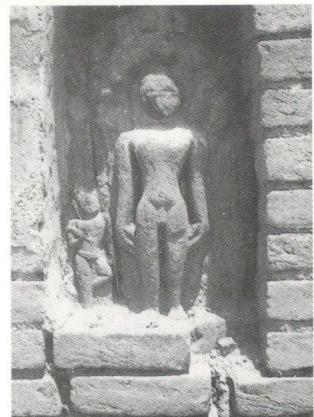
খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ছাড়াও কোরাপুট জেলার জয়পুর, নন্দনপুর ও ভৈরবসিংহপুর থেকে বহু জৈন তীর্থকর মূর্তি পাওয়া গেছে। কেওনঝাড় ও ময়ূরভঞ্জের বিভিন্ন স্থান হতেও পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ ও মহাবীর মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। উড়িষ্যার স্টেট মিউজিয়ামে বালাশোর জেলার চারম্পাথ্রামে প্রাপ্ত চারটি তীর্থকর মূর্তি রয়েছে। কটকের জৈন মন্দিরেও মধ্যযুগের বহু প্রাচীন মূর্তি সংগৃহীত আছে। এদের মধ্যে একই ফলকে ঋষভনাথ ও মহাবীর ও অন্য ফলকে ভরত, বাহবলী আদি শতপত্র সহ পদ্মাসনে স্থিত ঋষভদেবের মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ময়ূরভঞ্জের বড়সাহী হতে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি চৌমুখ পাওয়া গেছে যার চার তীর্থকর মূর্তি রয়েছে। ময়ূরভঞ্জের খিচিৎ, বারিপাদা, ভীমাপুর আদি গ্রাম থেকেও বহু জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কটক জেলার বাজপুরে অখণ্ডনেশ্বর মন্দির ও মাতৃকা মন্দিরে বহু জৈন মূর্তি রক্ষিত দেখা যায়। এই শহরের নারায়ণ চোক মন্দিরে অনন্ত বাসুদেব রূপে পূজিত পার্শ্বনাথ খুবই সুন্দর। মাতৃকা মন্দিরের কায়োৎসগ্রহিত শাস্তিনাথের ত্রিহস্ত্র মূর্তি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ "। এই মূর্তির দুই দিকে  $2\frac{1}{2}$  জন তীর্থকর মূর্তি উৎকীর্ণ। দু' দিকে দুই চামরধারী ও একদিকে দুই কলশ ও অন্যদিকে এক কলশ ও একজন উপাসক ও মাঘাখানে লাঙ্ঘন। ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত এই মূর্তিটি জৈন শিল্প কলার একটি উৎকৃষ্ট নির্দর্শন। আর একটি শাস্তিনাথ মূর্তি ( $4\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ") যা



গুম্ফামন্দির, খণ্ডগিরি



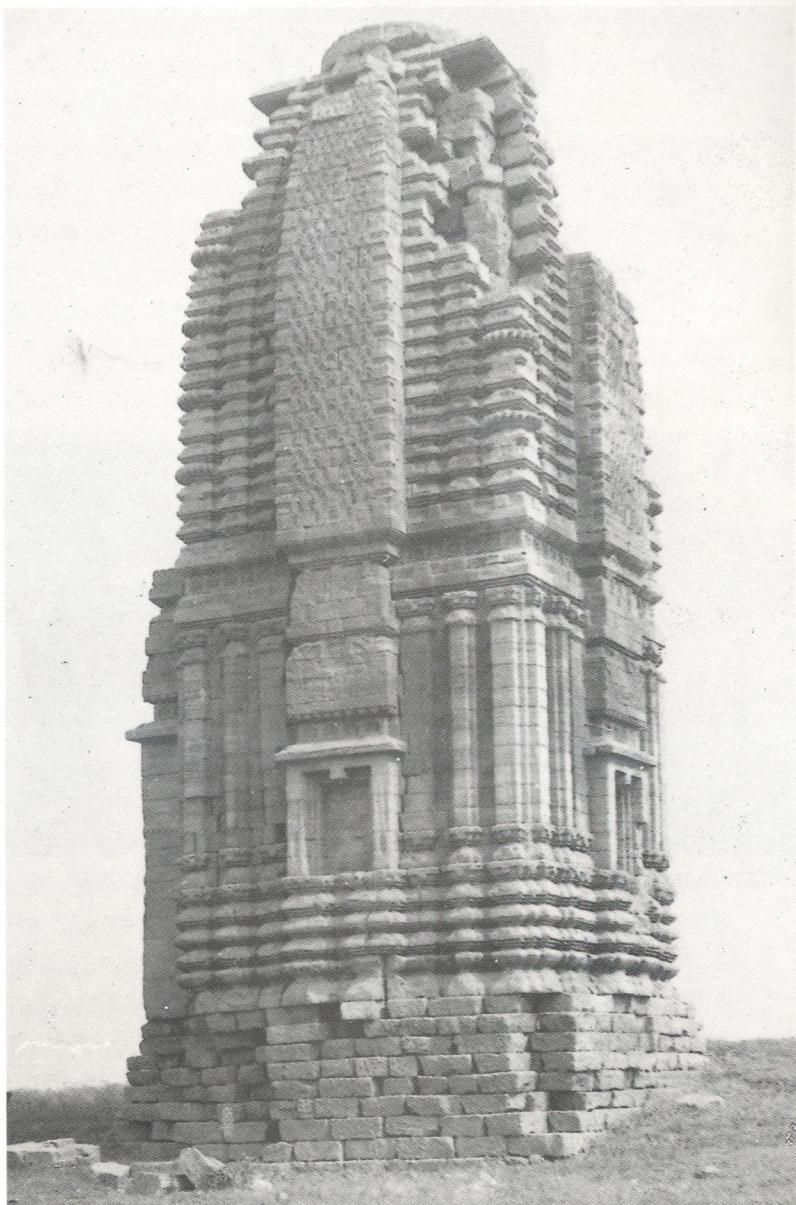
পাড়ার সরাক জৈন মন্দির



সরাক জৈনমূর্তি



সরাক জৈনমূর্তি, ধর্মরাজ



তেলকুপী, সরাক জৈন মন্দির



পুরুলিয়ার প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতির গৌরব জৈন মন্দির



অশ্বিকা, পাকবিরা

অখণ্ডলেশ্বর মন্দিরের কম্পাউণ্ডে রাখিত অনুরূপ সুন্দর। খড়গসনে হিত এই মূর্তির দু'দিকে ৪/৪টি করে গ্রহ ক্ষেত্র নেই। মূর্তির দু'দিকে দুজন চামরথারী, ওপরে দু'জন উড়টীয়মান বিদ্যাধর। পাদপীঠে কেবল লাঞ্ছনিই উৎকীর্ণ নয়, বাঁ দিকে দুই হস্তী দ্বারা অভিযুক্ত কমলে দণ্ডায়মান লক্ষ্মী ও ডান দিকে একজন দাঁড়ান পুরুষ ও ত জন বসা মহিলা উপাসনারত। এসব মূর্তি দেখে বলা যায় যে আজ শৈব ক্ষেত্র এক সময় তা প্রমুখ জৈন কেন্দ্র ছিল। প্রাচী অধিত্যকার অতসপুর, লতাহরণ আদি গ্রাম থেকেও বহু জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপরও জৈন ধর্মের প্রভাব অসীম। জৈনধর্ম আজ সেখানে লুপ্তপ্রায় হলেও সেই প্রভাব সেখানে নানাভাবে দেখা যায়। মধ্যযুগে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রদেশে ভঙ্গবংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। এই রাজাদের কেউ বৈষ্ণব ছিলেন তো কেউ শৈব, কিন্তু তাঁদের ওপরও জৈন সংস্কৃতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বংশের এক তাত্ত্ব শাসন কেন্দুয়া জেলার উখুঙ্গামে পাওয়া গিয়েছে, তাতে ভঙ্গবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি কেটাশ্রম জৈন হরিবংশ পুরাণে বর্ণিত কোটি শিলা। সম্ভবতঃ এখানে অসংখ্য মুনি বাস করতেন তাই এর একাপ নামকরণ হয়। ময়ূরের ডিম থেকে (ময়ূরাণং ভিত্তা) বীরভদ্র আদি ভঙ্গরূপে উৎপন্ন হন একাপ বলা হয়েছে। এই ময়ূর নিশ্চয়ই সাধারণ ময়ূর নয় কারণ তা থেকে মানুষের উৎপত্তি হতে পারে না এবং তা মান্যও হত না। বোড়শ শতকে বিদ্যমান কণিকা-রাজবংশীয় হরিচন্দন স্থীয় রচিত সংগীত মুক্তাবলীতে স্থীয় বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখছেন আমাদের বৎস শ্রতি ময়ুরিকা থেকে উৎপন্ন। এই শ্রতি, শ্রতদেবী বা জৈন সরস্তী। জৈন পরম্পরায় সরস্তীর বাহন হংস নয়, ময়ূর, ভঙ্গবংশের ওপর জৈন প্রভাবের এই এক নির্দশন।

উপযুক্ত তাত্রাসনে বীরভদ্রকে গণ্ডণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গণ্ডণ জৈনশাস্ত্রে প্রযুক্ত গণ্ডর, গণী, গণেন্দ্র শব্দের পর্যায়বাচী।

উৎকলের উত্তর ভাগ কোন সময় তোষলী নামে অভিহিত হত। এই তোষলীতে শৈলপুর নামে এক জৈন তীর্থস্থল ছিল। বিপুলা নামক পর্বত বেষ্টিত এই শৈলপুরের কথা জৈন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এর নামকরণ শৈলপুর রাজগৃহের অনুকরণে করা হয়। এই শৈলপুরের অবস্থান কোথায় তা ঐতিহাসিকেরা অনুসন্ধান করে দেখেন নি, তবে কেন্দুয়ার জেলার আনন্দপুর সাব ডিভিসনে আনন্দপুর হতে ৮ মাইল দূরে পোড়াসিঙ্গভি নামে যে গ্রামে আছে তার সঙ্গে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এখানে এক বর্গ এক মাইল পরিমিত

ক্ষেত্রকার ভূমি বউলা পর্বত শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। অন্য ভাগ ধ্বন্তি প্রত্নাবশেষে চিহ্নিত। এখানে শতাধিক তীর্থকর ও যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি ছড়িয়ে আছে। কোন মূর্তি অর্দ্ধ (প্রোথিত), কোনটি তীর্যকৰণে হিত, কোনটি উভানশায়ী, কোনটি অর্দ্ধভগ্ন। পর্বতে উঠার সিঁড়ি আছে। সেখানে এক বিশাল তীর্থকর মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি মহাবীরের। এইস্থান তোষলীর অন্তর্গত। তাই নিঃসন্দেহে একে তোষলীর শৈলপুর বলা যায়। রাজগৃহ শৈলবলয় বেষ্টিত হওয়ায় রাজগৃহ শৈলপুর। এই স্থানটি অনুরূপভাবে শৈল বেষ্টিত। রাজগৃহের চারিদিকের পর্বত মালার নাম বিপুল। এখানকার পর্বতের নাম বউলা। রাজগৃহের দ্বারদেশে হিত পর্বত গোলাকার, এখানেও সেইরূপ। তাই মনে হয় মহাবীরের প্রধান ধর্মপ্রচার কেন্দ্র রাজগৃহের অনুকরণে এই স্থানটির নাম শৈলপুর রাখা হয়। এ হতেও উড়িষ্যার জৈন ধর্মের প্রাচীনতা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়াও সাহিত্যিক তথ্যও উৎকলে জৈনধর্মের প্রাচীনতা ও প্রভাব ঘোষণা করে।

উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে কেড়া পদ্মতোলা গান শোনা যায়। সেই গানে বলা হয়েছে কংসের পঞ্চী ধনিন্তা ওয়া ব্রত করেছেন। তার জন্য শতদল পদ্মের প্রয়োজন। কংস কৃষকে সেই শতদল পদ্ম আনার আদেশ দিলেন। কৃষ সেই পদ্ম আনা র জন্য কালিন্দী ত্বন্দে প্রবেশ করলে কালীয়নাগ তাঁকে দংশন করে। কৃষ তখন তার মর্দন করেন। এই কাহিনী জৈন হরিবংশ পুরাণ হতে গৃহীত। কারণ এরূপ কাহিনী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশপুরাণ আদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ হতে বোঝা যায় জৈন হরিবংশের প্রভাব উড়িষ্যার লোক সাহিত্যে কতখনি। এমন কি রসকল্পলক্ষণ দীনকৃষ্ণ জৈন প্রভাবিত লোক সাহিত্য অবলম্বনে লিখছেন-

### কুঞ্জবিহারী বিহরস্তে গোপানগর

কংশ আঞ্জা আসি লাগিলা নন্দকু দেব কমল শতভার।

শুধু লোক সাহিত্যেই নয়, উড়িষ্যার অতি প্রাচীন পুস্তক সরলা মহাভারতে (১৪-১৫ শতক ?) দ্রৌপদী স্বয়ম্ভৱের ঘূর্ণায়মান চক্রের সন্ধিতে রাধা লক্ষ্য ভেদ করার যে কথা আছে তাও জৈন হরিবংশ পুরাণের। সংস্কৃত মহাভারতে রাধা শব্দের কোনো উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা ও উড়িষ্যায় বহুগৃহ রচিত হয়েছিল। এইসব গ্রন্থে ভাগবতের স্থান সকলের ওপরে। উড়িষ্যার জগন্নাথ দাসের ভাগবতে ঋষভনাথের কথা আছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভনাথের তাঁর শতপুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রমণ সংস্কৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

### শ্রীশ্রীঋষিভদ্রের উবাচ-

যো পুত্রমানে সাবধান,

শুন হে আমার বচন।

যে প্রাণী যে কার্যমান

নিরতে করে আচরণ

সে প্রাণী বৰ্য্য এ সংসারে

পড়ে নরক মহাঘোরে।

কেবলমাত্র জগন্নাথ দাসের ভাগবতেই নয়, চৈতন্য দাস বিরচিত বিষ্ণুগর্ভ পুরাণেও ঋষভনাথের ও ভরতের চরিত্র আছে। এই বইটি অলেখ ধর্মের একটি প্রমুখ গ্রন্থ। সেখানে বলা হয়েছে ঋষভনাথের ভরতাদি দশপুত্র তাঁর কাছে অলেখ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ঋষভনাথের মহত্ত্ব অধিক মাত্রায় প্রতিপাদিত। ভাগবতে যেরূপ ঋষভনাথের উপদেশ বাণীতে জৈনতত্ত্ব প্রস্ফুটিত বিষ্ণুগর্ভ পুরাণে সেরাপ ঋষভনে হিতবাণীতে। উড়িষ্যায় অলেখ ধর্ম জৈনধর্মের পরিণতিরূপেই অভিযন্ত হয়।

উড়িষ্যাতে বউলা গাভীর উপাখ্যান বহু প্রচলিত ও লোক প্রিয়। সেই উপাখ্যানে বলা হয়েছে বউলা নামক এক গাভী শিশু বৎসকে রেখে অরণ্যে তৃণের সন্ধানে যায়। সেখানে তাকে এক ক্ষুধার্ত বাষে এসে ধরে। বউলা বাষকে বলে তুমি আমাকে একবার ছেড়ে দাও আমি আমার বৎসকে দুধ খাইয়ে ফিরে আসব তখন তুমি আমাকে খেয়ো। বাষ বলল, তুমি যদি আমার ফিরে না আস ?

সে প্রত্যুত্তর দিল, আমি সত্য পালন করি, তাই তুমি আমার কথার ওপর নির্ভর করতে পার। তখন বাষ তাকে ছেড়ে দিল। বউলাও বৎসকে দুধ খাইয়ে তখনি ফিরে এলো। বাষ তার সত্য রক্ষায় মুঝ হল ও অহিংসক হয়ে তাকে তার বৎসের নিকট যেতে দিল। জৈন ধর্মের অহিংসা তত্ত্ব এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মহাযোগ বৃক্ষেরে অহিংসা তাঁহি শাখা

বিবেক কুসুম মুক্তিফল দেই দেখা।

ত্রিবিধ তাপরে জে তাপিত সর্ব প্রাণী

যজ্ঞ তরুবরকু অহিংসা কলা জাণী।

উড়িষ্যায় যে কাহিনী লোককথা, রূপকথা বা জাতীয় কাহিনীরূপে প্রচলিত তা চিরসেন ও পদ্মাবতীর আখ্যায়িক। চিরসেন ও পদ্মাবতী পূর্ব জন্মে হংস ও হংসী ছিল। তারা চম্পক বনের এক সরোবর তীরে বাস করত। একদিন

এক সওদাগর সেখানে আসে ও সরোবর তটে বিশ্রাম নেয়। আহারের পুর্বে সে অতিথির প্রতীক্ষা করে। সেই সময় মাসোপবাসী এক শ্রমণ সেখানে আসেন। সওদাগর তাঁকে আহার্য ভিক্ষা দিয়ে কৃতকৃত্য হয়। হংস ও হংসী সওদাগরকে মুনিকে আহার্য দিতে খুশী হয় ও তার এই দানের প্রশংসা করে। এই অতিথি দানের প্রশংসার জন্য তারা পরিবর্তী জীবনে রাজপুত্র ও রাজকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করে। চিরসেন ও পদাবতীর বিচিত্র কাহিনী এখানে বিবৃত করার স্থান নেই। তবে কলিঙ্গের এই লোককথার রাজারাণী ..... মুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে অন্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

বর্তমান উড়িষ্যার লোক ব্যবহারে জৈন ধর্মের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত তা দেখা যায় কল্পবৃক্ষের পূজায়। প্রাচীন জৈন সাহিত্য দেখা যায় যে মানব সভ্যতার আদি যুগে যখন কৃষি আদি লোক ব্যবহারের কথা মানুষ জানতান তখন তার সমস্ত আবশ্যকতার পূর্তি করত কল্পবৃক্ষ। সময়ের পরিবর্তনে কল্পবৃক্ষ যখন নষ্ট হতে লাগল, মানুষ কিভাবে ক্ষুমিবৃত্তি করবে ভেবে চিন্তিত হল, তখন ঋষভদেবের আবির্ভাব হয় ও তিনি কৃষি, পশুপালন, ব্যবসায় আদি লোক ব্যবহার শিক্ষা দেন। এই দৃষ্টিতে কল্পবৃক্ষ পূজা জৈনদের এক বৃহৎ অনুষ্ঠান। এরই অনুকরণে হিন্দু ধর্মে কামধেনুর কল্পনা করা হয়। এই কামধেনু বা সুরভী গাভীর জন্যই না বিশ্বামিত্ব বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করেন। শেষে তাপস হয়ে যান। জৈনদের এই অনুষ্ঠানই হিন্দুদের প্রয়াগে স্থিত কল্পবৃক্ষের প্রেরণা দেয়। শুধু তাই নয়, এই কল্পবৃক্ষ হতে লাফ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করার যে প্রথা প্রচলিত হয় তাও মনে হয় জৈন সংলেখনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রয়াগের কল্পবৃক্ষের কাহিনী হতে মনে হয় জৈন ধর্মের বিচার ধারা হিন্দু ধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই কল্পবৃক্ষের নিকট মানত করে লোক আজো কৃতকৃত্য হয়। কল্পবৃক্ষ নিয়ে হিন্দুপুরাণে বহু কাহিনী রচিত হয়। উড়িষ্যাতেও কল্পবৃক্ষের মহত্ব কম নয়। এখানকার লোক বটবৃক্ষের পূজা করে। বট বৃক্ষ হতে যে জটা নিগর্ত হয় তাকে শিব জটা বলে। শিব পুরাণে বলা হয় ঋষভ শিবের অবতার। জৈনদের কল্পবৃক্ষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পুরী ভুবনেশ্বর আদি স্থানে মন্দিরে কল্পবৃক্ষের স্থাপনা করে তার পূজো করা হয়।

আদি তীর্থংকর ঋষভদেব হিন্দুপুরাণে বিষ্ণু ও শিবের অবতার। তিনি অন্তিম সময়ে মুখে পাথর রেখে কৈলাশ শিখরে অবস্থান করেন। সেই সময় বাঁশ বনে আগুন লাগায়, সেই আগুনে তিনি দন্থ হয়ে যান। এই ঘটনা ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিন সংঘটিত হয়। জৈনরাও এই দিনটিকে ঋষভনাথের নির্বাণ দিবস বলেন ও ঋষভনাথের নির্বাণ কল্যাণকরণে পালন করেন। কালক্রমে এই

নির্বাণ কল্যাণক হিন্দুরা ব্রত বিশেষরূপে স্থীকার করে নেয় যা আজ শিবচতুর্দশী বা জাগর চতুর্দশীরূপে ভারত প্রসিদ্ধ। এর আধুনিক রূপ যাই হোক না কেন এটি একটি জৈন পর্ব ও ওইরূপে ওতঃপ্রেত হয়ে তা হিন্দু ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

উড়িষ্যারও প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে শিব মন্দির আছে। এই সমস্ত মন্দিরে ব্রাহ্মণের জাতির লোকেরা পূজা করে। শিব চতুর্দশী উড়িষ্যার গ্রামীণ জনতারও এক প্রমুখ পর্ব। সুদূর অতীত হতে জৈন ধর্মের এই পরম্পরাকে উড়িষ্যার লোকেও নিজের সংস্কৃতিতে পরিণত করে নিয়েছে।

আগে যে বট বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে তার পূজা উড়িষ্যায় আজও প্রচলিত। উড়িয়া ভাষায় রচিত বিচিত্র রামায়ণ এক গ্রামীণ কাব্য। সেই কাব্যে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কবি বট প্রার্থনা নাম দিয়ে এক প্রার্থনা সীতার মুখে বসিয়ে দিয়েছেন-

বাঁচ বট, ধেন ধেন মো মিনতি বট শ্রেষ্ঠ-

বিকল হোইং বট মূলে শিরে কর জোড়ি সীতা বোলে।

চতুর্দশ লোকে খ্যাত হোই অছ ঘর উপকারে এ সংসারে।।

শাশ শশুর মো নিশ্চিত্তরে সর্বে শুভ্রে থাক্ত অযোধ্যা রে।।

আদি আদি

এই প্রার্থনা জৈনদের সর্বে সন্তু সুখিনঃ-র অনুরূপ।

উড়িষ্যা ও অন্যত্র শিবমন্দিরে যে ত্রিশূল দেখা যায় সেই ত্রিশূল জৈনদের ত্রিভৱের যে চিহ্ন তার অনুরূপ। (দ্রষ্টব্য কাঁকালী তীলা, মথুরার আরাগ পটে অঙ্গিত ত্রিভৱ চিহ্ন) ত্রিশূল ও বৃষ যেমন শিবের সেরাপ ঋষভদেবেরও। ঋষভ নাম আবার বৃষভের পর্যায়বাচী।

পুরী জগন্মাথের মন্দিরের বেঢ়ায় কোইলী বৈকুঞ্জ আছে। এই কোইলি তামিল কোএল (দেবস্থান) হতে এসেছে না জৈন কৈবল্য হতে তা ভাববার। ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহ মনে করেন তা জৈন কৈবল্য হতে এসেছে। কারণ প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে কৈবল্য শব্দ মৌক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নি।

তীর্থংকরের গর্ভাধান, জন্ম, দীক্ষা, বোধি ও মৌক্ষ যে যে তিথিতে হয় সেই সেই দিন ইন্দ্রাদি দেবতারা স্বর্গে উৎসব করেন। সেই সেই দিন তাঁর অনুযায়ীরা মর্ত্যেও চৈত্য যাত্রা' করেন। চৈত্য যাত্রা অর্থাৎ রথ যাত্রা। চৈত্য রথে বসিয়ে জৈন প্রতিমাকে নগর পরিক্রমা করান এই উৎসবের বিধি। এই রথ যাত্রা সুসজ্জিত হাতী ঘোড়া নৃত্য গীত বাদ্য ভাগ সহকারে করা হয়। জৈন

সাহিত্যে এই যাত্রার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রসেন পদ্মাবতী কাহিনীতেও রথযাত্রার বিবরণ আছে।

উড়িষ্যায় পুরী ও ভুবনেশ্বরে আষাঢ় শুল্কা দ্বিতীয়া ও চৈত্র শুল্কা অষ্টমীতে রথ যাত্রা হয়। এই দুই তিথি বিশেষ পুণ্য তিথিরূপে গৃহীত। রথ যাত্রা তিথি বিশেষ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ তিথিরূপে স্বীকৃত। এমন কি সেদিন নক্ষত্রাদির বিচার না করেই পুণ্য কাজ করা যেতে পারে। এজন্য একে কল্যাণক দিবস বলে। স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল পুষ্যনক্ষত্রিযুক্ত দ্বিতীয়া তিথিতে রাম ও ভদ্রা সহ জগন্নাথকে রথে বসিয়ে যাত্রোৎসব করার বিধান। কিন্তু বার নক্ষত্রাদি বিচার না করে শুভ কার্যের বিধান কোথাও বিহিত নয়। এজন্য স্মৃতি শাস্ত্র একে কল্যাণক দিবস রূপে গ্রহণ করে নি। যা স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত নয় অথচ দেশে প্রচলিত তা নিশ্চিত সমাজ ও লোক ব্যবহার সম্মত এবং একটু খোঁজ করলেই এ দুটির মূল যে জৈন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আষাঢ় শুল্কা দ্বিতীয়া ঋষভদেবের গর্ভকল্যাণক এজন্য সেদিন পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব। চৈত্র শুল্কা অষ্টমী ঋষভদেবের জন্ম কল্যাণক দিবস। সেজন্য রথ যাত্রা সেদিন ভুবনেশ্বরে বার করা হয়। জগন্নাথ ঋষভের প্রতীক এরূপ অনেকে মনে করেন। এজন্য ওই দিন জগন্নাথের রথ যাত্রা উৎসব হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে অশোকাষ্টমীতে রথযাত্রা করার কোনো উল্লেখ নেই, কেবল শোক রহিত হোৱা উদ্দেশ্যে পুনর্বসু নক্ষত্রে জলের সঙ্গে ৮টি অশোক কলি পান করার বিধান আছে। তাই জৈন সম্মত রথ যাত্রার সঙ্গেই এর সংগতি।

জগন্নাথের স্নান যাত্রাও জৈন স্নান পূজার মত। ছত্র চামর ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে আঠ কলশ দ্বারা জিন প্রতিমার অভিমেক করা হয়। বিশেষতঃ প্রতিমার চোখ তুলিকা দিয়ে আর একবার রঙ করার যে বিধি জৈন শাস্ত্রে দেখা যায় তারই অনুবর্তনে জগন্নাথ আদি মূর্তি ত্রয়ের স্নান যাত্রার পর হলুদ রঙ লাগিয়ে নব ঘোৰণ আদিতে করা হয়। চোখের নবীনীকরণ লক্ষ্য করবার। জগন্নাথের গোলাকার চোখ ছাড়া আর কিছু রঙ করা হয় না। জগন্নাথ মূর্তি চক্ষু প্রধান। জগন্নাথ শব্দটিও মূলতঃ জৈন শব্দ এবং তা জিনেশ্বর অর্থাৎ আদিনাথ ঋষভদেবের দ্বিতীয় নাম এরূপ অভিধানরাজেন্দ্রে উল্লিখিত আছে। তাই ঋষভদেবের রথোৎসবের রূপান্তর জগন্নাথের এই রথযাত্রা। জগন্নাথের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের ঘোষ যাত্রা নয়, কারণ ঘোষ যাত্রায় প্রত্যাবর্তন নেই। কিন্তু এখানে প্রত্যাবর্তন আছে।

ঋষভদেবের সঙ্গে কল্পবৃক্ষের স্মৃতি জড়িত। জগন্নাথধার্মের কল্পবৃক্ষ জগন্নাথই যে ঋষভ সেই ধারণাকেই পুষ্ট করে। ঋষভ ধর্মচক্রের প্রবর্তন

করেন। ঋষভের ধর্মচক্রই জগন্নাথের নীল চক্র। ঋষভের পূজা ভারতের যে যে ক্ষেত্রে তাকে চক্র ক্ষেত্র বলা হয়। আবু পর্বতের ক্ষেত্রে এজন্য চক্র ক্ষেত্র। উড়িষ্যার কেন্দ্রীয় জেলার আনন্দপুর সাব ডিভিসনে আগে যেখানে ঋষভ পূজিত হতেন তাকেও চক্রক্ষেত্র বলা হয়। অনুরূপভাবে পুরীকে যে চক্র ক্ষেত্র বলা হয়, আজ তাকে বৈষ্ণবরূপ দেওয়া হলেও মূলতঃ ঋষভের পূজা কেন্দ্র রূপেই। এজন্য একথা বলা যায় যে জগন্নাথ আনন্দানিকরূপে জৈন। জগন্নাথের যে আকৃতি তা জৈন প্রতীক বর্দ্ধমঙ্গল ও নবীপদের সংযুক্তরূপ- এও লক্ষ্য করবার।

## বাঁকুড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জিনাসিনী

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়ায় অনেকের কাছে জিনাসিনী থানের কথা শুনেছিলাম। বহুবার ওই থানের পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি। মূর্তিও দেখেছি। গাছের নীচে অশ্বারুদ্ধা দেবী জিনাসিনী। ইনি বাঁকুড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বড় মোটা নিমগাছের সঙ্গে এক হয়ে গেছে অশ্বথ এবং আরও একটি গাছ। স্থানটি হলো বাঁকুড়া শহরে জিনাসিনী লেনে। কয়েক বছর আগের কথা। আমার চোখে পড়ল, গাছের তলায় বাঁধানো দেবীর ওপর চোকো পাথরের সিঁদুরলেপা মূর্তি। পিছনে লোহার একটি ত্রিশূল। সামনে বাঁধানো পূজোর বেদী। শুনলাম, সকালে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ পূজো করেন। কিন্তু প্রতিদিন সকল বর্ণের নর-নারী দেবীকে ফুল, জল, মিষ্টি নিবেদন করতে আসেন। যে যার কামনা, বাসনা, প্রার্থনা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। ভক্তরা দেবীর পূজো দেন। এখানে সকলের পূজো করার অধিকার আছে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে দেবী জিনাসিনীর পূজো করেন। জিনাসিনী লেনের শ্রীমতী চারুবালা দাসী (বয়স ৬০) বলেন, মা আকাশের নীচে থাকতে চান। জল, বড়, রোদ সব কিছু মাথায় করে এই অঞ্চলের সকলকে রক্ষা করছেন।

জিনাসিনী লেনের শ্রীভৈরব মণ্ডল (বয়স ৭০) জানালেন আগে এই অঞ্চলে বন-জঙ্গল ছিল। বনবাসীরা গাছতলায় এই দেবীর পূজো করতেন। এই কারণে লোকে বলতো ‘জিনাসিনীর বন’। জিনাসিনীর বন কেটে ব্যাপারীহাট, নতুন জগত গড়ে উঠে। দেবীর থানের গাছতলার পাশে এক সময় একটি পাকা মন্দির নির্মিত হলো। ওই মন্দিরে দেবী জিনাসিনীকে রেখে পূজো করা হতো। প্রায় ৮০।৯০ বছর আগে ওই মন্দিরের ওপর বজ্রায়াত হয়। মন্দির ভেঙে যায়। তারপর দেবীকে আবার গাছতলায় ভক্তরা নিয়ে আসেন। ভৈরববাবু আরও বলেন, তিনি লোক মুখে শুনেছেন যে, ওই সময় মানুষাকুর নামক এক ব্রাহ্মণ পূজো করতেন। স্বপ্নে দেবী তাঁকে আদেশ করেন যে গাছের তলায় যেন তাঁকে রাখা হয়। মন্দিরে তিনি থাকতে চান না। ভৈরববাবু আরও কয়েকটি ঘটনা জানালেন। পূজারী মানুষাকুর প্রতিদিন দেশী মদ পান করতেন। এজন্য তাঁর পয়সার অভাব হতো। একদিন দেবীর থানে এসে দেখেলেন, কোন ভক্ত প্রণামীর পয়সা দিয়ে যায় নি। ব্রাহ্মণ মদের নেশায় প্রায় উন্মাদ হয়ে দেবীর

মূর্তিতে আঘাত করেন। ফলে মূর্তি দু-টুরো হয়ে যায়। এর পর প্রায় ২৫।৩০ বছর আগে জনৈক ভক্তের ওপর ভর হয়। তিনি দেবীর মূর্তির ওপর পড়ে যান। ফলে মূর্তি আরো ভেঙে যায়।

তারপর থেকে ওই মূর্তি লোহার পাত দিয়ে মুড়ে গাছের গোড়ায় রাখা হয়েছে। তিনি জানালেন, মূর্তি কালো পাথরের। সিঁদুর লাগানো। ছেলেবেলা থেকে তিনি ওই মূর্তি দেখছেন। দেবীর এক হাতে অসি, আর এক হাতে সাপ। আরও দু-হাতে কি আছে তাঁর মনে নেই। প্রায় ২৫ বছর আগে তিনি ওই মূর্তির সিঁদুর তুলে পরিষ্কার করেছিলেন।

দেবী জিনাসিনী সম্বন্ধে আরও কয়েকবার খোঁজ-খবর করেছিলাম। বাঁকুড়ায় নতুনগঞ্জের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি জানিয়েছিলেন- এককালে আমরা ছড়া কেটে দেবীকে প্রণাম জানাতাম। ওই ছড়া আমাদের বাড়ির বড়রা গান গেয়ে শোনাতেন। ছড়াটি হলো এইঃ

মহাদেবী জিনাসিনী ধরা অসি করে।

ব্যাঘ নাশিতে দেবী অশ্বের উপরে।।

দেবী হস্তে কাল সর্প ছুটে যেতে চায়।

ব্যাঘ তাই প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া পালায়।।

জিনাসিনী লেনের পল্লীবাসীরা জানিয়েছিলেন, দেবীর বিশেষ পূজোর সময় ছাগ বলি দেওয়া হয়। বাসন্তী পূজোর সময় জিনাসিনীর ঘট স্থাপন করে পূজো ও হোম হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজোর সময় বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন স্থানের পূজোর কর্মকর্তারা আগে দেবী জিনাসিনীর পূজো দেন। তারপর দুর্গাপূজোর ঘট স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই নিয়ম বহুদিন থেকে চলে আসছে। আজও বাঁকুড়া শহরে অনেকের মুখে দেবী জিনাসিনীর বহু অলোকিক কাহিনী শোনা যায়। জিনাসিনী লেনে বর্তমানে বাউরি, নাপিত, বৈষণব, ময়রা, হাঁড়ি, গড়াই, তামলি প্রভৃতি সম্প্রদায় বাস করেন। সকলে দেবীর পূজো করেন। অনেক আদিবাসীও দেবীর কাছে পূজো দিয়ে যান। জিন অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠের আসন। অনেকে মনে করেন, দেবী ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে থাকায় হয় তো জিনাসিনী হয়েছেন।

এক সময়ে কর্মসূত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জনৈক অধ্যাপক-এর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি দেবী জিনাসিনী মূর্তির বর্ণনা শুনে বলেছিলেন, হয় তো ওই মূর্তি জৈনরা একসময় পূজো করতেন।

‘শ্রমণ’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগণেশ লালওয়ানীর সঙ্গে শুই মূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হয় তো দেবী জিনাসিনী এককালে জৈনদের মন্দিরে ছিলেন। জৈনদের বারো সংখ্যক তীর্থংকর বাসুপুজ্যের শাসনদেবী প্রচণ্ডা বা প্রবরা কৃষ্ণবর্ণা, অশ্ববাহনা ও চতুর্ভুজা, ডানদিকের দুহাতে বরদান ও শক্তি, বাঁদিকের দুহাতে পুষ্প ও গদা। মোড়শ বিদ্যাদেবীর চতুর্দশ বিদ্যাদেবীও অশ্বরাজা। এঁর বর্ণনায় বলা হয়েছে : ‘অচ্ছুপ্তা নামী ১৪ সংখ্যক বিদ্যাদেবী তত্ত্বিংবর্ণা, অশ্বরাজা, চার হস্তবিশিষ্টা, ডানদিকের দুহাতে অসি ও বাণ, বাঁদিকের দুহাতে ঢা঳ ও সর্প। হয়ত জিনাসিনী এই অচ্ছুপ্তা।

## ছড়া গ্রামের জৈন মন্দির

শ্রী তপন চক্ৰবৰ্তী

পুরুলিয়া শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ছড়া গ্রাম। শহর থেকে নিয়মিত বাস, মিনিবাস চলাচল করে।

গ্রামটার একটা বড় বিশেষত হল গ্রামটার বেশীর ভাগ অংশই একটা বড় পাথরের টিলাৰ উপর। শক্ত পাথরের ধরণ দেখলে বোৰা যায় বহু যুগ থেকে এই পাথুৰে জায়গাটুকুতে বনজপল না থাকার দৱণ মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছিল। এবং বসতি ছিল বলেই ধৰ্ম সংস্কৃতি চৰ্চা ও ছিল। গ্রামে তুকলেই প্রাচীন এ গ্রামটির সর্বাঙ্গে যে অমূল্য জৈন সংস্কৃতির অলঙ্কার জড়িয়ে আছে তা অনুভব কৰা যায়।

গ্রামের বৃদ্ধরা বলেন তাঁৰা তাঁদের পূৰ্ব পুৰুষদের মুখ থেকে শুনেছেন গ্রামে তিনটি মন্দির ছিল। পাথরের প্রাচীন মন্দির। তবে এখন আৱ তিনটি নেই আছে মাত্র একটা। মুদীখানার দোকানদার গোপাল চন্দ্ৰ নন্দীৰ বাড়তে মন্দিরটি আজো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে কোন বিগ্ৰহ নেই। তবে বিগ্ৰহটি যে জৈন তীর্থংকরের ছিল তা গ্রামে ঘুৱলেই বোৰা যায়। সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য জৈন মূর্তি ও মন্দিরের অংশ বিশেষ। আধুনিককালে তৈরী কৃতকণ্ঠলি মন্দিরের ভেতর ও বাইরের দেওয়ালে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও অন্যান্য তীর্থংকরের মূর্তিগুলি। একদিক থেকে এটা ভালই হয়েছে। দেশী বিদেশী চোৱেৱ হাত থেকে রেহাই পেয়েছে মূর্তিগুলি গ্রামের অধিক বাজারের কাছে একটা খোলা জায়গায় সিমেন্ট বাঁধিয়ে রাখা আছে আরো কিছু মূর্তি, মন্দিরের ছোট মডেল। তাছাড়া আলগাভাবে রাখা আছে কিছু মন্দলকলস, মন্দির চূড়ার আমলক শীলা ও মন্দিরের নানা অংশের কিছু ভাঙ্গা টুকুৱো। মন্দিরের এ ধৰণের ছোট মডেল আমৱা পাকবিড়বাতেও দেখেছি। তবে গঠন রীতিৰ পাৰ্থক্য আছে। এখানকাৱ মডেলগুলি উডিষ্যা রীতিৰ বেঞ্চ দেউলেৱ। তবে সামনে কোন জগমোহনেৱ অস্তিত্ব নেই। কোনকালে ছিল কিনা তাৰ বোৰা যায় না।

প্রাচীন বাঙ্গালাৰ এই সমস্ত বেঞ্চ দেউল সম্পর্কে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন “প্রাচীন বাঙ্গালাৰ বেঞ্চ দেউল বা শিখৰ দেউলগুলি বিশ্লেষণ কৱেলে সহজেই উহাদেৱ সহিত ভূবনেশ্বৰেৱ শক্রঘ্নেশ্বৰ, পরশুরাম, মুক্তেশ্বৰ প্ৰভৃতি

মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এবং কালের দিক দিয়া যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়।<sup>১</sup>

উড়িষ্যার ঐ সমস্ত মন্দিরগুলি মূলতঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কালের। কোনো কোনটি সন্তুষ্টঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীরও। তাই রেখ দেউল সম্পর্কে এইভাবে সরলীকৃত কাল নির্ণয় সন্তুষ্ট নয়। তবে ছড়রার মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে একটি তথ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথ্যটি হল ছড়রা থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে গোলামারায় প্রাপ্ত একটি লিপি। যার সময়কাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী।<sup>২</sup>

ওই লিপির সময়ই মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছিল বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে ছড়রার মন্দিরগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগের নয়। কিন্তু এভাবে ধরে নেওয়ার অনেক সমস্যা আছে। প্রথমতঃ গোলামারার লিপিটি ঠিক প্রতিষ্ঠিত লিপি নয়। দান সংক্রান্ত লিপি। সেটা মন্দির নির্মাণের বহু পরে হলেও কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয়তঃ গোলামারায় একটিও অক্ষত মন্দির পাওয়া যায়নি। সমস্ত মন্দিরই কালের গর্ভে ভুলঁষ্ঠিত। তাই গোলামারার মন্দিরও যে ছড়রার মতন একই ধরণের রেখ দেউল ছিল এটা বলা যায় না। তবে গোলামারায় চন্দ্রপ্রভসহ জৈন তীর্থকর ও শাসন দেবীর মূর্তিগুলি এখনো আছে। তাই ওগুলিও যে জৈন মন্দিরে ছিল এটা নিশ্চিত। এবং খুব কাছাকাছি দুটি এলাকার জৈন মন্দিরের অস্তিত্ব একই নির্মাণ কালের অনুমানেও নিশ্চিতভাবেই আমাদের নিয়ে যায়।

ছড়রার মন্দিরগুলির গঠন সৌকর্য পাক্বিড়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাকবিড়ায় আমরা ইট ও পাথরের যে মন্দির ও মূর্তিগুলি দেখতে পাই তার নির্মাণ কাল চতুর্থ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। কাছাকাছি লাখান দুর্গি, বুধপুর, বাঁধাকিটি থেকে শুরু করে পরশা পাহাড়, অশ্বিকা নগর, পরেশ নাথ গ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ প্রাচীন জৈন অঞ্চলে যদি আরো অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে আরো প্রাচীন জৈন নির্দশন মিলণেও মিলতে পারে। কিন্তু দশম শতাব্দীর পরে এ অঞ্চলে জৈন প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাই পাকবিড়ার স্মৃতিধারার কোন অনুসন্ধান আমরা ছড়রায় দেখতে পাই না। ছড়রায় যেন আবার নতুন করে শুরু হয়েছিল জৈন সংস্কৃতি চর্চা, সম্পূর্ণ নতুন

১. ডাঃ নীহারণজ্ঞন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পঃ ৮১৮।

২. গোলামারায় পাথরের স্মাবে উৎকীর্ণ লিপি-

“দানপতি সাধকস্য”

সময়কাল ১১-১২ খ্রিস্টাব্দ

পাঠঃ অনন্ত প্রসাদ শাস্ত্রী

তথ্য তরঙ্গদেব ভট্টাচার্য, পুরুলিয়া

উদ্যোগে। তাই ছড়রার জৈন মন্দির যে পাক্বিড়ার পরবর্তী কালের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং ছড়রার উড়িষ্যা রাজির শিল্পকলাও আমাদের উড়িষ্যার শাসকদের সঙ্গে ছড়রার মন্দির নির্মাণের একটি যোগসূত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভুবনেশ্বরের নবমুনি গুহায় জৈন তীর্থকরদের মূর্তি গড়ার ক্ষেত্রে কেশরী বংশের অন্যতম ন্পতি উদ্যোগ-কেশরীর উদ্যোগের কথা প্রমাণিত হওয়ায় জৈন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কেশরী বংশের উদ্যোগকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করতে হয়। বাংলায় কেশরী বংশ শশাঙ্কাক্ষর কালে বা আরো পরবর্তীকালে কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা তা ভেবে দেখার বা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ যখন বিক্রম কেশরী নামে এক বাঙালী রাজার কথা নিয়ে বাংলার নানা স্থানে এত কিংবদন্তী তখন এই বিষয়টি একেবারেই ফেলে দেবার মতন নয়। এবং আশৰ্য্যভাবে মঙ্গলকোট ও দাঁতনে যে দুটি ধৰ্মসাবশেষের সঙ্গে বিক্রম কেশরীর নাম যুক্ত তার মধ্যে থেকে ও আশপাশ থেকে জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।<sup>৩</sup>

তাই কেশরী বংশের শেষ দিকে যদি কোন কেশরী রাজের আনুকূল্যে ছড়রার মন্দিরগুলি নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে এই মন্দিরগুলি যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমসাময়িক বা কিছু পরের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে এ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে।

ছড়রার নদা বাড়ির মন্দিরে আর একটি কুতুহলজনক ব্যাপার হল মন্দিরের আমলক শীলার ঠিক নীচেই যে পলেস্টারার কারুকার্য এখনো টিকে আছে তাতে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি অক্ষিত রয়েছে। এই সামান্য কারুশিল্পটি একদিকে যেমন উড়িষ্যার সংস্কৃতির সঙ্গে ছড়রার মন্দিরের যোগসূত্র নিশ্চিত করে অন্যদিকে জগন্নাথদের যে আদিতে জৈনদের উপাস্য ছিলেন, একথাও নির্দেশ করে। আদি জৈন যুগের জৈন পট্টগুলিতে যে ‘অষ্টমদল’ তথা মঙ্গল চিহ্নগুলি উপাসনা করা হত তার মধ্যে নান্দীরত চিহ্নটি কালক্রমে জগন্নাথে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ছড়রার মন্দিরের ঐ ক্ষয়িষ্ণু সামান্য অলংকরণ এ অনুমানকে আরো দৃঢ় করবে।

ছড়রা বাজারের কাছে মন্দিরের ভাঙা যেসব অংশ রয়েছে তার মধ্যে মন্দিরের উপরের আমলক শীলা ও মঙ্গল কলস অন্যতম। মঙ্গল কলস

৩. (ক) মঙ্গলকোটে বেশ কয়েকটি জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবেদে আছে। অন্যটি কাছাকাছি শক্ষেপুর প্রামে ‘ন্যাংটেশ্বর শিব’ নামে একটি মন্দিরে পৃজিত হচ্ছে। এছাড়া আরো কয়েকটি মূর্তির কথা শুনেছি যেগুলির বর্তমান অবস্থান জানা নেই।

(খ) দাঁতনে ‘অথিসোনার পাঠশালা’ নামে কথিত ধৰ্মসমূহের মধ্যে থেকে ঋষভনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পাক্বিড়াতো আছে যার ছবি ইংরাজী ‘জৈন জার্ণাল’ (Vol. XX No.4) প্রকাশিত হয়েছে। তবে গঠন-রীতির দিক দিয়ে এই কলসগুলি একটু পৃথক্ক ধরণের, একটু বেঁটে ও ঘটের মতন দেখতে। বাজারের কাছে পড়ে থাকা নানা টুকরো, অলংকৃত পাথর ইত্যাদি এই গ্রামে একাধিক মন্দিরের অস্থিতির কথা নিশ্চিতভাবেই ঘোষণা করে।

কিন্তু মোট কতগুলি মন্দির এ গ্রামে ছিল তা গ্রামের লোকদের কথা-বার্তায় বোঝাবার কোন উপায় নেই। কারণ এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানে যারা বসবাস করেন তাদের সঙ্গে এ সব মন্দিরের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নেই। তবে বেশীরভাগ হিন্দু জনের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে যে একেবারেই যোগসূত্র কোনকালে ছিল না তা হলপ করে বলা যায় না। যেমন যে নন্দী বাড়িতে একমাত্র মন্দিরটি রয়েছে সেই নন্দীরা যে আদিতে হিন্দু ছিলেন না এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। নন্দী পদবীটি আমরা গুপ্তযুগ থেকেই বাংলায় পাই। গুপ্তযুগের যে লিপিটি বট গোহালীর জৈন মন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল তাতে জনৈক ‘গুহন্দী’র কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। এই ছড়ার নন্দীরা সুর্ব বণিক। সুর্ব বণিকরাও আদিতে জৈন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

যাইহোক আদিতে কে কি ছিলেন তা নিয়ে ছড়ার কেউ কিছু জানেন না। এবং জানেন না মন্দির সম্পর্কে কোন তথ্য।

তবে ১৯১১ সালে মিঃ কুপল্যাণু ‘মানভূম জেলা গেজেটিয়ার’ প্রণয়নের সময়ে এই ছড়ার গ্রামে আসেন। তিনি গেজেটিয়ারে লিখেছেন ‘সাতটি মন্দির ছিল ওই গ্রামে। তার মধ্যে পাঁচটি ভূলুঁষিত হয়েছে’।<sup>৪</sup> তার মানে মিঃ কুপল্যাণু যখন ছড়ার গ্রামে সফর করেছিলেন অর্থাৎ ১৯১০-১১ সালে তখন এখানে দুটি মন্দির অক্ষত ছিল।

দুটি মন্দির যে কিছুকাল আগেও ছিল সেটা তরুণদেব ভট্টাচার্যও উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ‘পুরুলিয়া’ গ্রামে লিখেছেন ‘‘কিছুদিন আগেও গ্রামের ভেতর দুটি পাথরের রেখ দেউল ছিল। বর্তমানে আছে একটি’’।<sup>৫</sup>

সেই একমাত্র মন্দিরটি এখনো তার ভগ্ন দশা নিয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে আর কতদিন এভাবে থাকবে জানি না। অবস্থা খুব খারাপ-যে কোন সময়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। অবিলম্বে মন্দিরটি সংস্কার করা না হলে বাংলার গৌরবময় জৈন যুগের আরো একটি অমূল্য কীর্তি অচিরেই ভূলুঁষিত হবে।

৪. মিঃ জি কুপল্যাণু, মানভূম জেলা গেজেটিয়ার।

৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পুরুলিয়া।

## রাজা পুন্ড্র ও তাঁর রাজধানী

হরিপ্রসাদ তেওয়ারী

নৃসিংহপ্রসাদ তেওয়ারী

বসুদেবহিণি বা বসুদেব চরিত্র নামক জৈন কথাসাহিত্য আমাদের প্রাচীন কথা সাহিত্যগুলির অন্যতম এবং এর অন্তর্ভুক্ত ইতিহাসের উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রচয়িতা সংঘদাস গণি এতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিবন্ধ করেছেন যা আমাদের অনেক লুপ্ত ও বিশ্বিত স্থান কাল পাত্রের সন্ধান যোগায়, বিশেষ করে মগধ থেকে তাম্রলিপি পর্যন্ত অঞ্চলটি লেখক যেন নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন এরপ প্রতীত হয়।

এই বসুদেবহিণিতে বর্ণিত চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানগুলির মধ্যে রাজা পুন্ড্র উপাখ্যান যা বিশেষভাবে প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের আকৃষ্ট করে।

বসুদেবহিণির প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব কৈশোরে অপূর্ব সুন্দর ছিলেন এবং তাঁর রূপ লাবণ্যে পুরনারীরা চথগ্ন হয়ে পড়তেন। এই ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় বসুদেবের বড় ভাই তাঁকে তাঁর স্বাস্থ্যের অচিলায় প্রায় গৃহবন্দী করেন। বসুদেব এই বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য কৌশলে পলায়ন করে নানান দেশ পর্যটন করেন ও সেইসব দেশের রাজকল্যা বা শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের পাণি পীড়ন করেন। বসুদেবহিণিতে সৌন্দর্য পিপাসু বসুদেবের প্রণয় কথাগুলি বিভিন্ন উপাখ্যানে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন সংঘদাস গণি। যাই হোক এইভাবে নানান দেশ পরিদ্রমণ করতে করতে কোন এক সময় বসুদেবের শ্বশুর রাজা কপিলের পুত্র অঞ্গমস্ত তাঁকে মনোরম তড়াগ, উপবন ও বাটিকা শোভিত মাল্ বা মাল্য (মলয়?) দেশে নিয়ে যেতে চান। (ভাষ্যকার এই অঞ্চলকে গয়ার নিকটবর্তী অথবা তার দক্ষিণ পশ্চিমে বলেছেন।) কিন্তু পথ ভ্রম হওয়ায় তাঁরা বিপরীত দিকে চলতে থাকেন এবং অনেক পরিশ্রমের পর পুন্ড্র রাজার রাজধানীতে এসে উপস্থিত হন।

রাজা পুন্ড্র সম্পর্কে বসুদেবহিণি থেকে জানা যায় যে রাজার পিতার নাম ছিল সুসেন যিনি পুন্ড্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে জনৈক সত্য রক্ষিত মুনির নিকট জৈন বা নির্গুহ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে প্রবৃজ্যা নিয়েছিলেন এবং রাজমাতা বসুমতীও দীক্ষা নিয়ে রাজধানীর প্রবর্জিকাদের আর্যা সংঘের নেতৃত্ব দেন।

এই ধর্মপ্রাণ রাজপরিবারটি জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোনো এক ধর্মীয় উৎসবের পুণ্য তিথিতে রাজমাতার নেতৃত্বে শ্বেতবস্ত্রে অবগুঁষ্ঠিতা আর্যা

প্রজিকাদের শোভাযাত্রাকে লেখক সংঘদাস গণি এক ঝাঁক খেত শুন্ধি  
রাজহস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজমাতা তাঁর আর্যা সংঘ নিয়ে সম্মিকট্টি  
সম্মেয়-শৈল শিখরে তীর্থযাত্রায় যেতেন এমন কি সায়কালেও ওই অঞ্চলে  
থাকতেন।

রাজমাতা বসুমতীকে লেখক রাজা কপিলের ভগী বলে পরিচিত  
করেছেন— যাঁর পুত্র অংশুমন্ত বসুদেবকে এই নগরে নিয়ে এসেছিলেন।

রাজা পুন্ড্র প্রথমে কোন সন্তান ছিল না, পরে তাঁর একটি কন্যা জন্মে  
যাকে রাজমাতা বসুমতীর পরামর্শক্রিয়ে পুত্র সন্তান বলে প্রচার করা হয় এবং  
বিশেষ ঔষধ প্রয়োগে তার স্ত্রী লক্ষণগুলি অবদমিত করে তাকে পুত্রবৎ লালন-  
পালন করা হয়। নাগরিকরা এমন কি রাজার পাত্র-মিত্রাও তাকে রাজকুমার  
বলেই জানতো। যাই হোক কোন এক নগর উৎসবে এঁর গানের সঙ্গে বীণা  
সঙ্গত করতে গিয়ে বসুদেবের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয় যা পরে প্রেম ও  
অবশেষে বিবাহ বন্ধনে পরিণত হয়। এঁদের সন্তান মহাপুন্ড্র নামে বিখ্যাত হন।

পুন্ড্র রাজার নগরীর নাগরিকদের প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে নাগরিকরা  
বেশীরভাগ অগাধ বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন এবং এঁরাই রাজার মন্ত্রী ও অমাত্যাদি  
পদ অলঙ্কৃত করতেন। তারক নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী ছিলেন রাজার মন্ত্রী, যাঁর  
কন্যা সুতারার সঙ্গে অংশুমন্তের বিবাহ হয়। এখানকার শ্রেষ্ঠীরা বাণিজ্যের জন্য  
দেশ বিদেশের দূর-দূরান্তে যেতেন এবং সমুদ্র পথেও বিদেশে যেতেন। সমুদ্র  
যাত্রায় এঁরা অভ্যন্তর ছিলেন যদিও পুন্ড্র রাজার এই শহরটি কোন সমুদ্র বা নদী  
বন্দর ছিল না। এরা সমুদ্র যাত্রার জন্য স্থলপথে তাত্ত্বিক যেতেন ও সেখান  
থেকে বিদেশ যাত্রা করতেন। এখান থেকে মগধ, চম্পা ও অন্যান্য স্থানে  
স্থলপথে প্রধানতঃ গো শকটে পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন।

লেখকের বর্ণনা থেকে থাণবন্ত এই শহরটিকে আধুনিক পরিকল্পিত  
কর্মবন্ত বাণিজ্য কেন্দ্র বলে মনে হয়। এই শহরের প্রশস্ত ও সজ্জিত পথের  
উপর শ্রেণীবদ্ধ বিপণি ও হর্ম্যরাজি বিদেশী পথিকদের বিস্মিত করত। শহরের  
শ্রেষ্ঠীরা এর প্রশস্ত পথ দিয়ে নিজেদের শৌখিন রথ চালিয়ে প্রমোদ অন্মণে  
যেতো। পথগুলি আবার বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। অংশুমন্ত ও বসুদেব যে  
পথের উপর বাসা নিয়েছিলেন তার নাম ছিল বিজয়-পথ। এখানকার  
বাণিজ্যক এলাকাগুলি ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁক-ডাকে সরগরম থাকতো এবং  
শ্রেষ্ঠীদের অক্ষক্রীড়ার জয়-পরাজয়ের উল্লাস নবাগতদের সচকিত করতো।  
এই শহরের বহির্ভাগ তড়াগ, উপবন ও বাটিকা সজ্জিত ছিল— যেখানে নগর  
উৎসবের সময় রাজা, অমাত্য ও শ্রেষ্ঠীরা সকলে সমবেত হয়ে সঙ্গীত, নৃত্য ও  
নাট্য পরিবেশনায় সক্রিয় অংশ নিতেন।

সংঘদাস গণির বর্ণনা থেকে আমরা এই শহরটির অবস্থান সম্পর্কে যে  
অভিজ্ঞান পাচ্ছি সেগুলি নিম্নরূপঃ

১। এই শহরটির অবস্থান মগধের দক্ষিণে (গয়ার বিপরীতে) ছিল এবং  
এই অঞ্চলটি মলয় বা মল্ল দেশ নামে অভিহিত হত। তাত্ত্বিক ও মগধ উভয়  
স্থানের সঙ্গে এর স্থলপথে যোগাযোগ ছিল।

২। শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের এখানে বসবাস থাকায় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিশাল  
বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে লেখক এর যেরকম বর্ণনা করেছেন তা থেকে মনে হয়  
এই শহরটি রাজগৃহ তাত্ত্বিক সংযোগকারী বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত  
একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

৩। সমগ্র রাজপরিবারটিকে যেভাবে জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে  
দেখান হয়েছে তা থেকে মনে হয় এই শহরের অবস্থান প্রাচীন জৈন অধ্যুষিত  
অঞ্চলে ছিল। বিশেষতঃ রাজা পুন্ড্র পিতা সুসেন ও মা বসুমতী জনৈক  
সত্যরক্ষিত মুনির নিকট থেকে নির্বাহ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা থেকে প্রতীত  
হয় যে এই অঞ্চলটি প্রাচীন জৈন ধর্মাবলম্বী সরাক জাতি অধ্যুষিত ছিল।

৪। রাজমাতা তাঁর আর্যা প্রব্রজিকাদের নিয়ে সম্মেয়-শৈল শিখর অঞ্চলে  
যেতেন এমন কি সন্ধ্যার পরেও সেখানে যেতেন এ থেকে বোৰা যায় যে  
সম্মেয়-শৈল শিখর অঞ্চল এই শহর থেকে বেশী দূরের পথ ছিল না এবং  
সন্তুষ্টবতঃ এই পুন্ড্র রাজ্যেই এর অবস্থান ছিল।

৫। রাজা পুন্ড্র অপুত্রক হওয়ায় তাঁর দৌহিত্র মহাপুন্ড্র এখানকার রাজা  
হন। কিন্তু যেহেতু তিনি বসুদেবের পুত্র ছিলেন তাই তাঁর বাসুদেবের নামেও খ্যাত  
হওয়ার কথা এবং এখানে বাসুদেবের স্মারক থাকার কথা।

৬। রাজা পুন্ড্র ও বসুদেবের শ্যালক কপিলপুত্র অংশুমন্ত এখানকার মন্ত্রী  
তারকের কন্যা সুতারাকে বিবাহ করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন  
তাই এখানে অংশুমন্ত অথবা তাঁর পরিবারের স্মারক থাকার সন্তান।

৭। শহরটিকে এবং তার গৌরবময় প্রাণবন্ত অধ্যায়কে যেভাবে বর্ণনা করা  
হয়েছে তা থেকে মনে হয় এই শহরটির অবশেষ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা  
রূপে পরিগণিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে মগধের  
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মালভূমি এলাকা এতদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানকালেও মল্লভূমি  
নামে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের প্রাচীন রাজা ও সামন্তবংশীয়গণ নিজেদেরকে  
মল্লরাজবংশীয় বলতে গর্ববোধ করেন। মানভূম (পুরুলিয়া ও ধানবাদ),  
বাঁকুড়া, সিংভূম, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা ও মেদিনীপুরের কিয়দৃশকে  
প্রাচীন মল্লভূমের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলটির অবস্থান মগধ ও

তাত্ত্বিকপুর মধ্যবর্তী ভূভাগে হওয়ায় তৎকালীন যুগে এর গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। প্রথমতঃ এই অঞ্চলটি ধাতু সমৃদ্ধ ছিল, বিশেষ করে তাঁর ও লৌহ আকরিকের এতো প্রাচুর্য ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ছিল না এবং এই ধাতু সম্পদের জন্যই মগধ সাম্রাজ্য প্রাচীনকাল থেকে এতো শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয়তঃ মগধ থেকে তাত্ত্বিকপুর সংযোগকারী যে বাণিজ্য পথ ছিল সেখালীর এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রসারিত হওয়ার কথা— তাই পুন্ড রাজার স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন সম্পদশালী শহরটির খোঁজে আমরা এই প্রাচীন বাণিজ্য পথগুলির খোঁজ করি। এগুলি সম্পর্কে Archaeological Survey-এর অন্তর্মাণ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

"Roads would naturally lead up from Tamluk to Patna, to Mongeir and elsewhere. There would be a chain of several routes to Patna. Most direct route be through Vishnupur, Bahulara, Sonatapan, Ekteshwar (where Darakeswar river would be crossed), Chatra, Raghunathpur, Telkupi, Jharia, Rajuli and Rajgir. It would cross Salay river at Ghatal, Damuda at Telkupi, Barakar close to phulganj, ranges of hill near Rajuli. Here near every obstacle large cities sprang up."

"Chatra is the point where a road yet in existance and use branched off going close past Pachet, through Pandra, Kharakdiha between river Sakri and Khuri (ancient remains still on Sakri near Mahawar hill) through Nalanda to Rajgir."

Archaeological Survey-এর আলোচনা থেকে আমরা তাত্ত্বিকপুর সংযোগকারী পথে (যা এখনও আংশিকভাবে টিকে আছে) দেখতে পাই একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র যার নাম পান্ডা (জেলা-ধানবাদ)। আমাদের ধারণা প্রাচীন পুন্ড রাজার ও তাঁর দৌহিত্র মহাপুন্ডর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন নগরের অবশেষ এই পান্ডা। পান্ডা বরাকর শহর থেকে প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমে স্থানে এতদ্বিধিলো খ্যাত। পান্ডা শুধু একটি সুবৃহৎ (ধানবাদ জেলার সব চাইতে বড়) গ্রাম নয় এটি একটি পরগণার সদর। বর্তমানকালের দলিলেও পরগণা পান্ডা উল্লেখ করা হয়। বরাকর থেকে ধানবাদ পর্যন্ত বরাকর ও দামোদর নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ পান্ডা পরগণার অস্তগর্ত। বৃটিশ শাসনকালের প্রারম্ভে এখানকার প্রাচীন মল্লরাজ বংশকে বিতাড়িত করে ঘাটওয়াল বংশীয়রা এখানে বৃটিশের করদ রাজবংশ স্থাপন করেন। এই ঘাটওয়াল রাজবংশীয়দেরকে এখনও রাজা বলা হয় এবং এই সম্প্রদায়ের বহু পরিবার এই অঞ্চলে বসবাস করেন। ঘাটওয়াল কথাটির অর্থ ঘাট অর্থাৎ পার্বত্য পথ রক্ষকারী। এই সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল থেকে এই তাত্ত্বিকপুর-মগধ সংযোগকারী বাণিজ্য পথের

সুরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। এই অঞ্চলের বাঙালী বণিকদের একটি পদবী দাঁটি বা দাঁটি যা এই পার্বত্য বাণিজ্য পথের বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে উত্তুত। পান্ডাগ্রাম লোকসংখ্যা ও আয়তন উভয় দিক থেকে এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ গ্রাম এবং একাই একটি পঞ্চায়েত (দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত করার প্রস্তাব রয়েছে)। গ্রামের রাস্তাগুলি যেন আধুনিক নগরের মত পরিকল্পিত এবং যে কোন নগর স্থপতিকে আজও বিস্মিত করে।

বসুদেবহিতিতে রাজা পুন্ড ও সমগ্র রাজপরিবারটিকে জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণনা করায় স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে এই পুন্ড রাজার রাজধানী প্রাচীন জৈন ধর্মাবলম্বী সরাক সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে।

রাজমাতা বসুমতীর আর্য সন্ন্যাসীদের নিয়ে সম্মেয়-শৈল শিখর অঞ্চলে যাওয়া, বিশেষ করে সায়ংকাল থেকে বোৰা যায় যে সম্মেয়-শৈল শিখর এই পান্ডার নিকটবর্তী ছিল। অস্ততঃ সন্ন্যাসীরা নির্ভয়ে পদব্রজে স্থানে যেতে পারতেন। বাস্তবিকই তাই। সম্মেয়শিখরের অবস্থানের সীমা এই পান্ডা থেকে মাত্র ৭ মাইলের মধ্যে। (হাজারীবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়কে সম্মেয়-শৈল শিখর বলা হয় যা পান্ডা থেকে প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থান পান্ডা থেকে প্রায় ৭ মাইল পূর্বে বর্দ্ধমান জেলার প্রাচীন জড়িয় গ্রাম (বর্তমান) যেখানে ভগবান মহাবীর সিদ্ধ হয়েছিলেন তার সন্নিকটে মনে করা হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য-শ্রমণ, কার্তিক, ১৩৯২)

রাজা পুন্ডের পর তাঁর দৌহিত্র মহাপুন্ড এখানকার বিখ্যাত রাজা হয়েছিলেন এবং বসুদেব-পুত্র হওয়ার সুবাদে তিনিও নিশ্চয়ই বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হন। পান্ডা গ্রামে এই বাসুদেবের স্মারক চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। এখানকার একটি ধ্বংসাবশেষ এখন বাসুদেব স্থান নামে অভিহিত। স্থানকার কৃপগুলি দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। আমাদের ধারণা এই বিখ্যাত বসুদেবের পুত্র মহাপুন্ডই ছিলেন মহাভারতে উল্লিখিত পৌন্ড বাসুদেব যার বন্ধু ছিলেন প্রতিবেশী মগধরাজ জরাসন্ধ। যেহেতু কৃষ্ণ ও মহাপুন্ড উভয়েই বাসুদেবের পুত্র ছিলেন তাই দুইজনেই বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর এই বৈমাত্রেয় ভাতাকে ছলে বলে কোশলে ধ্বংস করেন। বৈদিক মতাবলম্বী মহাভারত রচয়িতা এই অবৈদিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষক পৌন্ড বাসুদেবকে ছোট করলেও তাঁর প্রিয় নগরী পান্ডা তাঁকে দীর্ঘকাল স্মরণে রেখেছিল। সংঘদাস গণির সময়েও এই পান্ডা নগরী তার স্থীর গৌরব নিয়ে প্রসিদ্ধ ছিল।

বসুদেবের শ্যালক কপিল পুত্র অংশমত ছিলেন রাজা পুন্ডের শ্যালক এবং তিনি রাজা পুন্ডের মন্ত্রী তারকের কন্যা সুতারাকে বিবাহ করে এখানেই বসবাস করেন। অংশমত বা তার পরিবার জৈন ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা

জানা যায় না, তবে রাজা কপিলের নামে উৎসর্গীকৃত বিশাল কপিলেশ্বরের মন্দির (মন্দির কমপ্লেক্স) এখনো দর্শকদের বিশ্বিত করে। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে সাংখ্যকার কপিল দেবমূর্তির উপাসক ছিলেন না।)

উপরোক্ত যুক্তিগুলি থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে প্রাচীন জৈন ধর্মের একটি পীঠস্থান ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র রাজা পুন্ড্র রাজধানী পান্ড্রা। আজও একটি পরগণার কেন্দ্র হয়ে বর্তমান।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পুন্ড্র অবস্থান তান্ত্রিক থেকে ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে (৪৫°)। হিউ এন সাঙ্গ তান্ত্রিক থেকে ৬০০ লি অর্থাৎ ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কিলিনা সুফুলানা বা কর্ণসুবর্ণে গিয়েছিলেন। আর্য মঞ্চুষ্ট্রী মূলকঙ্গের মতে পুন্ড্রবর্ধনে ছিল শশাক্ষের রাজধানী। আমাদের ধারণা এই পান্ড্রা মঞ্চুষ্ট্রী মূলকঙ্গে বর্ণিত পুন্ড্র নগরী। কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রেয় নাটকে যে রাঢ় দেশের অপরাধী রাঢ়া পুরীর কথা বলা হয়েছে তাও সম্ভবতঃ এই পান্ড্রা বা পাঁরড়া (পাঁড়া)-কেই নির্দেশ করে। এই পান্ড্রা পরগণা থেকে বর্দ্ধমান পর্যন্ত অঞ্চলকে সম্ভবতঃ পুন্ড্র বর্দ্ধমান অঞ্চল বলা হত।

আমরা আগেই বলেছি যে পান্ড্রা গ্রাম ও সমগ্র পরগণা একটি পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা। চারিদিকে প্রাচীন স্তুপ, মূর্তি, মন্দির, ভগ্নাবশেষ ও ধ্বংসস্মৃতিপোর সমাহার। বাসুদেব স্থান ও কপিলেশ্বরের মন্দিরের বিশালত্ব দশনীয়। মন্দির প্রাঙ্গণ সমতল থেকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। চতুর্পার্শ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বিশাল প্রাঙ্গণে ছয়টি বিশাল প্রস্তর নির্মিত মন্দির বর্তমান। এখনকার দুটি জলাশয় রাণীর বাঁধ ও টেঁড়ির বাঁধ (টেঁড়ি = কর্ণভূষণ) এই জেলার সর্ববৃহৎ জলাশয়। অপরাপর জলাশয়গুলি দীঘি, সায়র প্রভৃতি ব্যঙ্গনাময় নামে প্রসিদ্ধ। এই পান্ড্রা পরগণার পুরুষীমায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি বরাকরের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরগুলি। পূর্বোত্তর কোণে কল্যাণেশ্বরীর প্রসিদ্ধ মন্দির (মায়ের স্থান-মাইথন), দক্ষিণে তেলকক্ষের প্রসিদ্ধ মন্দির। এই তেলকক্ষের রাজা পালরাজাদের রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন। পান্ড্রার পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুস্তল, কেশরী, উর্ধ্বচূড়া (উধুড়া), সমৰ্থপুর, বীরসিংহপুর, মদলপুর প্রভৃতি সর্বত্রই প্রত্ন নির্দশনের প্রাচুর্য। এই প্রত্ন সম্পদগুলি অবহেলায়, অ্যত্বে নষ্ট তো হচ্ছেই এবং সব চাইতে দুঃখের কথা এগুলিকে গৃহ নির্মাণের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার প্রতিযোগিতা চলছে। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও যে মন্দিরকে দেখেছি তা আজ নেই। বাড়ী তৈরীর কাজে তার প্রস্তর খণ্ডগুলি ব্যবহিত হয়েছে।

ভারত সরকার তথা বিহার সরকার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট এই প্রাচীন পান্ড্রা নগরের প্রত্ন বস্তুগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্বার ও গবেষণা করার জন্য সন্নির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

## সংকলন

(শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত মানভূম জেলার  
ভূগোল ও ইতিবৃত্তি হতে সংকলিত)

পার্শ্বনাথ-উত্তরভারতে আর্যগণ যখন প্রবলভাবে সভ্যতা বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় কাশীতে অশ্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ব্রান্তী। জৈন পার্শ্বনাথ তাঁহাদের পুত্র। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পার্শ্বনাথ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস ধর্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এক নৃতন ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি প্রায় ৭০বৎসর জীবিত ছিলেন এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে স্থীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। ১০০ বৎসর জীবিত থাকিবার পর পার্শ্বনাথ মানভূম জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পরেশনাথ পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন। পার্শ্বনাথের নামানুসারে মারাংবুড়ুর (বড় পাহাড়ের) নাম পরেশনাথ হইয়াছে।

বর্ধমান (মহাবীর)— পার্শ্বনাথের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধদেবের সম্মানয়িক ভারতে আর একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বর্দ্ধমান। তিনি পাটলিপুত্রের (বর্ধমান পাটলার) ২৮ মাইল উত্তরে বৈশালী নগরের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বনাথের এক মঠে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তথায় ১২ বৎসর তপস্যার পর তিনি এক নৃতন ধর্ম প্রচারে বহিগত হন। এক্ষণে তাঁহার নাম মহাবীর হয়। তিনি সর্ববিধ ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ‘জিন’ বলিত। ‘জিন’ শব্দের অর্থ জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার ‘জিন’ নাম হইতেই তৎপ্রচারিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম হইয়াছে।

এতিহাসিক উইলসন সাহেবের মতে বর্দ্ধমান সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বজ্রভূমি ও সুধীভূমি (ভূমিজ্বুমি) পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। বোডাম, ছড়া এবং পাড়ার জৈন মন্দিরগুলি তৎকালে তাঁহার ভজ্ঞ-শিষ্যগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। জনশ্রুতি আছে পার্শ্বনাথের মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত জৈন বিহার নির্মিত হইয়াছিল এবং বর্দ্ধমান সেগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র।

জৈন সাধুকে তীর্থকর বলা হয়। মহাবীর ৭১ বছর বয়ঃক্রমকালে পাটলা জেলার অস্তগত পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

অনেকের মতে মহাবীর, বৌদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবার ৩৬ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মানভূমি জেলায় জৈন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মেরও বিষ্টার সাধিত হইয়াছিল। এই জেলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কীর্তিশুলি প্রায় সমসাময়িক। তবে জৈনদিগের প্রভাব বৌদ্ধদিগের প্রভাব হইতে কিছু অধিক ছিল। মানভূমের স্থানে স্থানে ধ্বংসাবশেষ সমূহে পরিশুল্ক জৈন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই জৈন প্রভাব পরে ব্রাহ্মণ ধর্মের দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সরাক যুগে-খৃষ্টপূর্ব পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলায় সরাকদিগের প্রাধান্য ছিল। সরাকেরা জৈন ছিলেন। তাঁহারা মানভূমি জেলায় প্রভৃত মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। পাক-বিড়্রার চতুর্দশ জিনবীরের মূর্তিটি খৃষ্টপূর্ব পাঁচ কিলো ছয় শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। উত্তরে গৌরাংড়ি, চেলিয়ামা, তেলকুপি; পশ্চিমে ছেঁছগাঁও ও বেলোঞ্জা; পূর্বে পাক-বিড়্রা ও বুধপুর; দক্ষিণে বোড়াম, দলমি, সুইসা ও সাফারণ এবং মধ্য মালভূমে পাড়া, ছড়ারা ও বলরামপুরে সরাকদিগের বহু প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুবর্ণরেখা প্রদেশ (কিরণ সুবর্ণ রাজ্য) শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অত্যন্ত বৌদ্ধ বিদ্঵েষী ছিলেন। ইহার পর এই জেলায় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অবনতি দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী ব্রাহ্মণ ধর্মের গৌরবময় যুগ বলা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ধর্মের অবনতি কাল। ভূমিজদের অভ্যন্তর এই অবনতির মূল কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই জেলায় তৎকালে মুসলমান-আক্রমণের কোন বিবরণ আমরা অবগত নহি।\*

## পুরুলিয়ার একটি জৈন পুরাক্ষেত্র শিবেন্দু মানা

### প্রাক্ক কথন

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের স্টেটস রিঃঅ্র্গানাইজেশন বিধি অনুসারে, ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের মানভূম জেলার একাংশ পুরুলিয়া জেলা রূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম বাংলার প্রায় সমতল ভূখণ্ডে পুরুলিয়া কেবল ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই সঙ্গে আনেনি, তার সঙ্গে এনেছে এক সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— যার ধারা যুগ যুগান্তব্যাপী ভারতভূমিতে প্রবহমান। ২৪০৭ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কল্ননাতীত দারিদ্র্য, শিল্প-অর্থনীতি-ক্ষিতিতে নির্দারণ অনগ্রসরতা আমাদের বেদনার কারণ হলেও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের দিক থেকে এই জেলার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি, যদিও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বিচারের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারী রাজনৈতিক সীমারেখা অনেকাংশে মূল্যহীন বলেই বোধ হয়।

প্রাচীনকালের বৃহত্তর রাঢ়-বঙ্গের, সিংভূম-মানভূম-বাঢ়খণ্ড এলাকার এবং পাশ্ববর্তী উড়িষ্যা রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্মৃত দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে অধুনাতন পুরুলিয়া তথা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ওপর দিয়ে। এছাড়াও এই অঞ্চল অন্যার্থ এবং আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং সমন্বয়ভূমি, ফলে যেমন মনন-মানসিকতার ক্ষেত্রে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে, লোক চর্চার ক্ষেত্রে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পীতেও বিবিধ সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে এর অঙ্গে অঙ্গে এবং তদনুরূপ সংমিশ্রণও ঘটেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম-দর্শনের অন্যতম হচ্ছে জৈনধর্ম, এবং এই ধর্মের প্রভাব ও প্রসারের একটি মুখ্য কেন্দ্র হচ্ছে প্রাচীন ‘প্রাচ্যদেশ’। ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, “প্রাচ্যদেশের আর্যীকরণ জৈনধর্মের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল”। প্রাচীনকালের রাঢ়ভূমিসহ অধুনাতন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে পুরাণ বর্ণিত প্রাচ্যদেশ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘দি হিস্টোরি অফ বেঙ্গল’ (ভল্যুম-১) গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে : “It appears from the statement of Hiuen Tsang that the Nirgranthas formed a dominant religious sect in

\* মানভূমি জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত, প্রবাসী প্রেস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌর ১৩৪৫।

Northern, Southen and Eastern Bengal in the 7th century A.D...The Nirgranthas, however, seem to have almost disappeared from Bengal in the subsequent period, and the numerous inscriptions of the Palas and Senas contain no reference to them. [pages 410-411, 1st Edition.]

হিউয়েন সাঙ্গের ভারত ভ্রমণের সময় বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব থাকলেও পরবর্তী কালে পাল-সেন রাজত্বকালে জৈন-ধর্মের অস্তিত্ব প্রায় গোপ পেয়ে গেল কেন? প্রাথমিকভাবে এর কারণ স্বরূপে বলা যায়: পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশে যথাক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের পুনর্বৃত্ত্যাপন। এছাড়া প্রাচ্যদেশীয় জৈনধর্ম তখন পশ্চিম ভারতাভিমুখী হতে শুরু করেছে। তথাপি রাঢ় দেশে তখনও জৈন ধর্মের প্রাধান্যের অবশেষটুকু ভালোভাবেই ছিল, কারণ “রাঢ়দেশ, বিশেষ করে সে অঞ্চলের তৎকালীন অরণ্যাবৃত বিষ্টীর্ণ অংশ, কখনই পুরোপুরিভাবে পাল রাজশক্তি কর্তৃত্বের মধ্যে আসে নি। অতএব, উত্তরকালের আশ্রয়প্রার্থী জৈনধর্ম এই ভূভাগেই নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখবার চেষ্টা করে। সেন রাজাদের আমলেও এ-প্রতিষ্ঠা কর্তকাংশে বজায় ছিল মনে হয়”। (বাঁকুড়ার মন্দির, শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, পঃ ৬৮)।

যাই হোক, রাঢ়ভূমি বা অধুনাতন পুরুলিয়াতে জৈন ধর্ম কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান এখনও বিলুপ্ত হয়নি—পুরুলিয়ার ‘সরাক’ (শ্রাবক=সরাক) জাতির লোকেরাই তার প্রমাণ। রাঁচীর শ্রীশরৎচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করে গেছেন: ‘সরাক জাতির গঠন ধর্মবিশ্বাস-মূলক। বর্তমান কালে মানবূম জেলার উত্তর-পূর্বে রঘুনাথপুর, পাড়া ও গৌরাঙ্গড়ি থানার এলাকায় ‘সরাকদের’ সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আর দক্ষিণে ও পশ্চিমে চাঁগিল ও চাস থানার এলাকাতেও কত স্বাক্ষের বাস এখনও আছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আদমসুমারীতে এই জেলায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার সরাকের বাস ছিল। কিন্তু এক সময় এই জেলায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম- সব দিকেই এই সরাক জাতির প্রভাব ও বসতি ছিল। এখনও নানা স্থানে প্রাচীন মন্দিরের এবং জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তর-পূর্বে তেলকুপি ও চেলিয়ামা এবং গৌরাঙ্গড়ি, উত্তর-পশ্চিমে ছেছগাঁও ও বেলোঞ্জা; দক্ষিণ-পূর্বে পাকবিড়া ও বুদ্ধপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বোড়া, দুলমি, দেওলি, সুইসা ও সফারণ এবং মধ্যভাগে পাড়া, ছৱরা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও সরাকদের মন্দিরগুলির সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নির্দশন বর্তমান

(মানবূম জেলায় সাহিত্য সেবা ও গবেষণার উপাদান, শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২)।

কুপল্যান্ড সম্পাদিত মানবূম ডিট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মন্তব্য করা হয়েছে: খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ ছয় শত বৎসর হইতে খৃষ্টীয় সমস্ত শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলায় সরাকদের প্রাধান্য ছিল।

সুতরাং বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের ধাত্রীভূমি পুরুলিয়া তথা বৃহস্তর রাঢ়ভূমি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে জৈন পুরাকীর্তি ‘আবিস্কৃত’ হবে এটা স্বতঃস্ফীকার্য।

### গ্রামের নাম ছড়রা

গ্রাম বাংলার অসংখ্য গ্রামের মধ্যে ছড়রা একটি গ্রাম হলেও ইতিহাসের স্বাক্ষর এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আজও জড়িয়ে আছে, তারই আকর্ষণে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ পত্র-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই গ্রামে এসেছেন।

ছড়রা পূর্বতন মানবূম জেলা (বিহার প্রদেশের অস্তগর্ত) অধুনাতন পুরুলিয়া জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) একটি ছোট গ্রাম (জে এল নং ২৫৫০, পুরুলিয়া মফঃস্বল)। আয়তন প্রায় ২৫০০ একর। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে লোকসংখ্যা মাত্র ৩১০০ জন। শহর পুরুলিয়া থেকে পুরুলিয়া বরাকর রোড ধরে মানবাজারগামী বাসে চার মাইল উত্তর-পূর্বদিকে গেলেই এই গ্রামটি পাওয়া যাবে। বাস রাস্তার ধারেই গ্রামটির অবস্থান। বাস স্টপেজ-ছড়রা হাইস্কুল। ট্রেনে গেলে পুরুলিয়া-আদ্রা লাইনে ছড়রা স্টেশনে নেমে মাইলখানেক পথ হাঁটতে হবে।

‘ড়া’ বা আড়া প্রত্যয়ান্ত গ্রাম নাম পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক মিলে। ছড়রা অস্ত্রিক শব্দোন্নত। অস্ত্রিক শব্দগোষ্ঠীতে ‘ড়া’ ‘আড়া’-র অর্থ ঘর। ‘আড়া’-র ‘ড়া’ প্রত্যয় স্থান নামে ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চারণ ভঙ্গী ছড়রা= ছ (র) ড়া ছড়রা বা ছৱরা এইভাবে বিবরিত হয়েছে বলে অনুমান। গ্রাম নামটি ইংরাজীতে, মিঃ বেগলার লিখেছেন Chhorra, ডালটন লিখেছেন Churra, শ্রীবিনয় ঘোষ এবং মিঃ ডেভিড ম্যাক্কাচন লিখেছেন Chorra.

### ছড়রা-র মন্দির

আজ থেকে অনধিক একশ বছর পূর্বে, ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে মিঃ জে ডি বেগলার পুরাবৃত্ত-অনুসন্ধানী পরিক্রমায় বহির্গত হয়ে এই গ্রামটিতে এসে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, পাথরের অসংখ্য ভগ্ন মূর্তি, মন্দির অলঙ্করণের অংশ বিশেষ সহ মাত্র দুটি প্রায় অক্ষত অভগ্ন পাথরের মন্দিরের সন্ধান পান। মিঃ বেগলারের মতে এই সব মন্দিরের এবং মূর্তির অধিকাংশই হল ব্রাহ্মণ ও বিষেণগামী পাসকদের। তিনি এরই সাথে বুদ্ধ জনকে অর্থাৎ জৈন তীর্থকংরের

উৎকীর্ণ মূর্তি সহ উৎসর্গীকৃত চৈত্য সমূহও দেখেছিলেন বলে মন্তব্য করে গেছেন।

মিঃ বেগলারের পরিক্রমার অন্ততঃ এক দশক পূর্বে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ছোটনাগপুরের তদনীন্তন কমিশনার লেঃ কর্ণেল ডাল্টন এতদাপ্তরে পরিক্রমার পথে ছড়াতে আসেন এবং দুটি অক্ষত অথচ পুরাতন দেউলের সন্ধান পান। ডাল্টন মন্তব্য করে গেছেন : পূর্বে এখানে সাতটি দেউল ছিল, যার মধ্যে পাঁচটি ভূমিস্যাং হয়ে গেছে এবং ভগ্ন মন্দিরের পাথর ইত্যাদি গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘরদোরের কাজে লাগিয়েছেন।

মিঃ বেগলারের পরে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ইলক ছড়ার পুরাকীর্তি দর্শনাত্তে মন্তব্য করে গেছেন : দেউলগুলি পাথরের তৈরী, আকারে নাতিবৃহৎ, এবং যে সব মূর্তি আপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই জৈনমূর্তি, দেউলগুলিও জৈন উপাসকদের বলেই অনুমান, তবে লক্ষ্যণীয়ভাবে ব্যতিক্রম হোল একটি পাথরের লিঙ্গ।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীঅনন্ত প্রসাদ শাস্ত্রী ছড়াতে আসেন এবং তিনিও দুটি প্রায় অক্ষত, অভগ্নি অবস্থায় দণ্ডয়মান পাথরের দেউল দেখতে পান। দেউল দুটির মধ্যে একটি তখনও সংরক্ষণের উপযোগী বলে মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় গ্রামের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় অসংখ্য ভগ্ন জৈনমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন।

ক্যুপলান্ড সম্পাদিত মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও ছড়ার সাতটি দেউলের মধ্যে দুটি প্রায় অক্ষত দেউলের উল্লেখ আছে।

স্বর্গত নির্মলকুমার বসু 'মানভূম জেলার মন্দির' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) মন্তব্য করেছেন : 'ছড়ায় খাজুরাহার মত যুগল জৈন মূর্তি ও তীর্থকংবরদের মূর্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

লেঃ কর্ণেল ডাল্টন, মিঃ বেগলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র রায় প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান থেকে এ কথা স্বতঃই সমর্থিত হয় যে, ছড়ায় একদা জৈন ধর্মের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্দেশ প্রথ্যাত মন্দির প্রেমিক ও ভারতবিদ মিঃ ডেভিড ম্যাক্কাচন ছড়া পরিদর্শনাত্তে ছড়ার পূর্বোক্ত দুটি প্রায় অভগ্নি অক্ষত দেউলের মধ্যে মাত্র একটিকে তখনও সংরক্ষণের যোগ্য অবস্থায় দেখতে পান। ছড়ার দেউল সম্পর্কে 'নোটস-অন দি টেম্পলস অফ পুরুলিয়া' শীর্ষক

একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : The one which is still standing has an entirely plain *tri-ratha* wall only the most rudimentary moulding at the base but the tower is quite extensively carved with square *bhumi-amalakar* large *chaityas* on the central projection, and small *chaityas* on the other sections-- now badly worn. The ornamentation of the 'shikhar' suggests an earlier stage than that of the Telkupi temples." [Purulia District Census Handbook, 1961]

ভারতীয় দেবালয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ত্রিরথ বিন্যাসটি সর্বপ্রাচীন, পঞ্চরথ সপ্তরথ বিন্যাস পরবর্তী কালের। তাছাড়া, মিঃ ম্যাক্কাচন ছড়ার সঙ্গে তেলকুপির মন্দির শ্রেণীর শিখর দেশের যে তুলনা দিয়েছেন, সেই তেলকুপি গ্রাম তার বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন সহ কংসাবতী জলাধারে নির্মিত হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রামের সময় জল করে গেলে নির্মিত অথচ সংরক্ষণযোগ্য অবস্থায় দণ্ডয়মান কিছু কিছু মন্দিরের পূর্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হতে পারে এবং টেলিফটো লেন্স যোগে আলোকচিত্রাদি নেওয়া যেতে পারে। উৎসাহী এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার শ্রীমতী দেবলা মিত্র প্রণীত 'তেলকুপি—এ সাবমার্জড টেম্পল সাইট ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল' প্রস্তুতি দেখতে পারেন এবং হাওড়ার আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা (নবাসন, বাগনান) অথবা নিজবালিয়া সবুজ গ্রামারের সংগ্রহালয় বিভাগের উদ্যোগে যে সমস্ত আলোকচিত্রাদি সংরক্ষিত আছে তাও দেখতে পারেন। বলা বাহ্য্য, তুলনামূলক বিচার বা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের অবলুপ্তি এবং সময় মতো সচেতন না হওয়া যে কতখানি দুর্ভাগ্যজনক তা তেলকুপি ও ছড়ার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। তেলকুপিও এক সময় জৈন ধর্মবিলম্বীদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

লেঃ কর্ণেল ডাল্টন, মিঃ বেগলার উল্লিখিত ছড়ার দুটি প্রায় অক্ষত দেউলের মধ্যে একটিকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখে এসেছিলাম অপরটি ভূমিস্যাং হয়ে গেছে এবং যথারীতি পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে মন্দিরের পাথরগুলিকে নিজেদের ভোগে লাগিয়েছেন। ছড়ার 'সবে ধন নীলমণি' অনুল্য নির্দশনটির বর্তমান অবস্থা কি রকম? মানুষী অবহেলা এবং প্রাকৃতিক পীড়ণ উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার আয়ু আর বেশীদিন নয়, কারণ, দেউলটির সামনে পিছনে গগ্নি অংশে শীর্ষদেশে পর্যন্ত লম্বালম্বি একটি ফাটল লক্ষ্যণীয়ভাবে চোখে লাগে। অনেক জায়গার পাথর খসে পড়েছে আর

শীর্ষদেশের আমলকের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষী অবহেলা এবং প্রাকৃতিক পীড়নের করণ পরিণতি, ধ্বন্দের বীজস্বরূপ একটি অশাখ বৃক্ষ দেউলটিকে পাক দিয়ে সতেজ বেড়ে উঠছে—এর পরিণতি কি হতে পারে তা আমরা জানি। ছড়রার এই অম্ল্য প্রত্নকৌতুর্তি বিলুপ্ত হয়ে গেলে কিছু আলোকচিত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীকৃত তথ্য বিবরণ ইত্যাদি ছাড়া ভবিষ্যত অনুগামীদের জন্য বিশেষ কিছুই থাকবে না।

ছড়রার দেউলটির তিনটি অংশ- বাঢ়, গণ্ডী ও মস্তক। বাঢ় অংশের দুটি ভাগ— পা-ভাগ ও বরণ। বাঢ় অংশের উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট এবং এই অংশটি ত্রি-রথ শৈলীতে নির্মিত। কেন্দ্রীয় রথটি দেউলের মূলগত্ব থেকে প্রায় ৩ ইঞ্চি উঁচু। স্বর্গত ম্যাক্রাচচন কর্তৃক গৃহীত দেউলটির বিভিন্ন অংশের মাপগুলি হল : ভিত্তিভূমি— ৭'-৬" × ৭'; গর্ভগৃহ— ৪' × ৩'৮"; উচ্চতা— আনুমানিক ২২ ফুট।

এছাড়া সংগৃহীত অন্যান্য অংশের মাপগুলি হল, গর্ভগৃহের উচ্চতা (গর্ভগৃহের ভূমি থেকে) ৮' ২"; প্রবেশদ্বারের উচ্চতা (প্রবেশ পথের মেঝে থেকে) ৫' ৫"; প্রবেশদ্বারের প্রস্থ- ২' ২"।

গর্ভগৃহের মাথাটি দুটি আয়তকার পাথরের স্লেট দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তার ওপর যে মন্দির শিখরটি বর্তমান অর্থাৎ গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বেঁকি পর্যন্ত গণ্ডীর মধ্যেকার অংশটি ফাঁপা। ফাঁপা রাখা হত যাতে মন্দিরের গণ্ডী অংশ অনাবশ্যক ভারী হয়ে না যায়। দেউলটির গণ্ডী অংশটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। কোণাংশগুলির স্তর একটি আমলকের আকারে খোদিত। অপর স্তরটিতে এককালে হয় তো অন্যপ্রকার অলঙ্করণ ছিল, বর্তমানে দু-এক স্থানে তার আভাস মাত্র চোখে পড়ে। দেউলটির সম্মুখভাগের কেন্দ্রীয় পগটিতে বাঢ়ের বরণ অংশের উপরে একটি এবং কিছু দূর ব্যবধানে আরও দুটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত ধরণের এক ধরণের অলঙ্করণের আভাস বেশ স্পষ্ট। দেউলের বাকী তিনি দিকের কেন্দ্রীয় পগটিলিতে হয়ত কোণাংশগুলির মত আমলক সদৃশ্য অলঙ্করণ ছিল। ক্ষয় প্রাপ্ত পাথরের গায়ে যেন তারই ইঙ্গিত। দেউলের মস্তকাংশে বেঁকি ও আমলক ছাড়া আর কিছু নেই। আমলকের নিম্নাংশ এবং বেঁকির উর্ধ্বাংশের মধ্যে সামান্য পলেস্তারার আবরণ এখনও দেখা যায় এবং এই পলেস্তারার ওপর একটি সুকুমার অলঙ্করণ কালের হাত এড়িয়ে আজও রয়ে গেছে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে, বোধ করি এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এককালে সমস্ত দেউলটিতে পলেস্তারার আবরণ ছিল এবং তার ওপর ছিল নানান মনোহারী চিন্দ্রবী নয়নলোভন শৈলিক কার্যকর্ম।

এবার একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ছড়রার দেউলটি কতকালের প্রাচীন? স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচী) একটি প্রবন্ধে মস্তব্য করেছেন : ‘সন্তুতভং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মানবুম জেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় এবং দশম খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরাকার্ষা হয়। এই জেলার হিন্দু দেবদেবীর পুরাতন মন্দিরগুলি অধিকাংশ ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়।’ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃঃ ৫৪৬)

এতদ্সত্ত্বেও যেহেতু ‘রাঢ়ভূমির অব্যবহিত পশ্চিমে সিংভূম, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে পরেশনাথ পাহাড় ও গঙ্গোয়ানা অবধি এলাকা প্রাচীনকালে জৈন ধর্মের বিকাশের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল’, যেহেতু অন্যত্র জৈন ধর্মের গতি বা বিকাশ রূপে হলেও উত্তরকালে জৈন ধর্মের মূল কেন্দ্রটি রক্ষায় সর্বতো প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে অনুমান।

এছাড়া, স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্যিভ্যাল স্কালপটার’ গ্রন্থে বলেছেন যে রাঢ়দেশে বা তার অব্যবহিত পশ্চিমে লিপিযুক্ত কোন জৈন মূর্তি পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত বিগ্রহগুলির কালনির্ণয় সেজন্য অসুবিধাজনক হলেও তিনি অনুমান করেছেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। বলা বাহ্য, এ-মূর্তিগুলির অধিষ্ঠানের জন্য সেকালে মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। “খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক অবধি, পূর্ব ভারতে রাঢ়ভূমিই জৈন ধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল ছিল” (বাঁকুড়ার মন্দির, শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩-৭৪)।

পূর্বের্ক মস্তব্য সমূহের আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি, খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় ছড়রার দেউলও নির্মিত হয়েছিল। ভারতীয় মঠ মন্দির স্থাপনার ক্ষেত্রে যেহেতু পারমার্থিক চিন্তাই মুখ্য, সেহেতু মঠ-মন্দির স্থাপনার ইতিহাস, সন তারিখ বাহ্যে বিবেচনায় বর্জিত হওয়ায় ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে— ছড়রার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলে, যুক্তিনিষ্ঠ অনুমানের ওপরই কালনির্ণয় নির্ভরশীল হয়েছে।

### অন্যান্য পত্র-নির্দর্শন

ছড়রা গ্রামের গোটাচারেক প্রায় আধুনিক কালের মন্দিরে ভগ্ন ও অভগ্ন দেবদেবী বা জৈন মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে। বলাবাহ্যে এগুলি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক পূজার্চনার নিমিত্ত সংগৃহীত। গ্রামের মধ্যস্থলে রয়েছে গ্রাম

দেবতা ধর্ম ঠাকুরের স্থান। গ্রামবাসীদের কাছে ধর্ম ঠাকুরের স্থান হলেও সেটি আমাদের মতো বহিরাগতদের কাছে ‘মিউজিয়াম’-বিশেষ। অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ছোট ছোট পাথরের খণ্ড, ছোট ছোট মূর্তি, মূর্তির ভগ্নাংশ যা কিছু এই গ্রামের নানান জায়গায় পাওয়া গেছে, সে সব কিছুই একটি জীর্ণ মাটির ঘরে, মাটির উচু বেদীর ওপর রাখা আছে। এই তথাকথিত মন্দিরটি স্থানীয় ভোমদের। তারা এখানে সংগৃহীত বিচিত্রিত প্রস্তরখণ্ড ও জৈন মূর্তিকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করে থাকে। এখানে সংরক্ষিত একটি জৈন মূর্তির মন্ত্রকে সর্পচাদন দেখে পার্শ্বনাথের মূর্তি বলে অনুমান করা যায়। এই ধর্মরাজের স্থান থেকে পথগু-  
ষাট ফুটের মধ্যে প্রায় একটি সরল রেখার আশেপাশে দুটি দালান মন্দিরের গাত্রে জৈন মূর্তি প্রোথিত আছে। দালান মন্দিরগুলি অর্বাচীনকালের। একটি হচ্ছে শিবমন্দির, অপরটিকে বলা হয় বাসন্তী মেলা। শিব মন্দিরের প্রবেশ পথের ডান দিকে দেয়াল গাত্রে যে জৈন মূর্তি প্রোথিত আছে সেটি অষ্টম তীর্থকর চন্দ্রপ্রভর-পাদপীঠে খোদিত অর্দ্ধচন্দ্র তাঁরই লাঙ্ঘন। বাসন্তী মেলা নামীয় দালান মন্দিরের একটি থামের গায়ে যে জৈন মূর্তিটি প্রোথিত আছে সেটি প্রথম তীর্থকর আদিনাথ বা ঋষভনাথের মূর্তির পাদপীঠে বৃষত লাঙ্ঘন আছে। রিলিফ পদ্মাস্তুতে খোদিত পাথরটি দৈর্ঘ্য ৩'৯", প্রস্থ ১'১"; মূর্তিটির উচ্চতা ২'৬"। সমভঙ্গে দণ্ডায়মান দিগন্বর মূর্তি। এই মূর্তির দু'পাশে স্বল্প উচ্চতা-বিশিষ্ট সালঙ্কার, বসনাবৃত কটিদেশে, আভঙ্গস্থামে দণ্ডায়মান দুটি পুরুষ মূর্তি। এই মূর্তি দুটির দৃষ্টি- আদিনাথের মুখের দিকে নিবন্ধ-এর ব্যঙ্গনাটি এই, সাধারণ মানুষের তুলনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত পার্থিব গুরু বা অপার্থিব দেবতা কত মহান्। কৃত বিরাট।

পূর্বোক্ত ধর্মরাজের স্থানের কয়েক গজ দূরেই একটি দেউলের ভিত্তিবেদী দেখা যায়। এখানে একটি অমলক এবং নানাবিধ উচ্চতার কয়েকটি ‘ভোটিভ’ চৈত্য পড়ে রয়েছে। ‘ভোটিভ’ চৈত্যগুলি দেউলাকৃতি এবং চারিদিকে চারটি প্রকোষ্ঠে জৈন তীর্থকর মূর্তি খোদিত আছে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি ছাড়াও গ্রামে একটি অতি সাম্প্রতিক কালের শিব মন্দির আছে। এখানেও গুটি কয়েক উল্লেখযোগ্য মূর্তির নিদর্শন থাকায় প্রত্যক্ষদর্শীকৃত একটি বিবরণ তুলে ধরছি- “...এই দালান মন্দিরের অন্তি প্রশস্ত গর্ভগৃহের দুটি দেওয়ালে দুটি জৈন মূর্তি গাঁথা আছে। একটি জৈন মূর্তি আদি তীর্থকর ঋষভনাথের। খোদিত পাথরের খণ্ডটির উচ্চতা আনুমানিক আড়াই ইঞ্চি। মূর্তির বামপার্শে একটি ছোট পুরুষ মূর্তি আভঙ্গস্থামে দণ্ডায়মান। মূর্তিটির গায়ে অলঙ্কার, কটিদেশ বস্ত্রাবৃত। ঋষভনাথের ডানদিকে অনুরূপ মূর্তি

এককালে অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা নেই। পরিবর্তে সে স্থানে একটি ছোট জৈন মূর্তি স্থুলহস্তে প্রাথিত। মূলমূর্তির পেছনে চালচিত্র মন্দিরাকৃতি। তবে বর্তমানে চালচিত্রটি ভেঙ্গেচুরে বিকৃত হয়ে গেছে। যেটুকু অবশ্যে আজও আছে তা দেখে একথা নিঃসন্দেহে মনে করা যেতে পারে যে, চালচিত্রটি এবং মূর্তির পার্শ্ববর্তী অংশগুলো এক সময় নানান অলঙ্করণে নিপুণভাবে খোদিত ছিল। ...বিতীয় জৈন মূর্তিটি- অপেক্ষাকৃত ছোট, মস্তকবিহীন এবং নানাভাবে বিকৃতা” (পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি ছড়রা, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, ছত্রাক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)

ছড়রার পূর্বোল্লিখিত সাতটি দেউলের মধ্যে, ছড়রাতে আছে বা ছিল তিনটি, বাকী চারটির সন্ধান মিলবে ছড়রার উত্তর-পশ্চিমে বাঁধগড় গ্রামে।

## তাত্ত্বিক জৈনধর্ম কোরক চৌধুরী ও সৌম্যেন্দু চক্রবর্তী

বিগত বছরগুলিতে নিরক্ষর অনুসন্ধানের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জৈনধর্ম সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে দেশী-বিদেশী নানা সাহিত্যে<sup>১</sup> এ পর্যন্ত পাওয়া প্রাসঙ্গিক উল্লেখকে যুক্তভাবে পর্যালোচনা করলে এই ধারণা সন্দেহাত্তীতভাবে গড়ে উঠে যে, জৈনধর্ম বর্দ্ধমান বিভাগের সর্বদক্ষিণ জেলা মেদিনীপুরের জন-জীবনের উপর দীর্ঘকাল ধরে (অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ) গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে একই সঙ্গে রাঢ় সত্যও বিনা দ্বিধায় স্বীকার্য যে, একদিকে যেমন আছে যথেষ্ট তথ্যের অভাব, অন্যদিকে তেমনি আছে আলোচ্য ক্ষেত্রে ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের ও অন্যান্য সম্পর্কিত শাখাগুলির যোগাযোগ নির্ভর বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার উপযুক্ত অগ্রগতি না হওয়া। ফলে শুধু যে এই পর্যায়ের ইতিহাসে অনেক প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হয় নি তাই নয়, বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জনও সম্ভব হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সঠিক কোন সময়ে জৈনধর্ম মেদিনীপুরে প্রথম প্রবেশ করেছিল- এরকম একটি প্রারম্ভিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও সর্ব সম্মত উত্তর সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় নি, বিশেষ করে যখন বাংলাদেশে জৈনধর্মের সুত্রপাতের সময়ের মূল সমস্যাটির এখনো অর্মানিসত্ত্ব। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা সহজবোধ্য যে কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত ও রূপনারায়ণের তীরবর্তী প্রাচীন তাত্ত্বিক তমলুক যদি এদের অভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়)- এর মতো একটি আপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে জৈনধর্মের উন্নত এবং বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করা বা এ বিষয়ে নানা তথ্য সহযোগে একটি প্রাঞ্জল চির উপস্থাপিত করার প্রশ্নটি কতোটা জটিল, যদিও শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলার নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও প্রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ বন্দর-নগর হিসেবে তাত্ত্বিকের সর্ব ভারতীয় পরিচিতি আছে। স্বভাবতঃই এই জরুরী বিতর্কে বিশেষজ্ঞদের লেখার মাধ্যমে নানা মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত মতামতের মধ্যে- কোনো কোনোটি খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হলেও অস্ততঃ এ থেকে বোঝা যায় একই সঙ্গে বিতর্কের তীব্রতা এবং সহসা

কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পক্ষে বিষয়টির অস্পষ্টতা। তবুও মনে হয়, নানা ধ্যানধারণার এই ধূমজালের মধ্যেই হয় তো প্রকৃত চিত্তটা কিছুটা আঁত্বাগোপন করে আছে।

শ্বেতাম্বর জৈন গ্রন্থ কল্পসূত্র থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ শ্রীষ্ট জন্মের প্রায় আটশো বছর পূর্বে পুরু, রাঢ় এবং তাত্ত্বিকে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এ থেকে সন্তুতঃ মেদিনীপুর বা তদন্তগত তাত্ত্বিকে জৈনধর্মের অনুপ্রবেশের উর্ধ্বর্তম সম্ভাব্য কালের আংশিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে অস্ততঃ এ বিষয়ে আস্থা স্থাপন করার মতো যুক্তি আছে যে আনুমানিক শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ধমান মহাবীরের মৃত্যুর পূর্বেই তাত্ত্বিকে জনসাধারণ জৈনধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হলো ভগবতীসূত্র (বা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি) নামক জৈন গ্রন্থের সাক্ষ্য<sup>২</sup>, যার তৃতীয় শতকে বর্ণিত একটি মনোজ্ঞ কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় না যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগরী তাত্ত্বিকে অঞ্চলে বসবাসকারী ধনী বণিক তামলি মোরিয়পুত্র মহাবীরের জীবিতকালেই তাঁর বাণী শ্রবণে মুক্ত হয়ে জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অতুল ধনবৈভব পরিত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হন। অবশ্য “মোরিয়পুত্র”- এই উপাধি, পদবী বা বিশেষণটির অস্তিত্ব থেকে তামলিকে মোরিয় বা মৌর্য রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করার সন্তুতঃ কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। তবে মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে এখনো যে তামলি (-তাম্বুলী-পান বিক্রয়কারী) শ্রেণীর কিছু লোকের বাস আছে তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা উপরিউক্ত তামলি মোরিয়পুত্রের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পৰ্ক ছিলেন কি না, এবং তামলিদের এখনো টিকে থাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জৈনধর্মের বহুতী ধারাকে লক্ষ্য করা যাবে কিনা, তা একান্তই অনুমানের বিষয় এবং ব্যাপকতর গবেষণা সাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা হলো, বৌদ্ধ “অঙ্গুত্ত-নিকায়” গ্রন্থে ঘোড়শ মহাজনপদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে মাত্র দুটি প্রাচ্য জনপদের নাম স্থান পেয়েছে- অঙ্গ এবং মগধ। কিন্তু একই তালিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে আর্যদের বাসভূমি হিসেবে জৈন ভগবতীসূত্রে<sup>৩</sup> পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তিনিটি প্রাচ্য জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে- অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাঢ় (বা রাঢ়)। এদের মধ্যে বঙ্গ জনপদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে, যদিও

১. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol.I, PP. 572 ff.

২. Indian Antiquary, Vol. XX, 1891, P.375.

সাধারণভাবে মনে করা হয়, বঙ্গ বলতে দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র তীরবর্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বাংশকে বোঝায়। কিন্তু “প্রজ্ঞাপনা”-র মতো কয়েকটি জৈন গ্রন্থে<sup>৩</sup> ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরস্থ কিছু অঞ্চলকে (যেমন তমলুক) বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা গৃহীত হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, আদিমতম—আর্য-হিসেবে জৈনধর্মই মেদিনীপুর তথা তাজলিপ্তে প্রথম অনুপ্রবেশ লাভে সমর্থ হয়েছিল। এ থেকে আরো প্রমাণ হবে যে ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক পর্বে মহাবীর ও তাঁর শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টা প্রাগ-আর্য কৌম সমাজবন্ধ স্থানীয় মানুষের লাঙ্ঘনায় ব্যাহত-হলেও (আয়ারঙ্গ-সুন্তে যার বিবরণ আছে<sup>৪</sup>) জৈনধর্মের অগ্রগতিকে খুব বেশী দিন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। বরং অচিরেই জৈনধর্ম দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা সহ সমগ্র তাজলিপ্তকে প্লাবিত করেছিল।

তাজলিপ্তে জৈনধর্মের বিস্তারের পরবর্তী ইতিহাসের সূত্র উদ্বারের জন্য পূর্বোক্ত খেতাবৰ জৈন গ্রন্থ কল্পসূত্রের<sup>৫</sup> অন্তর্গত থেরাবলী (বা হ্রবিরাবলী)-র দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠে দেখা যায় যে, বিখ্যাত জৈন আচার্য পথওয় শ্রত-কেবলী ও মৌর্য সম্বাট চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাণ্ডক ভদ্রবাহুর (ঝীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী) শিষ্য গোদাস নিজ নামানুসারে গোদাস-গণ নামে একটি জৈন শাখা বা সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে এই শাখা চারিটি প্রশাখায় বিভক্ত হয়, যার মধ্যে একটির নাম ছিল তামলিত্তিয়া (তাজলিপ্তিক) এবং অন্য তিনটি হলো কোডিবর্ষিয়া (কোটিবর্ষীয়, দিনাজপুর জেলার বাণগড় অঞ্চল এবং প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী), পোগুবর্ধনায়া (পুড়ুবর্ধনায়, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা সহ উত্তরবঙ্গ) এবং দাসী-খবডিয়া (দাসী-খবটীক, পরিচয় সমস্যামূলক, কারো মতে, তাজলিপ্ত ও সুন্মোর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী প্রাচীন কর্বটি বা খবটি জাতি<sup>৬</sup>)। যাই হোক, থেরাবলীর এই সাক্ষ্যে উল্লিখিত চারিটি প্রশাখার মধ্যে একটি সরাসরিভাবে সুপরিচিত—তাজলিপ্ত জনপদের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রমাণিত হয় যে আনুমানিক ঝীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বা তার পূর্বেই অর্থাৎ আজ থেকে দুঃহাজার বছরেরও আগে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে জৈন সম্প্রদায়ের

৩. Ibid.

৪. I.8.3; Sacred Books of the East Series, Vol. XXII, (Jaina-Sutras, Part I), PP. 84-85; B.M. Barua, The Ajivikas, P.57.

৫. SBE. Vol. XXII, P.288, Kalpasutra by H. Jacobi, P.79; Kalpasutra by Rev. J. Stevensons P.78.

৬. Indian Historical Quarterly, Vol. VII, 1932 September, No.3, PP. 329-30.

গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া, ঝীষ্টেন্দ্র প্রথম শতকে উৎকীর্ণ কিছু কিছু অভিলেখ<sup>৭</sup> থেকেও কল্পসূত্রে এই ধর্মীয় প্রশাখাগুলির অস্তিত্বের বাস্তব প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন মেলে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই সময়ের অনেক আগেই এই প্রশাখাগুলি সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এখানে আরো একটি কৌতুহলোদ্বীপক তথ্য বিবেচনার আছে। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাবে সম্পাদিত, কিন্তু প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী, জৈন উপাস গ্রন্থগুলিতে বঙ্গ ও তাজলিপ্তের অধিবাসীদের আর্যত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই উল্লেখ দেখে নিরাপদে অনুমান করা যায় যে বেদে বঙ্গদেশ অন্যান্য বাসভূমি রূপে অবহেলিত হলেও জৈনধর্ম এখানে সাধারণ মানুষের আনুকূল্য লাভ করেছিল বলে তাদের আর্যত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ হিউয়েন-সাঙ্গের ভারত ত্যাগের (৬৪৪/৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর শুধু তাজলিপ্তে বা মেদিনীপুরেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশে জৈনধর্মের অবস্থা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট চিত্র পাওয়া কঠিন। যদিও পূর্বভারতে বাক্পতির সমসাময়িক কবি বপ্পভট্টি (অষ্টম শতাব্দী) কনৌজের রাজা যশোবর্মনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আমরাজকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়, তবুও এই ধারণা অনেকাংশে সঠিক নয়, এই সময় থেকেই বাংলাদেশে ধীরে ধীরে জৈন প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। তবে তাজলিপ্তে জৈনধর্মের বোধ হয় সমাপ্তি পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত সূত্র পাওয়া যায়। যেমন অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিভদ্র কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত খেতাবৰ জৈন গ্রন্থ সমরাইচকহা (বা সমরাদিত্যকথা)-তে তাজলিপ্ত বন্দরের উল্লেখ আছে। ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জৈন লেখক সোমদেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত “ঘশস্তিলকচম্পু” কাব্যে<sup>৮</sup> তাজলিপ্ত অঞ্চলে জৈন মন্দিরের অস্তিত্বের কথা দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, সুত্রকৃতাঙ্গ চূর্ণী নামক জৈন গ্রন্থে তাজলিপ্ত প্রদেশে ভয়াবহ মশকের প্রাদুর্ভাবের বিবরণ রয়েছে, যা থেকে সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত মেলে।

এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত ও আলোচিত নানা শ্রেণীর জৈনধর্ম সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক বিবরণ পাঠে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্ধমান মহাবীরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্ম প্রচারের যুগ অত্যন্ত ক্লেশ, দুঃখ ও

৭. Guérinot, Epigraphia Jaina, PP.36 ff, 71 ff.

৮. Indian Antiquary, Vol. XX. 1891, PP. 374 ff.

৯. K.K. Handiqui, Yasastilaka and Indian Culture, P.414.

বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও জৈনধর্মের অগ্রগতি থেমে থাকে নি। বরং পরবর্তী সময়ে আরো ব্যাপক ও সংবিধান প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্তরীকরণের কাজ গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর ফলে নানা স্থানে জৈনধর্মের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাস্লিষ্টে জৈনধর্মের পতনের প্রশ্নে একান্তভাবে কোন স্থানীয় কারণ কাজ করেছিল কিনা তা নির্ণয় আয়াসসাধ্য। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, তাস্লিষ্টে জৈনধর্মের পতনের কারণগুলির বাংলার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই ধর্মের অবনুস্থির জন্য দায়ী ঘটনাগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় তথ্য হলো, জৈন লেখক বালচন্দ্র-সুরি রচিত ঐতিহাসিক কাব্য বসন্তবিলাস-এর দশম সর্গ থেকে জানা যায় যে, গুজরাটের চৌলুক্য শাসক বীরধবলের মন্ত্রী বন্ধুপাল (১২১৯-১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) তীর্থ পরিক্রমার সময় গৌড় এবং বঙ্গের সংঘপতিদের (অর্থাৎ জৈন সংঘের প্রধানদের) দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। এই উল্লেখ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এমনকি ভ্রয়োদশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশে রীতিমত জৈন সংঘ ছিল, তাদের প্রভাব যতেই ক্ষীণ হোক না কেন। কিন্তু এতৎস্তেও এটি সুস্পষ্ট যে, নবম-দশম শতাব্দী থেকেই জৈনধর্ম দ্রুত পতনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। পাল ও সেনবংশের অসংখ্য লিপিতে জৈনদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন হলেও কিছু কিছু ঘটনাকে এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়, যেমন পাল রাজবংশের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের সর্বগ্রাসী বিস্তার ও প্রাথান্য— সেন রাজাদের আমলে প্রথমে শৈব পরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্য-দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ ও ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

## পুঁচড়ার জৈন পুরাকীর্তি তপন চক্রবর্তী

আসানসোল শহর থেকে দোমহানীর বাসে চেপে দোমহানীর মোড়ে নেমে পশ্চিমবঙ্গীয় রাস্তায় মাইল তিনিক গেলেই পুঁচড়া গ্রাম। হেঁটে যাওয়া যায়, রিঙ্গাও চলে। সীমান্ত বাংলার উচুনীচু পথ কেলেজোরা গ্রামের কাছে এসে উত্তরদিকে বেঁকে গিয়েছে। সেইপথে খানিকটা গেলেই পুঁচড়ার জৈন মন্দির আর ইঙ্গুল চোখে পড়বে। এর পরেই জনবসতি।

বেশ বড় ও পুরোণো গ্রাম পুঁচড়া। এখনকার বাসিন্দারাও কয়েক পুরুষের। সমস্ত ধরণের হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও রাজপুত ছৱী ও সরাক সম্প্রদায়ের বাস আছে এখানে। তবে গ্রামের মধ্যে যেসব জৈনমূর্তি ও হিন্দুমূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে এখনকার বাসিন্দাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখনকার পুরাকীর্তি ও পুরাক্ষেত্রের বয়স অনেক পুরোণো। বলা যায় নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বহু উত্থান-পতনের স্ফূর্তি বুকে নিয়ে স্তুক গাঞ্জীর্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের গ্রাম পুঁচড়া।

‘পুঁচড়া’ শব্দটির অর্থ কি? গ্রামবাসীরা বলেন, পুঁচড়া মানে ‘পঞ্চড়া’। ১৯৭৫ সালের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায় ‘দি স্টেটস ম্যান’<sup>১</sup> পত্রিকার পাতায় ও ‘পুঁচড়া’ নামটির ঐ একই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রামের লোকের ধারণা গ্রামে আগে পাঁচটি সুউচ ছড়া বিশিষ্ট মন্দির ছিল। এখনও তারা বুড়াশিবের থান, তুলসী থান, লীলাবুড়ির থান, কিলাবুড়ির থান, রাজপাড়া নামে চিহ্নিত জায়গাগুলিকে প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান ক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশ করেন। রাজপাড়ায় সত্যিই একটি পাথরের মন্দিরের নিম্নাংশ এখনও রয়েছে। কিন্তু অন্যত্র মন্দির ছিল কিনা বোঝা যায় না। যাই হোক গ্রাম নামের উৎস ঐ ‘পঞ্চড়া’ নাও হতে পারে। সুকুমার সেনের ভাষাতাত্ত্বিক পথে ব্যাখ্যা করলে ‘পুঁচ’ শব্দটি যদি পাঁচ বা পঞ্চ শব্দের সমার্থক হয় তাহলে ‘ড়া’ শব্দটি ‘বটক’ শব্দের পরবর্তী পরিণতি। সেক্ষেত্রে পাঁচড়া যেমন পঞ্চ বটক<sup>২</sup> থেকে এসেছে পুঁচড়াও পঞ্চবটক বা পঞ্চবটী থেকে এসেছে। এবং সেক্ষেত্রে পাঁচটি ছড়া নয় পাঁচটি গাছের কথাই বলা হয়েছে। যদিও গ্রাম নামের এই ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক সময়ই প্রকৃত

১. The Statesman, 11.10.75.

২. পাঁচড়া < পঞ্চবটক (= পঞ্চবটী), সুকুমার সেন- বাংলা শান মাঝ, পৃ. ১১২।

সত্যকে টেনে বের করে না। আমার মনে হয় পঞ্চ + আড়া = পুঁচড়া হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি জনবসতির দিকে গ্রাম নামটি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। আড়া শব্দটি অস্ত্রিক শব্দজাত। এর অর্থ উঁচু ডাঙা জমিতে বসতি<sup>১০</sup>। কথাটির অর্থ ব্যঙ্গনা গ্রামটিতে ঘুরলেই আরো দৃঢ়মূল হয়। এখানে উঁচু ও নীচু জমির পাশাপাশি সহাবস্থান। কিছু দূরেই অজয় নদী। এবং অজয়ের কাছ থেকে একটি খাত এই গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়। আজও একটি নীচু জমি (প্রায় খাল সদৃশ) দেখা যায় যেটি এই গ্রাম থেকে অজয় পর্যন্ত গিয়েছে।

গ্রামের মধ্যে কয়েকটি জায়গায় কিছু পুরাবস্তু সাজানো রয়েছে। যেখানে রয়েছে সেখানে যে এই সব মূর্তি ও অলংকরণগুলি আগে ছিল না তা দেখলেই বোঝা যায়।

গ্রামের জনবসতির একেবারে দক্ষিণে ফাঁকা ধান ক্ষেত্রের মধ্যে রাজপাড়া নামে চিহ্নিত জায়গাটি। এখন সেখানে কোন জনবসতি না থাকলেও নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে কোন এককালে এখানে বসতি ছিল। শুধু নাম থেকেই নয় রাজপাড়ার ধান ক্ষেত্রের মাটি সামান্য তিন চার হাত খুঁড়লেই এখনো পাওয়া যায় এক নিমজ্জিত নগরের অস্তিত্বের স্পর্শ। মাটি খুঁড়লেই সারি সারি ইঁট বেরোয়। অঙ্গুলি আকারের ইঁট  $10'' \times 10'' \times 20''$  সাইজের ইঁটগুলি তুলে নিয়ে বহুলোক এখন নিজেদের বাড়ি ঘর বানাচ্ছেন। সমস্ত জায়গাটা এমনই যে তা দেখলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এখানে মাটির তলায় রয়েছে এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ।

রাজপাড়াতেই রয়েছে এখনকার একমাত্র পাথরের মন্দিরটি। উপরের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে, নীচের দরজা পর্যন্ত অংশ এখনো কোনওভাবে আটুট রয়েছে। খুবই প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের গঠন শৈলী দেখলে মনে হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর এই মন্দির। তারও আগের হতে পারে— পরের নয়। যখন এ মন্দির তৈরী হয় তখন পাথরের উপর পাথর বসাতে কোন প্লাস্টারের ব্যবহার ছিল না। মন্দিরের একটি পাথরে নাকি কিছু লিপিও ছিল। স্থানীয় সরাক সম্প্রদায়ের দু'জন বিশিষ্ট মানুষ শ্রী অরুণ মাজি ও সবিতা রঞ্জন মাজি আমাকে লিপিটি দেখাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু লিপিটি কোথাও পাওয়া গেল না।

এই পাথরের মন্দিরের সামনেই একটি ইঁটের মন্দিরের অস্তিত্ব উপলক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে সেখানটায় তৈরী হয়েছে একটি ঢিবি।

৩. পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫১।

ঢিবির উপরে এখনো জেগে রয়েছে দুটি প্যানেল জাতীয় অলংকৃত পাথর। তাতে উপবিষ্ট জৈন তীর্থকর মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি খোদিত রয়েছে।

রাজপাড়ার ধান ক্ষেত্র ছাড়িয়ে উন্নত দিকে গ্রামে ঢোকার মুখেই রয়েছে বুড়াশিবের থান।

একটা গাছের নীচে একটি অনাদি লিঙ্গের পাশে দাঁড় করানো আছে ভাঙ্গচোরা কয়েকটি মূর্তি। তার মধ্যে রয়েছে— (১) একটি কুবের মূর্তি, (২) একটি উপবিষ্ট জৈন তীর্থকর মূর্তি, (৩) একটি তীর্থকর মূর্তিসহ খোদিত প্যানেল জাতীয় অলংকৃত পাথর, (৪) দুটি লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি।<sup>১১</sup>

লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি দুটির মধ্যে একটি চতুর্ভুজ ও অপরটি অষ্টভুজ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তির সামনের দুটি হাত ঠিকই আছে, কিন্তু পেছনের দুটি হাত একটু বেচপ। মনে হয় যেন পরবর্তী কালে দুটি হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা কালের প্রকোপে ক্ষয়ে গিয়েও ঐ ধরণের সম্পত্তিহীন হয়ে থাকতে পারে। কারণ এই সমস্ত মূর্তিগুলিই বেলেপাথরের, এই পাথরগুলো সামান্য অত্যাচারেই ক্ষয়ে যায়।

গ্রামের মধ্যে বষ্টীতলা বলে কথিত একটি জায়গায় একটি পুরোণো গাছের তলায় রয়েছে আরো কিছু মূর্তি। রয়েছে— (১) একটি বড় লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি, (২) একটি ভাঙা কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডয়মান তীর্থকর মূর্তি, (৩) একটি মন্দিরের ভাঙা প্যানেলের অংশ, (৪) এছাড়া গাছের শিংকড়ের আবেষ্টনীর মধ্যে অর্ধেক চাপা পড়ে আছে একটি অসংখ্য তীর্থকর মূর্তিসহ পাথরের প্লেট। প্লেটটির বেশিরভাগ অংশই গাছ গ্রাস করে নিয়েছে—সামান্য একটু অংশ এখনো বাইরে রয়েছে। অরুণ মাজি বললেন— এখন থেকে একটি ঋষভনাথের মূর্তি বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তা শ্রীপেরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত কলকাতায় নিয়ে গিয়েছেন।

এছাড়া গ্রামের মধ্যে তুলসী থানে রয়েছে পাথরের তুলসী মঢ় জাতীয় একটি সৌধ। তার আশেপাশেও বড় বড় পাথর পড়ে আছে। যেগুলি দেখলে মন্দিরের ভাঙা অংশ বলেই মনে হয়।

সমস্ত গ্রাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলটি যে একদা জৈন সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তা এখনকার পুরাবস্তুগুলোই প্রমাণ করে। পুরাবস্তু দৃষ্টে মনে হয় প্রথমে জৈন এবং পরে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে ছিল এই অঞ্চলটি।

৪. লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলি স্পষ্টতই জৈন তীর্থকর মূর্তি প্রভাবিত হিন্দু মূর্তিগুলি। বিশেষভাবে পার্শ্বনাথ মূর্তির প্রভাব এই মূর্তিতে লক্ষ্যণীয়। সেই স্পষ্টতর এবং কায়োৎসর ভঙ্গি। কেবল হাতের সংখ্যা বেশী এবং কিছু অলংকার কাপড় পরানো। মনে হয় এগুলি জৈন বৈষ্ণব মিলিত ধর্মভাবনারই ফলকৃতি।

কাছাকাছি এলাকা এবং এই অঞ্চলটিকে নিয়ে ভুঁইয়া রাজাদের কিংবদন্তী রয়েছে। এই ভুঁইয়া রাজারা কারা— তারা কোন শতাব্দীর? রাজপাড়ার মধ্যে একটি পাথরের দেওয়াল দেখা যায়। তাছাড়া মাটির তলায় ইঁটের ঘর বাড়ির অস্তিত্ব তো আছেই। অঞ্চলটিতে সতর্ক খননকার্য চালালে পাণুরাজার তিবির সময়ের বা তারও আগের কোন সমৃদ্ধি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

দোমহানী থেকে পুঁচড়া যাওয়া আসার পথে কেলেজোরা গ্রামের কাছে একটি প্রাচীনকালের সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়। এই সমাধি ক্ষেত্রটিও কৌতুহল জনক। আদিম জাতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে মুণ্ডা বা ভূমিজদের মধ্যে অস্তি কবর দেওয়ার রীতি বহু প্রাচীনকালের। এবং সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে এইসব সংস্কৃতির উৎস কিনা সেটা অনুসন্ধান যোগ্য। কারণ খৃষ্টপূর্ব যুগে এই ভূমিজরাও জৈন ধর্মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখনো ভূমিজদের মধ্যে যেসব উপভাগ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি একদা জৈন সংস্কৃতি প্রভাবিত ছিল বলেই মনে হয়। ভূমিজদের উপভাগের মধ্যে ভুঁইয়া (মাছ), কাশ্যপ (কচ্ছপ), নাগ (সাপ), শাল ঝঁঝি, যুগি, সামা ও পরসা ইত্যাদি উপভাগের নামের সঙ্গে জৈন সম্পর্ক প্রতীক তথা তীর্থংকরদের লাঙ্গনের একটা যোগাযোগ আছে মনে হয়।<sup>৫</sup> লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে এই উপভাগগুলিই হল ভূমিজদের গোত্র। স্বাভাবিকভাবেই কোন জৈন ধর্ম প্রভাবিত ভূমিজ গোষ্ঠীই এই অঞ্চলে একদা সমৃদ্ধি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

পুঁচড়ার এই পুরাবন্ত ইতিপূর্বেই বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ৬ই জুলাই এর সংখ্যায় একটি খবরে বলা হয়েছিল যে এই অঞ্চলটি ‘একটি অবলুপ্ত নগরী’। তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত এ অঞ্চলটি পরিদর্শন করে এখানকার প্রত্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চ মনোভাবও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপরই সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেছে। উপর্যুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এখনো প্রায় লোকচক্রের আড়ালে পড়ে আছে এই সুপ্রাচীন জৈন ক্ষেত্র তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরা ক্ষেত্রটি।

ম্যার্ক পার্সেন্স। ইচ্ছ পার্সেন্স টাইটলচার্চে রাকানেচ্চ তি ম্যার্ক পার্সেন্স  
। টাইটলচার্চ টিথ ম্যার্ক চ্যার্চে চতীচুম্ব কুলী ম্যার্ক চ্যার্চ নার্স ম্যার্ক

৫. এইচ. এইচ. রিসলে ভূমিজদের কুড়িটি উপভাগের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। ডঃ সুরজিৎ চি. নহ।  
বরাত্ম অঞ্চলের ভূমিজদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে আরও নয়টি উপভাগের সন্ধান পেয়েছিলেন।